প্রথম প্রকাশক : দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৭

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার

প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিণ্টার্স
৪১/ডি/১০৩ মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা-৬৭

বিশ্ব-সাহিত্যে সমারসেট মম একটি সুপরিচিত নাম। শুধু ...চিতই নয়, সুবিখ্যাতও।

মম লেখা শুরু করেন তরুণ বয়সে। তাঁর বয়স যখন মাত্র ... তখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অফ ল্যামবেথ' প্রকাশিত ... বইটি বের হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর থেকে ... তাঁর উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রকাশিত হতে থাকে। ... ষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'অফ ... বণ্ডেজ'। এই উপন্যাসটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই ... ম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। তারপরেই বেরোয় 'দি ... ন্সেন্স'।

... লেখা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি ... শিল্পী নন। আসলে তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। ... তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই মনস্তত্ত্বমূলক। এখানে আর ... বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিজের সাহিত্য ... সমালোচনার ওপরে নির্ভর করতে হয়নি। ... ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন এবং ... নিজেই সংশোধন করতেন। এই বোধ ছিলো বলেই ... তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে তখনও তিনি একথা প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন নি যে, "My native gifts are not remarkable, but I have a certain force of character which enables me in a measure to supplement my deficiencies."

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তিনি এ-কথা লিখলেও সমালোচনার কষ্টিপাথরে তাঁর প্রতিটি রচনাই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছিলো সে কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন।

সমারসেট মম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ... প্যারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন প্যারী ... আইন-উপদেষ্টা। মমের বয়স যখন মাত্র আট ... ত্যু হয় এবং তার দু'বছরের মধ্যেই পিতও ...

কিংস স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলের পড়া শেষ হবার আ..
মম জার্মানিতে গিয়ে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ না করেই আবার তিনি ইংল্যা..
ফিরে আসেন এবং অডিটরের বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্যে উক্ত
বিষয়ের একটি স্কুলে ভর্তি হন কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ঐ
স্কুল ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে সেন্ট টমাস
হাসপাতালে ভর্তি হন এবং কয়েক বছর পড়াশুনা করে চিকিৎসা-
শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন।

আসলে মম ছিলেন নিতান্ত অস্থিরমতি এবং এজন্যেই
তিনি কোথাও চাকরি করতে পারেননি। প্রথম জীবনে তাঁর
আর্থিক অবস্থাও খুব শোচনীয় ছিলো। এরপর একরকম
আকস্মিকভাবেই তাঁর জীবনের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হয়
তাঁর প্রথম নাটক "এ ম্যান অফ্ অনার" তাঁকে নাট্যকার হিসেবে
সুপরিচিত করে এবং এই নাটক বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থকষ্ট
দূর হয়ে যায়। এরপর থেকেই শুরু হয় সাহিত্যের পথে জয়যা..
এবং সে জয়যাত্রা শুধু ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি
মম-এর নাম ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে।

আমরা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "দি ম্যাজি..
উপন্যাসটির বাংলা ভাষান্তর পাঠকদের হাতে তুলে দি..
গর্ববোধ করছি।

ওরা নিঃশব্দে হেঁটে চলেছিলো। আর্থার বারডন আর ডাক্তার পোরোয়ে। বুলেভার সেন্ট মিচেলের এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে লাক্সেমবুরগের বাগান দিয়ে হাঁটছে। ডাক্তার কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটছে, হাত দুটো পেছনে তার। শিল্পীর চোখ নিয়ে দেখে চলেছে সে সব কিছু। ঝরাপাতার মরশুম। কিন্তু তাতেও এক বৈচিত্র্যের অনুভব। গাছের পাশেপাশে ঝোপের সার, তাতেও গাছের বাড় অব্যাহত। শরৎ এসে পড়েছে, কিছু গাছ ইতিমধ্যেই পত্রহীন। ফুলও শুকিয়েছে কোনোটার। এ যেন এক বিগতযৌবনার শরীর—প্রসাধনে সৌন্দর্য ধরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস।

ডাক্তার পোরোয়ে তার গায়ের ক্লোকটা আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরলো তার দুর্বল শরীরে। গরমেও ক্লোক তার নিত্যসঙ্গী। জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেটেছে তার মিশরে, ডাক্তারী করে। ইয়োরোপের প্রাণহীন গ্রীষ্ম তার শরীরে উষ্ণতার আমেজ আনতে পারে না। আলেকজান্দ্রিয়ার বর্ণাঢ্য রাস্তাগুলোর স্মৃতি তার মনে চোখে ভেসে উঠলো, আর যাযাবর পাখীর মত উড়ে চললো তালবৃক্ষ বন পেরিয়ে, ঝড়বিধ্বস্ত ব্রিটানীর উপকূলে, এখানেই বাড়ি ডাক্তারের।

ডাক্তারের ধূসর চোখে বিষণ্ণতা নামলো,—
অপেক্ষা করা যাক।

দুটো চেয়ার টেনে নিলো ওরা। জলের ধারে
সূর্যালোক এখন আরও উজ্জ্বল। গাছগুলোরও
পড়ছে।

সেণ্ট সালপিসের গম্বুজ এককোণে চোখে
বুলেভার সেণ্ট মিচেলের অমসৃণ ছাদ।

প্রাসাদও চোখে পড়ছে। ঝকঝকে পোশাকে
ফেরা চলছে। বাচ্চাদের গাড়িও ঠেলে নিয়ে য
উজ্জ্বল পোশাকের কিশোরমুখও নজরে পড়ছে।
থাকতে থাকতে ডাক্তারের ঠোঁটে এক ফালি হাসি
সরুচিবুক দাড়ির কোটরগত চোখের মানুষটি কে
মনে হচ্ছে। একটি ভাস্করকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ক
তার অন্য পাশে।

ডাক্তার পোয়েরো অবশ্য অনর্গল ইংরেজী
নেই বললেই চলে, কথায়। তবে শোনার চেয়ে প
নিয়েছে মনে হয় কথাবার্তায়। বন্ধুর দিকে ফিরে
সে,—মিস ডনসে কেমন আছে?

আর্থার বারডনের ঠোঁটে হাসি স্পষ্ট হ
আছে। আজ তো দেখা হয়নি, তবে, বিকেলে
চায়ের আমন্ত্রণ আছে। আর, সিয়ে নয়ের-এ
থাও তুমি এটাও আমাদের আন্তরিক ইচ্ছে।

—খুব খুশী হবো। তবে তোমরা দুজনে নি
নিশ্চয়ই?

—স্টেশানে দেখা হয়েছে আমাদের গতকাল।
দাওয়া করে সাড়ে ছ'টা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত
—বাঃ, সে কথা বলে গেলো, আর তুমি শুনলে
মত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে?

বারডন প্যারিসে সন্ত আগত। সেন্ট লিউকসের হাসপাতালে নিযুক্ত—ফরাসী চিকিৎসাপদ্ধতি গবেষণার কাজ তার আপন হয়ে থাকলেও, মূল লক্ষ্য অবশ্যই মার্গারেট ডসনের সঙ্গে দেখা করা। লণ্ডনের আরও চিকিৎসাবিদদের প্রশংসাপত্র নিয়েই এসেছে বারডন।

লাঞ্চের সময়ে বারডন তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে চললেও ডাক্তার মিশরের অভিজ্ঞতার দিনগুলো সম্পর্কেও বললো প্রত্যুত্তরে। বারডনকে চেনে সে বাল্যদিনগুলো থেকে। তার জন্মমুহূর্তে শুধু উপস্থিত থাকা হয়নি, যেহেতু কায়রো থেকে খেদিভে ইসমাইলের এক অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ এসেছিলো। বারডনের পিতৃদেবের সঙ্গেও পরিচয় ছিলো ডাক্তারের। আর্থর তারই পেশার মানুষ হওয়াতে সে খুশী।

খাবার পর ডাক্তার তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলে উঠলো,—মানুষের প্রকৃতির বিচিত্রগতিতে আশ্চর্য না হয়ে পারি না, তোমার মত লোক যে মার্গারেট ডসনের ভালবাসায় হাবুডুবু খাবে এটা সত্যিই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার।

আর্থর বারডনকে নিরুত্তর দেখে পোরোয়ে, বারডনকে আঘাত দিয়ে ফেলেছে আশঙ্কা করে, ব্যাখ্যা শুরু করলো তড়িঘড়ি,—মহিলা যে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া এটা মানতেই হয়। সুন্দরী, কমনীয়তার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোনো মিল নেই, মানে—তোমার জন্মকর্ম তো প্রাচ্যদেশে। আর আরলোপরাসের দেশে কেটেছে বাল্যকাল।

—মানছি। মানি, আমার মধ্যে কল্পনাশক্তির অভাব আছে রসবোধেরও। সাধারণ, পার্থিব জগতের মানুষ—কিন্তু ভবিষ্যতের চেহারা আমার চোখে স্বচ্ছ—

—হুঁ। তবে, আমার ভাবনাগুলোর অন্যতম হচ্ছে, কল্পনা যারা করতে পারে না, তারা ভালবাসতে জানে না। তার চোখে এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হলো, অতীন্দ্রিয়বাদীর আবেগ-ভরপুর চোখে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ডাক্তার বলে চললো,—কিন্তু মিস ডসনের

দৃষ্টিভঙ্গি অনুদার বলা চলে না। আর, যদি আমাকে বলতে হয়, বলবো—তোমার শক্তির উৎস সে। যে কোনো শিল্পের প্রতি তার এক দুর্লভ উৎসাহ দেখা যায়। জীবনের বৈচিত্র্যে তার আগ্রহও অপরিসীম।

—সৌন্দর্যের পিয়াসী হওয়াই স্বাভাবিক মার্গারেটের পক্ষে, কারণ তার প্রতিটি তনুর অঙ্গ সুন্দর। আর্থার বললো।—প্রথমবার ওকে যেদিন দেখি, মনে হয়েছিলো আমার চোখের সামনে যেন এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গেলো—

আর্থারের কথায় কিটস-এর কবিতার স্বর্গীয় সঙ্গীতের আভাস। ফরাসী ডাক্তার পোরোয়ে এবার অনেক সতর্ক,—ভাগ্যবান হে, তুমি। অত্যন্ত ভাগ্যবান। তোমার প্রতি মিস মার্গারেটের আকর্ষণও কম নয়, তোমার চেয়ে। তোমার আলেকজান্দ্রিয়ার বাল্যের গল্প শোনায় তার বিরক্তি ছিলো না। আদর্শ ঘরণী হবে মার্গারেট।

—সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। হেসে জানালো আর্থার।

নিজেকে সুখীমানুষ বলে ভাবতে পারছে সে। মার্গারেটকে ভালবাসে সে—অকৃত্রিম সে ভালবাসা। তার প্রতিও দুর্বলতা আছে মেয়েটার। ওদের জীবনে কোনো অ-সুখের কথা কল্পনাও করতে পারে না আর্থার।

—বিয়ের তারিখটা শীগগিরই ঠিক করছি আমরা। আসবাবপত্র কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছি। আর্থার জানালো।

—তোমরা মানে—তোমাদের ইংরেজদের পক্ষেই এই ধরণের বিদঘুটে ব্যবহার করা সম্ভব—বিনা কারণে বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া, দু'দুটো বছর।

—মার্গারেটকে প্রথম যখন দেখি তার বয়স দশ। আর, বিয়ের প্রস্তাব যখন দিই তাকে, সতেরোয় পা দিয়েছে সে। ও তো তখনই বিয়েতে রাজী হয়ে গেছে। তবে প্যারিসে মুক্তদিনগুলো কাটাতে চায় সে. তাছাড়া, বিয়ের জন্যে সে তৈরী, মনে করিনি—কারণ তখনও বেড়ে চলেছে সে দেহে ও মনে।

—তবে, ছাখো—বলিনি, তুমি বাস্তববাদী মানুষ। ডাক্তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসলো।

—এর সঙ্গে আ'র একটা ব্যাপারও ছিলো, মনের দিক থেকে আমরা একান্ত ছিলাম। সময়ও ছিলো আমাদের সামনে। কাজেই অপেক্ষার বাধা ছিলো না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের পাশ দিয়ে লম্বা-চওড়া চেহারার একটা লোক হেঁটে গেলো। জেল্লাদার চেকস্যুট পরণে ত'র। ডাক্তার পোরোয়ের চোখে চোখাচোখি হতে গম্ভীরস্বরে টুপিটা তুলে অভিবাদন জানালো। ডাক্তার সামান্য হেসে প্রত্যাভিবাদন করলো।

—ওই মোটা বন্ধুটি কে তোমার? আর্থার প্রশ্ন করলো।

—অলিভার হ্যাডো। তোমারই দেশের মানুষ।

—শিল্পের ছাত্র? আর্থারের গলায় অবজ্ঞার সুর। এ সুর, তার বাস্তবজীবনের সঙ্গে একীভূত নয় এমন মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সে।

—ঠিক তা নয়। কিছু আগে দৈবাৎ দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। অপরসায়নের ওপর কাজ করার তথ্যসংগ্রহের সময়ে পাঠাগারে পরিচয়।

বারডনের চোখে কৌতুকপূর্ণ অবজ্ঞার ঝিলিক দেখা দিলো। ডাক্তার যে এই সব অর্থহীন পড়াশোনার ব্যাপারে কেন সময় নষ্ট করে, এটা অবোধ্য তার কাছে। সদ্যপ্রকাশিত একটা বই পড়ার সুযোগ হয়েছে তার ভদ্রলোকের জ্ঞানগম্যি আছে, তবু সময়ের অপচয় মনে হয়েছে ব্যাপারটা বারডনের কাছে।

—পাঠাগারে খুব বেশী মানুষ যায় না। কাজেই যারা নিয়মিত যাতায়াত করে, সহজেই ধরা যায়। এই ভদ্রলোককে রোজই দেখেছি সেখানে। বিচিত্র সব পুরনো বইয়ে ডুবে থাকতে দেখেছি ওকে। আমি ঢোকার আগে থেকেই। আমি চলে আসার পরও থেকে গেছে। কখনো এমনও হয়েছে, আমি যে বই চেয়েছি সে সেগুলো নিয়েই বসেছে। অর্থাৎ—আমার বিষয় নিয়েই চলেছে তার পড়ার

ব্যাপার। ভদ্রলোকের হাবভাব অস্বাভাবিক, যদিও সহানুভূতি উদ্রেককারী নয়। আমাকে পরিচয় করার সুযোগ দিলেও সে সুযোগ নিইনি। একদিন একটা বিশেষ ব্যাপারে কোনো তথ্যের হদিস না পেয়ে অনুসন্ধান প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময়ে গ্রন্থাগারিক ভদ্রলোক —সে হয়তো ওকে বলে থাকবে কথাটা, আমার সাহায্যে এগিয়ে এলো হ্যাডো। বইখানা বের করে দিলো সে। কৃতজ্ঞবোধ করলাম। বিকেলে একসঙ্গেই বেরোলাম আমরা। একই বিষয়ের চর্চা করছি দুজনে যেহেতু, আলাপ জমে উঠলো। লোকটা প্রচুর পড়াশোনা করেছে মনে হলো ওর কথায় এবং আমি যেসব বইয়ের নামই শুনিনি, সেগুলো সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করলো। হিব্রু আর আরবীতেও ব্যুৎপত্তি আছে তার, যে দুটো ভাষা আমার কাছে অপরিচিত। মূল কাবালা-তেও দখল আছে।

—তবে নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপকার হয়েছে ওর। তা করে কি ভদ্রলোক?

অননুমোদনের হাসি ফোটালো ডাক্তার ঠোঁটে—বন্ধু, সেটাই বলতে পারছি না তোমাকে। তোমার অপ্রকাশিত অবজ্ঞায় তো আমিই থরহরি কম্পমান।

—সে কি?

—প্যারিসে অনেক বিচিত্রচরিত্র মানুষের মিছিল, জানো তো। খামখেয়ালী মানুষের ভীড়ে ঠাসা এই শহর। আজকের দিনে কথাটা হয়তো অবিশ্বাস্য শোনাবে, তবু বলি—আমাদের এই বন্ধুটি, অলিভার হ্যাডো লোকটা যাদুকর। এবং লোকটা সিরিয়াস।

—বোক হাঁদাও! কেটে কেটে কথাগুলো বললো আর্থার।

সুসি বয়েডের সঙ্গে একটা ফ্ল্যাটে থাকে মার্গারেট ডনসে। ঠিকানা: বুলেভার দ্য মন্তপারনাসে। মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই সেই বিকেলে চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে আর্থার। স্টুডিওতে তার অপেক্ষায় ছিলো মার্গারেট আর তার বান্ধবী। সুসিও আর্থারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আগ্রহী। জানে সে,

আর্থার আর মার্গারেটের মধুর সম্পর্কের কথাটাও। দীর্ঘদিন সুসি নিঃসঙ্গ, একঘেঁয়ে জীবন কাটাচ্ছে। একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সে। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকাপয়সাও পেয়েছে, মোটামুটি সচ্ছল সে। মার্গারেট তার প্রাক্তন ছাত্রী, প্যারিসে শিল্পচর্চার আগ্রহ দেখিয়ে যোগাযোগ করাতে সুসি সানন্দে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাকে।

মার্গারেটের প্রতি এক দুর্বলতা আছে, বাৎসল্যসুলভ সেটা। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছেদ ঘটে গেলেও, ছাত্রীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন সার্থক হোক এই তার কামনা। সাধারণ মনের মহিলা সুসি, হিংসা দ্বেষের লেশমাত্র নেই তার চরিত্রে। মাতৃসুলভ দৃষ্টিতে মেয়েটার কার্যকলাপে চোখ তার। আর্থারের হাতে এমন একটা মেয়েকে তুলে দিতে পারছে বলে সে গর্বিতা. যে মেয়েকে নিজের হাতে গড়েছে সুসি।

মার্গারেটের কাছে লেখা আর্থারের চিঠিপত্র, এবং তার কথা-বার্তা থেকে মেয়েটার প্রতি আর্থারের অনুরাগের গভীরতা তাকে মুগ্ধ করেছে। আর্থারের সঙ্গে মার্গারেটের যোগসূত্র বহুকালের। মার্গারেটের পিতৃবিয়োগের পর তাকে ছাত্রাবস্থায় সমস্ত রকমের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে সে, কারণ পিতৃদেব দেহ রাখার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারেট জেনেছে সে কপর্দকশূণ্য। পরে সব জানার পর আর্থারকে প্রশ্ন করেছে,—তুমি এতসব করলে কেন আমার জন্যে! বলোনি কেন আমাকে?

—তোমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ-করতে চাইনি। স্বাধীনভাবেই আমার সঙ্গে মেলামেশা করো তুমি, তাই চেয়েছি।

কান্না দেখা দিলো মার্গারেটের চোখে।

—ওভাবে কথা বলোনা মার্গারেট। আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকার মত কিছু হয়নি। খুব সামান্যই করেছি আমি তোমার জন্যে। আর, যেটুকু করেছি তাতে আনন্দও পেয়েছি।

—তোমার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো কিনা জানিনা।

—অমন করে বলোনা তো—এতে, আমি যা বলতে চাই, তা যেন

আরও কঠিন মনে হয়।

—চোখ তুলে তাকালো মার্গারেট. লজ্জারাঙা হলো সে। নীলচোখ দুটো জলে ভরে গেলো,—আচ্ছা। তুমি কি বোঝো না—তোমার জন্যে আমি দুনিয়ার সবকিছু করতে পারি।

—আবারও বলছি মার্গারেট, কৃতজ্ঞবোধ করার কিছুই হয় নি তোমার—আর, আমি তো তোমাকে আপনার করে পাওয়ার জন্যে দিন গুণছি।

সুন্দর করে হাসলো মার্গারেট,—আমার বাল্য অবস্থা থেকেই তো তোমাকে পেতে চেয়েছি, আর্থার—

প্যারিসের কাজে ছেদ টেনে সে এখনই আর্থারকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু আর্থারই তাকে তার পরিকল্পনার পরিবর্তন থেকে নিরস্ত করেছে। প্রথমটায় সায় দেয়নি মার্গারেট এতে কারণ হাতে পয়সা নেই তার। আর্থার তার জন্যে আরও অর্থব্যয় করুক তাও চায় না সে।

—তাতে কি হয়েছে? তোমাকে যে সামান্য অর্থসাহায্য দিতে পারছি তাতে ভালো লাগছে আমার। আর, অভাব তো নেই আমার। বাবা কিছু রেখে গেছেন, কাজ করেও পাচ্ছি পয়সা।

—হ্যাঁ। কিন্তু অবস্থা তো আর আগের মত নেই। কারণ, আমার ধারণা ছিলো তুমি আমার টাকা থেকেই দিচ্ছো আমাকে।

আর্থার হাসলো,—আমি যদি কালই মারা যাই, আমার সমস্ত কিছু তোমারই হবে। আগামী দু বছরের মধ্যেই আমরা বিয়ে করছি। দীর্ঘদিন আমাদের মনের আদান-প্রদান হয়েছে, মন পরিবর্তনের প্রশ্ন আর উঠছে না। আমরা একাত্ম হতে পেরেছি।

প্যারিসে ওই সময়টুকু কাটাবার ইচ্ছে মার্গারেটের। আর আর্থারও মনস্থির করে ফেলেছে, অন্তত সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত মার্গারেটেরও বিয়ে করা চলে না। সুসি বয়েডের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হতে সে বলেছে,—ওর টাকা নেওয়াতে আপত্তি করা উচিত নয় তোমার, কারণ তুমি যখন ওকে বিয়েই করছো। তাছাড়া

সত্যিই তো টাকা নেই তোমার, কোনো চাকরিও পাচ্ছো না।

সুসি আর্থারকে দেখে নি কখনো, কিন্তু তার সম্পর্কে এত শুনেছে যে তাকে পুরনো, পরিচিত মানুষ মনে হয় তার। ওর চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে মুগ্ধ করেছে। ছবিও দেখেছে ওর সুসি। মার্গারেটের ধারণা আর্থারের ছবি ভালো ওঠে না। আর্থার কেমন দেখতে জানতে চাওয়ায় উত্তরে একবার সুসিকে মার্গারেট জানিয়েছে,—না, দেখতে তেমন ভালো না. তবে—আঁকার মত মুখ তার।

—হ্যাখো কাণ্ড! এমন একটা কথা বললো মেয়ে, যে—শুনতে ভালো লাগে, অথচ যার মানে হয় না! সুসি হেসে বলেছিলো।

সুসি ভেবেছে, মার্গারেট বিয়ের পর তার শিল্পচর্চাকে ভুলে যেতে পারবে। ছবি আঁকার চেয়ে ফুটফুটে বাচ্চার মাতৃত্ব তার কাছে অনেক লোভনীয়।

সুসি বয়েডের বয়স ত্রিশ হলেও তাকে বয়সের তুলনায় প্রবীণ দেখায়। তার ব্যস্ততায় ভরা জীবনই হয়তো এর কারণ। বড় বড় ডাগর চোখ আর ভরা ঠোঁটে তাকে ভালোই দেখায়। বর্ণহীন গায়ের চামড়ায় কুঞ্চন ধরেছে। সরু সাদা নাক আর মুখটা বয়স কমিয়ে দিয়েছে। চুলও আকর্ষণের বস্তু সুসির—চকচকে রূপোলী আভা ছড়িয়ে তাতে। ছোট্ট হাত দুটো নেড়ে কথা বলার অভ্যেস তার। অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল হওয়াতে পোশাকের দিকেও নজর আছে। রুচিবতী মহিলা। পোশাকের দৈন্য না থাকলেও, আতিশয্য নেই—আর এই নিয়ে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মতের অনৈক্যও হয়েছে সুসির। মার্গারেটের পোশাক দেখে ঔদাসীন্যে বলেছে,—দোহাই তোমার, তোমার বিয়ের পর বছরে অন্তত বারচারেক আমাকে তোমার কাছে দিও—তোমার বেশভূষার দিকে নজর দিতে পারি তাহলে। নিজের বুদ্ধিতে চললে তোমার কর্তার ভালবাসাটুকুও হারাবে!

সুসির পুরস্কার মিলেছিলো, আর্থার সেদিন তার বাড়িতে প্রথম এসেই তারই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলো।

—কি দারুণ সেজেছো তুমি—আমি তো ভেবেছিলাম—

—তুমি নিশ্চয়ই আর্থারকে বলোনি তোমার পোশাক পছন্দের মূলে আমি? মার্গারেটের উদ্দেশ্যে বলেছিলো কথাগুলো সুসি।

—বলেছিলাম। বলেছি, আমার কোনো পছন্দের বালাই নেই, সব কৃতিত্ব তোমার, তাও বলেছি। সরলগলায় বললো মার্গারেট।

মার্গারেটের এই সারল্য সুসিকে মুগ্ধ করেছে।

মার্গারেট চা-পর্বে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আর্থারের চোখ দুটে কিন্তু তার প্রতিটি পদক্ষেপে নিবদ্ধ। ওর হাসিমাখা মুখ থেকে পেলব অঙ্গুল ছুঁয়ে চলছে তার দৃষ্টি। চোখের যেন তৃপ্ত মেলে না তার। মার্গারেটের হঠাৎ মনে হলো আর্থারের চোখ তার দিকে, ঘুরলো সে—দৃষ্টি বিনিময় করলা ওরা—নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তারা, পরস্পরের দিকে চোখ রেখে কিছুসময়।

—তোমরা দুটো বড্ড বোকার মত করছো. এদিকে চায়ের তেষ্টায় যে আমার প্রাণ যায়। আনন্দঘন কণ্ঠ সুসির।

ওরাও হেসে উঠলো, লজ্জায় লাল হলো। আর্থারের মনে হলো কিছু বিনয় প্রকাশ করা দরকার,—আশা করি আপনার ছবিগুলো আমাকে দেখাবেন একসময়ে। মার্গারেটের ধারণা সেগুলো নাকি দারুণ—

—উনি না দারুণ ক্যারিকেচার আঁকেন, তুমি এখান থেকে সরে যাবার সঙ্গেই সঙ্গেই দেখতে পাবে তোমার কি মূর্তি আঁকা হয়ে যা ।

—মার্গারেট, ওরকম শত্রুতামূলক আচরণ কিন্তু শোভা পায়না তোমার।

সুসি বয়েডেরও মনে হলো, আর্থারও কেরিকেচারের ব্যাপারে নেহাৎ অজ্ঞ নয়। মার্গারেট ঠিকই বলেছে, আর্থার তেমন হ্যাণ্ডসাম নয়, কিন্তু ওর পরিস্কার করে কামানো মুখে এক আকর্ষণ··· প্রেমিকযুগল চুপ করে গেলো। আর্থার কিছু পরে হেসে উঠলো, সুসির স্বগতোক্তির শেষে। সুসিও সেই অবকাশে তাকে দেখছে, গভীর চোখে। ছেলেটা বড় রোগা. একহারা তার চেহারা। তবে

ইয়র্কশায়ারবাসীর স্বাস্থ্য প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা।

শক্ত হাড়ের শরীর। চোয়ালদু'টো গাল ঠেলে উঠেছে, লম্বাটে মুখ-নাক আর ঠোঁট দুই-ই সাধারণ মাপের চেয়ে বড়ই হবে। চামড়ার জেল্লাও নেই তেমন গায়ের। তবু, দু'টো জিনিষ আকর্ষণের—চরিত্রের দৃঢ়তা আর সহিষ্ণুতা। এ' এমন মানুষ—যে তার মনকে জানে, যা চায় তা পাবার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু ওই কালো চোখ দুটো...

চা তৈরী. আর্থার উঠে দাঁড়ালো তার কাপটা নেওয়ার জন্যে।

—বসো। তোমার যা' দরকার সবই পৌঁছে দেবো আমি। কতটা চিনি দিতে হবে তা জানি আমি। তোমার ফরমাস খাটতে ভালো লাগে আমার।

এক আশ্চর্য ছন্দময় ভঙ্গিতে এগোলো মার্গারেট। এক হাতে তার চায়ের কাপ, অন্য হাতে কেকের থালা। সুসির মনে হলো আর্থারের প্রাণ-মন যেন মেয়েটার প্রতি সমর্পিত। বুকে কেমন একটা মোচড় উঠলো সুসির, সেও তো ভালবাসতে জানে—কিন্তু কেউ তো তার কাছে হৃদয় মেলে ধরেনি! শুধু বইয়ের পাতায় ভালবাসার কথা পড়েছে সুসি এতদিন। আজ হয়তো যৌবন চলে গেছে, কিন্তু একদিন তো ভালবাসার মত শরীর ছিলো ওর...পারতো ঘরনী হতে, সন্তানের মা হতে···তার কথা কখন থেমে গেছে খেয়াল নেই তার, অন্যদেরও নেই—তারা নিভৃতালাপে মগ্ন।

—আমি কি বোকা! ভাবলো সুসি।

বহুকাল আগেই একটা গভীর সত্যের উপলব্ধি হয়েছে তার, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, ভালমানুষী আর চারিত্রিক দৃঢ়তা সব ম্লান হয়ে যায় সুন্দর মুখের কাছে।

কাঁধটা ঝাঁকালো সুসি,—সময়ের হিসেব বোধহয় ভুলতে বসেছো তোমরা। সিয়ে নয়ারে যদি ডিনার সারতে দিতে চাও আমাদের—তাহলে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে।

—নিশ্চয়ই, আর্থার উঠে দাঁড়ালো,—হোটেলে ফিরে গিয়ে লাঞ্চ

সেরে ফেলি আমি। সাড়ে সাতটায় দেখা হচ্ছে তাহলে।

মার্গারেট দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরলো সুসির দিকে,—কি মনে হলো? হাসি হাসি মুখ তার।

—এত অল্প সময় একটা মানুষকে দেখে তার সম্পর্কে কোনো মতামত দেওয়া যায় না।

—ননসেন্স। মার্গারেট মৃদুস্বরে ধমক দিলো।

—আমার মনে হয় এমন মানুষ কমই চোখে পড়েছে আমার, লক্ষ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান, এমন কেউ। সুসি বসেই বললো।

চায়ের বাসন মার্গারেটই সরিয়ে নিলো, কারণ সুসির এ'সম্পর্কে যথেষ্ট আলস্য। সে আঁকতে বসে গেলো। আর্থারের একটা ছোট্ট স্কেচ রেখান্বিত করলো সে—লম্বা ঢ্যাঙ্গা একটা মূর্তি, বিরাটকায় নাক তার। পঞ্চশরের তীরও রয়েছে···কিন্তু ব্যাপারটা যখন হাস্যকর মনে হলো—দেখলো চিত্রটি প্রায় অর্ধ-সমাপ্ত। ইতিমধ্যে অসহিষ্ণু হাতে ছিঁড়ে ফেললো সেটা সুসি। মার্গারেট ফিরে আসতে, সুসি তার দিকে ফিরলো—ঠোঁটে হাসি নিয়ে,—আরে তোমাকে প্যারিসের পোশাকে গ্রীকদেবীর মত দেখাচ্ছে যে—ব্যঙ্গের ছোঁয়া সুসির গলায়।

—তাই নাকি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মার্গারেট সুসির চোখে। কি যেন খুঁজছে সে তার দৃষ্টিতে।

সুসি উঠে পড়লো, মার্গারেটের দিকে এগিয়ে গেলো,—জানো, ছেলেটাকে দেখবার আগে আমার মনে হয়েছিলো সে তোমাকে সুখী করতে পারবে, অন্তরের সঙ্গেই বিশ্বাস করেছিলাম এ' কথা। ওর সম্বন্ধে যা বলেছিলে তুমি, তাতে ভয়ই হয়েছিলো—বয়সে অনেক বড় তো তোমার চেয়ে ও। কারণ ওইতো তোমার জীবনের প্রথম পুরুষ—

—ভয়ের কোনো কারণ নেই তোমার। মার্গারেট জানালো।

—কিন্তু এখন আমার ধারণা, 'তুমি' ওকে সুখী করতে পারবে—তোমাকে আর ভয় নেই আমার, ওকেই ভয়।

মার্গারেট নিরুত্তর। সুসি কি বলতে চাইছে তার বোধের বাইরে।

—লোকটা অসুখী, মনের দিক থেকে—আমার মনে হয়েছে। তাই, সাবধান করি তোমাকে মার্গারেট—ওকে আপন করে না ও, কারণ ওকে একমাত্র অসুখী করার শক্তি তোমারই আছে।

—কিন্তু, কিন্তু—আমি তো ওকে সুখী করতেই চাই। মার্গারেট দৃঢ়গলায় বলে উঠলো,—তুমি তো জানো আমার সব কিছুই ওর জন্যেই হয়েছে। নিজের সমস্ত স্বার্থ ছেড়ে দিয়েও ওকে সুখী করবো আমি। তবে, নিজেকে বিসর্জন দিতে পারি না আমি, কারণ ওকে তো ভালবাসি আমি। চোখ জলে ভরে গেছে মার্গারেটের, ভাঙা গলায় কথা বলছে। সুসি ছোট্ট করে হাসলো, বিকৃত হাসি। মার্গারেটের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে উঠলো,—ওগো, কেঁদোনা—দোহাই তোমার। জানো, যারা কথায় কথায় কাঁদে তাদের সহ্য করতে পারি না। আর, তোমার কান্নাভেজা মুখ ওর চোখে পড়লে আমাকে ক্ষমা করবে না সে—

তল্লাটের জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ দিয়ে নয়ারেই সুসি আর মার্গারেট সাধারণত তাদের ডিনারপর্ব সেরে থাকে। একতলায় বাইরের লোকদের জন্যে ঘরটা, সস্তা খাবার পাওয়া যায় এখানে। রান্না ভালো। মালিক, একদা ঘোড়ার ব্যবসায়ী—তার ছেলের জন্যে চালাচ্ছে এই রেস্তোরাঁ। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক বলে পরিচিত। দোতলায় কিন্তু একটা অপ্রশস্ত ঘর, ঘোড়ার নালের আকারে সাজানো তিনটে টেবিল সেখানে—এ জায়গাটা সংরক্ষিত, কিছু সংখ্যক মার্কিন আর ইংরেজ ভাস্করদের জন্যে। কিছু ফরাসী শিল্পীও সপরিবারে উপস্থিত হয় সেখানে, মাঝেমধ্যে। পরিবার অর্থে সবক্ষেত্রে হয়তো ঘরণী নয় তারা, যাক সে কথা—নটিং হিলের কেতার অনুশীলন প্রয়োজন হচ্ছে না, বুলেভার দ্য মন্তপারনাসে-তে, কারণ

সেই প্রায়-স্মরণীয়া অত্যন্ত প্রাচীন মহিলা।

আর্থার বাকডন যখন সেই ঘরে ঢুকলো সেটা পরিপূর্ণ থাকলেও, মার্গারেট তার জন্যে একটা আসন রেখেছিলো। তার ও সুসির মাঝে সেই আসন। অনর্গল কথা চলেছে চারদিকে, বলা বাহুল্য ফরাসী ভাষাতেই। তারস্বর কথাবার্তা। বিতর্কও। বিষয়: পরবর্তী কালের ইম্প্রেশনিস্টদের শিল্পচাতুর্য। আর্থার তার নির্দিষ্ট আসনে বসতে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো একটি দীর্ঘকায় যুবকের। মার্গারেটের অন্যপাশে বসে ছেলেটি। অত্যন্ত দীর্ঘকায়; পাতলা চেহারার ছেলেটি, উজ্জ্বলবর্ণ। উঁচুকলারের জামা পরেছে, লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। শুকিয়ে যাওয়া লিলি ফুলের মত অনেকটা তার মুখভাব।

—ছেলেটা জ্যাগসন, অব্রে বিয়ার্ডসলের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ওর। ফিসফিস গলায় বলে উঠলো সুসি,—ভালো ছেলেটা, দয়ার শরীর। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার আগ্রহ আছে, পরিশ্রমীও। ওর কাজ দেখি নি অবশ্য, তবে কোনো ট্যালেন্ট নেই ওর।

—ওর ছবি ছাখোনি, তাহলে জানলে কি করে? আর্থারের প্রশ্ন।

—ও আমাদের এখানকার কনভেনশন—কারুরই ট্যালেন্ট নেই। পরস্পরকে আমরা সহ্য করি ঠিকই, কিন্তু কারুর শিল্পকলার প্রতি কোনো মোহ নেই। হেসে জানালো সুসি।

—ওই লোকগুলো কে? চারপাশ দেখে বললো আর্থার।

—ওই কোণে যে টাকমাথা ভদ্রলোক বসে, ও হচ্ছে ওয়ারেন। আর্থার সে দিকে চোখ ফেরালো। ছোট্টখাটো লোক। চকচকে টাক মাথায়—বিলিয়ার্ডের বলের মত মসৃণ। গালে সূচোলো দাড়ি একফালি। উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

—লোকটা একটু বেশীই খেয়ে ফেলেছে নয় কি? আর্থার ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ। সবসময়েই ওই অবস্থায় থাকে লোকটা। আর যতই মত্ত

হয় ততই চার্ম বাড়ে ওর। ওর মুখ থেকে কোনো অশ্লীল কথা শুনবে না কখনো। সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, লোকটকে প্রায় প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর বলে অখ্যাত করা যায়। এমন রঙের জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে, আর, যতই বেশী খায় সে, ততই খোলে তার ছবি। কাঁপা কাঁপা হাতে হয়তো কখনো তুলি চালালো, আর সেই কাজগুলোই হয়ে ওঠে অনবদ্য। প্যারিসের চিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর হাতে। অসংখ্য কাজ আছে ওর এই শহরের ওপর, আর সেগুলোতে প্যারিসকে নতুন করে আবিষ্কার করবে প্রতিবারই।

কখন এক ফাঁকে অর্ডার নেবার জন্যে বারমেড এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। ঝকঝকে সাদা পোশাকে ওকে পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। কেমন একটা মাতৃত্বের স্বাক্ষর তার চোখমুখে। চওড়া মুখে লাবণ্য ছড়িয়ে।

—খাবার ব্যাপারে আমার তেমন বাছবিচার নেই। মার্গারেটই অর্ডারটা দিলো আমার হয়ে।

খাবার নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো এবার। ওয়ারেন আর মারিও যোগ দিলো সে আলোচনায়। ওয়ারেন মারির দিকে ফিরলো,—মারি, সোনা—তুমি আর আমাকে ভালবাস না। একদিন ছিলো যখন বোতল চাইলে তুমি মুখ ফেরাতে না।

সবাই হৈহৈ করে রসালো করে তুললো প্রসঙ্গ। তার মধ্যেই মারি দৌড়ে নামলো সিঁড়ি দিয়ে। —নিয়ে ন্যারে এক ট্র্যাজেডীর অবতারণা হয়েছিলো সেদিন—সুসি বলে উঠলো। মারি তো তার প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। লোকটা 'লাভেনিউয়ের' বেয়ারা ছিলো। সে ছুটির দিন বেছে নিয়ে এসে নীচে তো ডিনারের অর্ডার দিয়ে বসলো। মারি আর কি করে। অর্ডার তো নিতেই হবে, নিয়ে এলো খাবার, কান্নাকাটিও হলো—

—হ্যাঁ, কেঁদে ভাসিয়েছিলো মারি। মোটা নাকের এক ছোকরা বলে উঠলো মাঝখান থেকে।—খাবারের ওপর পড়লো চোখের জল,

আমরা লবণাক্ত চোখের জলের খাবার খেলাম। মারিকে বললাম কতকরে শুনলো না, মার-ধোর খায় এখনও মেয়েটা।

মারি এলো সেই মুহূর্তে, খাবার নিয়ে। কিছুকাল আগেকার সেই রোমান্সের কোনো ছাপ নেই তার অভিব্যক্তিতে।

সুসি আবার আর্থারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—এবার ওই লোকটাকে দ্যাখো। ওই—ওয়ারেনের পাশে বসে যে—

আর্থার তাকালো। এক দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ চোয়াড়ে চেহারার লোক নজরে পড়লো তার। কালো গোঁফ মুখজোড়া।

—ওই হলো ও' ব্রায়েন। মনের জোর আর ইচ্ছে থাকলেও যে চিত্রকর হওয়া যায় না তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। লোকটা ব্যর্থ। সে জানেও তা—আর তিক্ততাও বেড়েছে তাই। ওর কথা শুনলে জানবে হেন চিত্রকর নেই যে ওর পাল্লায় এসেছে। সাফল্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছে এমন কাউকে সে ক্ষমা করে না। আর, কেউ মরে না যাওয়া পর্যন্ত তার গুণগানও করে না.

—তাহলে লোকটা তো সঙ্গী হিসেবে খুব লোভনীয়! আর্থার জানালো,—আর, ওর পাশে ওই স্থূলকায়া বৃদ্ধাটি কে, ওই বিদ্ঘুটে টুপি মাথায় ?

—ও মাদাম রুজের মা। ওর পাশেই তো বসে সেও। রুজের রক্ষিতাও—বৃদ্ধা ওকে জামাই বলে ডাকতো। এখন অবশ্য গা-সওয়া হয়ে গেছে ওদের।

মাদাম রুজের দিকে তাকালো আর্থার। ভদ্রমহিলার শরীরে বয়সের ছাপ পড়ছে। তবু, সোজা বসে আছে, মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছে। আর্থারের সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটা হালকা হাসি দিলো, চোখ ফিরিয়ে নিলো আর্থার। রুজে-র চেহারা কিন্তু ব্যবসাদারের, শিল্পীসুলভ নয় মোটেও। ও' ব্রায়েনের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলে চলেছে, নির্ভুল। আলোচ্য : 'সেজানে-র' কাজ।

—আবার পাশে বসে মাডাম মায়ার। পোলাণ্ডে কার বাড়িতে পড়াতো। কিন্তু ওর সুন্দরমুখই কাল হলো ওর। এখন ওই

লোকটার কাছে আছে,—পাসেই যে লোকটা, ল্যাণ্ডসকেপ আঁকেও।

আর্থার সেদিকে চোখ ফেরালো—পরিস্কার কামানো মুখের এক যুবকের ওপর দৃষ্টি পড়লো তার, এক মাথা ধূসর কোঁকড়ানো চুল। সুন্দর মুখের চেহারায় মানানসই পোশাক। কথাবার্তায় আর হাব-ভাবে বয়স ত্রিশের ঘরে বলে অনুমান। অবিরাম কথা বলে চলেছে, যেন শেষ কথা বলছে, স্পষ্ট কথা। পাশের ছোট্ট মেয়েটা একমনে শুনে যাচ্ছে তার কথা। যুবক তাতেই তৃপ্ত।

সুসি সকলের কথাই জানিয়েছে, ব্যতিক্রম ব্যাগলস ছোকরা। নিশ্চল চিত্রের ভাস্কর। আর, ক্লেসন—মার্কিন চিত্রকর। ফ্যাশান-দুরস্ত মানুষ হিসেবেই পরিচিতি ব্যাগলস-এর সিয়ে নয়ারে। ফিট-ফাট পোশাক, পা দুটো সামান্য বাঁকা। দীর্ঘদিন ঘোড়ায় চড়েছে মনে হবে। চুলে সুগন্ধি পোমেড। একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রেটকোট গায়ে। ওয়ারেন তাকে কোটধারী বলেই আখ্যায়িত করে, কারণ তার স্মরণশক্তি তেমন জোরালো নয়। অভিজাত মানুষের সঙ্গে তার ওঠা-বসা আছে, এটা সহজেই বোঝা যায়।

ক্লেসন তার চঞ্চল চোখ আর লাল গালে বিচিত্রভাষী। অবিকল ফ্র্যানজ হ্যালসের মত মুখ তার। ফরসা, ছুঁচোলো দাড়ি। ফরাসী ব্যঙ্গচিত্রে দেখা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরিজি বলে প্যারীসীয় টানে।

সুসি সবে লোকটার অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে দরজা খুলে গেলো। এক দীর্ঘকায় মানুষ ঢুকলো। গায়ের ক্লোকটা খুলে ফেললো নাটকীয় ভঙ্গিতে,—মারি, আমার এই বস্তুটির গতি কর। ওর কথার ভঙ্গিতে হাসির ঝড় বইলো।

—এই লোকটাকে কিন্তু চিনি না আমি। সুসি জানালো।

—আমি চিনি, অন্তত দেখে চিনছি। ডাক্তার পোরোয়েওর দিকে ঝুঁকে বসলো, নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে সে।

—ওই তো তোমার সেই যাদুকর?

—অলিভার হ্যাডো। কৌতুকের গলায় জবাব এলো পোরোয়ের।

আগন্তুক ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে, যেন নির্দেশ জারী করতে চলেছে কিছুর।

—ছবি-টবির পোজ দিচ্ছো মনে হচ্ছে, হ্যাডো? ওয়ারেন শুষ্কস্বরে বলে উঠলো।

—চেষ্টা করলেও পারবে না। ক্লেসন হেসে উঠলো।

অলিভার হ্যাডো তার দিকে ফিরলো,—দুঃখ হচ্ছে, ওয়ারেন সাহেব—তোমাকে দেখে। 'আপেরিতিফ-এর বসে তোমার চোখের উজ্জ্বলতা বেড়েছে!

—আমি মাতাল হয়েছি বলছো?

—হ্যাঁ, এক কথায়—মাতাল!

চিত্রকর ওয়ারেন চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলো, যেন দেহে কোনো আঘাত পড়েছে তার। হ্যাডো এবার ক্লেসনের দিকে তাকালো,— ক্লেসন, তোমাকে তো বলেছি, তোমার যা বিদ্যের দৌড় তাতে কিছু হবার আশা নেই তোমার।

অলিভার হ্যাডো সেই ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে। সুসি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিরাট চেহারার মানুষটা, ছ' ফুটের ওপর উঁচু। কিন্তু তার চেহারায় যে ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা তার দৈহিক স্থূলতা। প্রকাণ্ড মাংসল মুখ হ্যাডোর। বর্লিন যাদুঘরে ভেলাজকুয়েজের আঁকা ডেল বরো-র তৈলচিত্রের ঔদ্ধত্যের প্রতিফলন তার চোখে। অবজ্ঞার হাসিও অবিকল। এগিয়ে হাত মেলালো হ্যাডো ডাক্তার পোরোয়ের সঙ্গে।

—এইযে, জাদুকর বন্ধু! অভিনন্দন তোমাকে—গুরু হিসেবে নয় অবশ্য, আমার ধারণায় মোটামুটি ছাত্র হিসেবে।

হ্যাডোর এই বিচিত্র আচরণে হাসি চেপে রাখতে পারলো না সুসি।

অলিভার হ্যাডো এবার তার দিকে ঘুরলো,—মাদাম, তোমার হাসি আমার কানে কিন্তু পারস্যের বাগানের বুলবুল পাখীর চেয়েও

মিষ্টি শোনাচ্ছে।

ডাক্তার পোবোয়ে পরিচয়পর্ব শুরু করলো। সুসি রয়েছে, মার্গারেট আর আর্থর বারডনের সঙ্গ পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে ঝুঁকে অভিবাদন জানালো হ্যাডো। ও' ব্রয়নের দিকে চোখ পড়তে খেদের গলায় বলে উঠলো,—'বোরদো'-র সঙ্গে তিক্ত জল মিশিয়ে চলেছো তো।

—বসে নিজের ডিনারে নজর দাও না। কর্কশগলায় বলে উঠলো ও' ব্রায়েন।

—দাদা, কবে যে তোমার মাথায় এ' কথা ঢোকাতে পারবো, যে—রূঢ়তার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা মেলে না। শ্লেষের ছুরি রূঢ়তার ভোঁতা ডাণ্ডার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী।

ও' ব্রায়েনের চোখমুখ রাগে রাঙা হলো। তক্ষণাৎ কোনো কথা খুঁজে পেলো না সে। এবার মার্গারেটের পাশের ফ্যাকাসে চেহারার নিরীহ যুবকটির দিকে দৃষ্টি ফেরালো হ্যাডো,—আমার চোখ যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে—তাহলে আমি নিশ্চয় জ্যাগসনকেই দেখছি, যার নামের সঙ্গে অন্তঃসারতার উপমাই চলে একমাত্র। জানতে ইচ্ছে করে এখনো তুমি তোমার শিল্পচর্চায় নিযুক্ত কিনা—

বেচারা জ্যাগসন! এভাবে আক্রান্ত হয়েও নিশ্চুপ রইলো, মুখের রঙ বদলে গেছে তার। এবার ফরাসী মায়ারের পালা। হ্যাডো বলে চললো,—তা কিসের ওপর বক্তৃতা চলছিলো? মাইকেল এঞ্জেলোর মহত্ত্ব, নাকি ওয়াগনারের শিল্প অনুসন্ধিৎসা?

—আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। মায়ার উঠে পড়লো, ভ্রু কুঁচকে।

—তোমার মুখনিসৃত বাণী থেকে বঞ্চিত হলাম—বিদগ্ধ ঠোঁট থেকে মুক্তো ঝরার প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকতে হলো—মাদাম মায়ারের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো হ্যাডো, ঠোঁটে হাসি তার—ঘরটা ভর্তি দেখলাম তো, তাই নেপোলীয়নীয় প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে অবমাননাকর উক্তির মাধ্যমে জায়গা করে নিলাম নিজের। অভিনন্দনের বিষয় এটা,

যে আমার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ব্যাপারগুলো র‍্যাগলস বোকাটা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা বলে ধরে নিয়েছে। ফলে একটা আসন শূন্য হলো—সেই সঙ্গে আরও একটা। এতে আমার উপকারই হলো, হাতপা ছড়িয়ে সামান্য খাবারের সদ্ব্যবহার করা যাবে এবার।

মারি মেনুটা তার সামনে ধরতে হ্যাডো গম্ভীর মুখে চোখ বুলিয়ে নিলো তাতে,—ভ্যানিলা আইস একটা, প্রিয়তমা—কচি চিকেনের ব্যাণ্ড, ফ্রায়েড সোল, আর পী স্যুপ।

—বিয়ে', উঁ পোতেজ, উঁ সোল, চিকেন, আর বরফ। শুধরে দিলো মারি।

—কিন্তু আমি যেভাবে খেতে চাইছি, সেইভাবে পাবো না কেন?

মারি এবং বাকি দুই ফরাসী মহিলা—যারা এখনো বসে, বিস্মিত হলো তার এই বিচিত্র অমিতাচারে। হ্যাডো তার মাংসল হাত আন্দোলিত করে বলে চললো,—আমি বরফ নিয়েই শুরু করতে চাই, মারি; তোমার ওই জ্বলন্ত চোখের চাহনি থেকে নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে। পরে, বিনা দ্বিধায় চিকেন উদরস্থ করবো তোমার হাসি থেকে নিজেকে বাঁচাতে। তারপর ফ্রায়েড সোল, শেষে পী স্যুপ দিয়ে শেষ করবো।

ঘরের সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ইতিমধ্যে। অলিভার হ্যাডো তার নিয়মেই খাওয়া শুরু করলো মার্গারেট আর বারডন তাকিয়ে, চোখে অবজ্ঞা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের। সুসির চোখে কিন্তু এখনো কৌতূহল।

হ্যাডো প্রবীণ নয় কিন্তু তার আপাত বয়স বাড়িয়েছে স্থূলতা। মুখচোখ মোটামুটি ছোট, কান, নাকের গড়নও চলনসই। বড় বড় দাঁতের সারি, কিন্তু ঝকঝকে সাদা, সমান। মোষের মত কাঁধ হ্যাডোর। মুখটাও বেশ বড়ই, ভেজা ঠোঁট। কালো, কোঁকড়ানো চুল এমনভাবে পেছনে ঠেলে আচড়ানো যে তার দাড়িহীন মুখটাতে এক নগ্নতা এনে দিয়েছে। এক নিষ্ঠুর ভোগবিলাসী পুরোহিতের প্রতিমূর্তি যেন সে। মার্গারেট তার খাওয়া লক্ষ্য করতে করতে

শিউরে উঠেছে। চরম বিতৃষ্ণার ভাব এসেছে তার মনে।

আলিভার হ্যাডো আস্তে চোখ দুটো তুললো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মার্গারেট তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলো, যেন হঠকারিতা হয়েছে তার। হ্যাডোর চোখ দুটোই তার বৈশিষ্ট্য। ছোট ছোট চোখে এক অতি-নীলের প্রলেপ—দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা। মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয় এ' চোখ। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি সুসি এ চোখের বৈশিষ্ট্যের উৎস—পরে বুঝেছে, অধিকাংশ মানুষের চোখ একই বিন্দুর অভিমুখীন, যখন তাকাচ্ছে সে। কিন্তু হ্যাডোর দৃষ্টি, স্বভাবতই হোক বা অনুশীলিত অভ্যাসবশেই হোক—সমান্তরাল রয়ে যায়। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তোমার অন্তর ভেদ করে যেন সে দৃষ্টি পেছনের দেয়ালে চলে গেছে। ভৌতিক সে দৃষ্টি। হ্যাডোর চরিত্রের আর এক রহস্য—সে সিরিয়াস কিনা বোঝা দায়। তার অদ্ভুত দৃষ্টিতে সবসময়েই এক বিদ্রূপের প্রতিফলন, ঠোঁটে ফুটে আছে দেঁতো হাসি। তার অবমাননাকর উক্তি মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। ভাবতেও খারাপ লাগবে তোমার, যে—তুমি তার দিকে তাকিয়ে হাসির কথা বলে চলেছো—কিন্তু তার মর্যাদা দিচ্ছে না সে।

ওর আগমনে অন্যান্যদের অস্বস্তি বেড়েছে তাই। ফরাসী সদস্যরা বেরিয়ে গেছে। ওয়ারেনও ও' ব্রায়নের সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। র‍্যাগলস আর জ্যাগসনও ঘর ছাড়লো। ক্লেসন নিঃশব্দে তার বিল মিটিয়ে দরজার কাছে পৌঁছতে হ্যাডো তার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো,—ক্লেসন সাহেব, জার্দিন দে প্লাঁতেজে তো সিংহের মডেল আছে তোমার, কিন্তু নিজের মুলুকে কখনো শিকার করেছো?

—না, করি নি। হ্যাডো এ'প্রশ্ন কেন রাখলো জানে না ক্লেসন, কিন্তু চাপা রাগ জমছে তার মনে।

—তাহলে মরা হরিণের মাংস নিয়ে টানাটানি করছে শেয়ালে, আর পশুরাজের আগমনে লেজ তুলে তাদের পালাতেও দ্যাখোনি তাদের নিশ্চয়ই তাহলে।

ক্রেসন সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরোলো। রইলো মার্গারেট, আর্থার, ডাক্তার পোরোয়ে আর সুসি। হ্যাডোর ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেলো।

—তা, তুমিই কি কোনোদিন সিংহ মেরেছো? বাচাল গলায় প্রশ্ন করলো সুসি।

তার বিচিত্রদৃষ্টি এবার সুসির দিকে ফেরালো হ্যাডো।

—শিকারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলেই মনে করি। যে কোনো জীবিত মানুষের চেয়ে আমি বেশী সিংহ শিকার করেছি। তুলনা চলতে পারে একমাত্র উনবিংশ শতকের জুলে গেরার্ডের সঙ্গে, যাকে ফরাসীরা 'লে তিউয়ের দ্য লায়ঁস' আখ্যা দিয়েছিলো। আর কাউকে তো মনে পড়ছে না—

হ্যাডোর এই উক্তিতে নৈঃশব্দ্য নামলো ঘরে। মার্গারেট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে।

—বিনয় নেই দেখছি তোমার। আর্থার এবার বললো।

—ওটা যাদের জন্মের ঠিক নেই তাদের থাকে। আমি তো সে দলের নই।

ডাক্তার পোরোয়ে এবার মুখ তুলে তাকালো, ঠোঁটে ব্যঙ্গের একফালি হাসি তার,—আমার মনে হয় এই সুযোগে হ্যাডো সাহেব তার পরিবার সম্পর্ক কিছু আলোকপাত করবে। আমার তো মনে হয়, ওর জন্মের ব্যাপারটা অবিনশ্বর ক্যাগলিয়োস্ত্রোর মতই অজ্ঞাত, কিন্তু খানদানী বংশ। আর, শিক্ষাদীক্ষাও প্রাচ্যের প্রাসাদগুলোর কোনো নিভৃতে!

—বংশমর্যাদায় আমার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু ডেনিস জেকাহারের সঙ্গে। আর রেমন্ড লালির। আমার পূর্বপুরুষ জর্জ হ্যাডো স্কটল্যাণ্ডে এলেন অ্যান অফ ডেনমার্কের অনুচর হয়ে, এবং অ্যানের স্বামী প্রথম জেমস সিংহাসন পেতে জর্জ হ্যাডোকে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের সম্পত্তি দান করা হলো, আজও সে সম্পত্তির মালিক আমরাই। ইংল্যাণ্ডের তাবড় অভিজাত পরিবারের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ;

মেরেস্টনরা, পার্নেবি বা হলিংটনেরা আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়ে বর্তে গেছে।

—এসবের উল্লেখ রেফারেন্স বইতেই মিলতে পারে। আর্থার শুষ্কস্বরে বললো।

—মিলবে বইকি। হ্যাডো সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো।

—আর প্রাচ্যদেশে যেখানে তোমার যৌবন কেটেছে, যেখানে কালা আদমীরা তোমার সেবা করেছে, আর গুহ্য তথ্য পরিবেশন করেছে, তাই না?

—আমার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা ইটনে সম্পন্ন হয়েছে, অক্সফোর্ড ছেড়েছি আঠারোশো ছিয়াশি বছরে। হ্যাডো ফিরিকার।

—কোন কলেজে ছিলে বলতে আপত্তি আছে? আর্থার শুধোলো।

—হাউসে ছিলাম।

—তাহলে ফ্রাঙ্ক হারেলের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচয় ছিলো?

—নিশ্চয়ই সেন্ট লিউকসে এখন অ্যাসিস্টেন্ট ফিজিসিয়ান সে। ফ্রাঙ্ক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের অন্যতম। হ্যাডো গম্ভীর হয়ে বলে চলেছে—চিঠি লিখে জেনে নেবো তোমার কথা।

—শিকার করা সিংহগুলোর কি গতি করলে তুমি জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে কিন্তু। সুসি বয়েড ব্যগ্রস্বরে বলে উঠলো।

হ্যাডোর নির্লজ্জতা তাকে রাগাতে পারে নি। কৌতুকবোধ করেছে সে, হ্যাডোকে কথা বলাতে চায়।

—স্কিন-এর মেঝের পাতা আছে সেগুলো। স্ট্যাফোর্ডশায়ারে আমার বাড়ির নাম ওটা। একমুহূর্ত থেমে সিগারে আগুন দিলো হ্যাডো,—জীবিতদের মধ্যে আমিই একমাত্র তিনটে গুলিতে তিনটে সিংহের প্রাণ নিয়েছি।

—বুকনি দিয়েও মেরে ফেলা যেতো ওদের। আর্থার মজামারার ভঙ্গিতে বলে উঠলো।

অলিভার হ্যাডো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, তার প্রকাণ্ড হাতদুটো টেবিলে নামিয়ে দিয়ে,—যে জর্মন ভদ্রলোকের সঙ্গে

শিকারে বেরিয়েছিলাম—বার্কহার্ড, অসুস্থ হয়ে পড়লো। শয্যাশায়ী হয়ে। এক রাতে আমার ষাঁড়টির অস্বস্তিকর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো, বন্দুক হাতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। সিংহের নিনাদ উঠেছে কাছেই কোথাও। চাঁদের আলোই শুধু ভরসা। একাই চলতে লাগলাম, কারণ স্থানীয় লোকেরা এখন কোনো কাজে লাগবে না। হরিণের লাস পড়ে থাকতে দেখলাম খানিক দূরেই, শরীর অর্দ্ধভক্ষ্য তার। পশুরাজের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলাম, শিকারের কয়েক গজ দূরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আফ্রিকার সেই বিরাট জায়গা জুড়ে শুধুই নিস্তব্ধতা। চোখ বুজে কথা বলছে হ্যাডো,—অপেক্ষা করছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেলো—রাত শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা পাথরের ওপর দিয়ে তিনটে সিংহ এগিয়ে এলো…না, ছুটি সিংহী, আগের দিন ওদের পায়ের ছাপ দেখে নিয়ে ছিলাম।

—কিন্তু মদ্দা আর মাদী বুঝলে কি করে? আর্থারের গলায় শ্লেষ বাড়ছে।

—সিংহের সামনের পায়ের ছাপ পেছনেরগুলোর চেয়ে কিছুটা বড়। সিংহীদের সামনের আর পেছনের পায়ের মাপ প্রায় একই।

—বলো, বলো—তারপর? সুসি ব্যাকুল।

—ওদের পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। ম্লান আলোয় আরণ্য রজনীর বিরাটকায় প্রাণী মনে হচ্ছে ওদের। সিংহীটা আমার হাতের কাছেই —ছেড়ে দিলাম গুলি—কাটা পাঁঠার মত ছিটকে পড়লো, টুঁ শব্দ নেই। দ্রুতহাতে আর একটা গুলি ভরে নিলাম বন্দুকে। এবার তাক করেই বুঝলাম আমাকে দেখে ফেলেছে পশুরাজ। হুঙ্কার উঠলো তার গলা দিয়ে, বুকটা টান টান তার। দাঁত বের করেছে, মাথাটা ঝুঁকিয়ে…লাল মাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছি। খাড়া ল্যাজটা আন্দোলিত—চোখে আগুন। হুঙ্কার চলেছে…ওই অবস্থাতেই এগোচ্ছে, স্থিরদৃষ্টি মেলে আমার দিকে। হঠাৎ, ল্যাজের একটা ঝাপটা দিলো, লাফাবে এবার। আমিও তাল বুঝে ঘোড়া টিপে

দিলাম। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে শূন্যে উঠে গেলো, নখর মেলে দিলো বাতাসে। খতম! আর এক সিংহী বেঁচে এখনো—ধোঁয়ার মধ্যেই তাকে লাফিয়ে এগোতে দেখলাম। পালাবার পথ বন্ধ আমার; কারণ পেছনে বিরাট পাথরের সারি। সিংহী এগোচ্ছে —কর্কশ, কাশির শব্দে হুঙ্কার। অবশিষ্ট গুলিটাও ছেড়ে দিলাম। ব্যর্থ হলো লক্ষ্য এবারের—এক পা পিছিয়ে গেলাম। পড়লাম ওর সামনেই—সিংহীর লক্ষ্যও ব্যর্থ হলো। আমার পতনকে ধন্যবাদ। তারপরই, ব্যাপারটা বুঝলাম—সিংহীও পড়েছে। তাহলে আমার গুলি ব্যর্থ হয়নি! ওর বুক ভেদ করেই গেছে আমার গুলিটা… কিন্তু ওর পড়াটা সামনের দিকেই হয়েছে। উঠে দাঁড়ালাম যখন, সিংহী মুমূর্ষু…

শিবিরে ফিরে দারুণ প্রাতরাশ চালিয়ে দিলাম একটা।

বিস্ময়কর নৈঃশব্দ্যের কবলে ওরা। ঘটনায় অসত্যতার কোনো ইঙ্গিত নেই। কিন্তু হ্যাডোর বাগাড়ম্বরে নেই দৃঢ়তা। আর্থার বাজি রাখতে পারে। এ'রকম অদ্ভুত মানুষের সম্মুখীন সে হয়নি কখনো, আর এ ধরণের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদার মধ্যে কি মজা থাকতে পারে তাও অজানা তার।

—তোমার সাহস আছে বটে। আর্থার প্রশস্তির ভঙ্গিতে বললো।

—আহত পশুকে বনের গভীরে ধাওয়া করাটাই দুনিয়ার বিপদজনক কাজের অন্যতম, অতএব ঠাণ্ডামাথায় লোক হতে হয়—লৌহ-কঠিন নার্ভও। শান্তস্বর হ্যাডোর।

আর্থারের ওপর এ' বক্তব্যের এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো। হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি পেলো তার। চেয়ারে তার দেহটা ছেড়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। সংক্রামিত হলো হাসি অন্যদের মধ্যেও, বাঁধ ভাঙলো। অলিভার গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করে চললো তাদের। বিস্ময়ের কোনো ছাপ নেই তার চোখে। আর্থার যখন নিজেকে ফিরে পেলো, হ্যাডোর স্থিরনয়ন তার ওপর নিবদ্ধ।

—তোমার হাসির বহর আমাকে কোনো পাত্রের নীচেকার কাঁটার

খসখসানির কথা মনে করিয়ে দেয়।

হ্যাডো অঙ্গদের দিকে ফিরলো, চোখ অচঞ্চল, কিন্তু এক বিচিত্র হাসি ফুটলো,—যে কোনো নির্বোধের এটা জানা থাকা দরকার, কোনো মানুষ ভয়শূন্য হলেই একমাত্র প্রেতদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অব্যবস্থচিত্তেরা পারে না তাদের বাগে আনতে।

বিস্ময়ে হতবাক তাকিয়ে রইলো আর্থার তার দিকে। কি বলতে চায় লোকটা, বোঝে না সে। তবে, হ্যাডোর ভ্রূক্ষেপ নেই, বলে যাচ্ছে,—কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ যদি সবল হয়, সক্রিয়—তাহলে দুনিয়াকে বশ করতে পারবে সে। ঝড়ঝঞ্ঝা বাধা হবে না, রোদজল কোনো কিছুতেই কিছু হবে না।

ডাক্তার পোরোয়ে হ্যাডোর এই রহস্যপূর্ণ কথাবার্তার ব্যাখ্যা খুঁজলো,—এই মহিলারা এসব গুহ্য তথ্যের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। মধ্যযুগে এসবের চল ছিলো—অদৃষ্ট-রহস্যের। শক্তির উৎস ছিলো মানুষগুলো শুধু। জীবনটা তো একটা সিম্বল।

—তুমি যখন ওই জাদু আর মিস্টিসিজম-এর কথা বলো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।

—অথচ, ম্যাজিক, বা যাদু হচ্ছে অদৃশ্য কোনো বস্তুক দৃশ্যমান করে তোলার কৌশল। ইচ্ছাশক্তি, ভালবাসা, আর কল্পনাশক্তি এগুলো সবই যাদুর অঙ্গ—সবারই আছে সে শক্তি। এ সবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যে করতে পারে, সেই প্রকৃত যাদুকর। একটাই মতবাদ; দৃশ্যমান কিছুকে দিয়ে অদৃশ্যকে মাপা।

—তাহলে আধারের পক্ষে কি শক্তি থাকা সম্ভব তা জানাবে কি?

—আমার কাছে ষোড়শ শতকের একটা পাণ্ডুলিপি আছে। তাতেই বলা আছে এ'সব। সলোমনের যে চাবির গোছা এবং বাঁ হাতে প্রস্ফুটিত আমণ্ড গাছের শাখার উল্লেখ আছে, তার সুবিধে একুশ দফা। অমর হয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি হয় সে, সাত জিনের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ হয় তার। সমস্ত রকম ভয় ও যন্ত্রণার উর্ধ্বে সে। স্বর্গ ও নরকের সঙ্গে আছে সংযোগ। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের অস্ত্র

বলে বলীয়ান সে। অমরত্বেরও।

—এগুলোর অধিকারী হয়ে থাকলে বুঝতে হবে অনেক দূর এগিয়েছো তুমি। আর্থার ব্যঙ্গের সুরে কথা বলছে।

—যে কোনো মানুষই পারে অদৃশ্যকে নিয়ে কাজ করতে। ভারী কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বললো হ্যাডো।

আর্থার কোনো উত্তর দিলো না। কৌতূহলের চোখে শুধু তাকালো হ্যাডোর দিকে সে। নিজেকে প্রশ্ন করলো; এ সব বিশ্বাস করা যায় কিনা। লোকটা সিরিয়াসলিই তো বলছে সব। চোখ দুটোতে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি ..তাতেই গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে বোধহয় তার কথায়।

ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো.—যৌবনে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করিনি, কারণ—বিজ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয়ের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে শিখিয়েছে। তবে, প্রাচ্যদেশে এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যার ব্যাখ্যাও মেলেনি বিজ্ঞানের অভিধানে। সে দেশের অবিশ্বাস্য ঘটনাকে উড়িয়ে দিতে দেখেছি মানুষকে কিন্তু পুরাপুরি ব্যাপারটাকে ভুলতে পারেনি তারা।

অধৈর্যের ভঙ্গি করলো আর্থার,—একটা কথা স্বীকার করতে পারছি না আমি, পূর্বদেশগুলোতে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেও বিজ্ঞানের কোনো হাত আছে অলৌকিক প্রক্রিয়াগুলোয়, বিশ্বাস হয় না। হ্যাডোর কথা বিশ্বাস করলেও এসবের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

—বিজ্ঞানসম্মত মন নিয়ে অবশ্য তর্ক করছো তুমি। বিজ্ঞানের বাইরে যে কিছু আছে তা অস্বীকার করাটাও বোকামি। হ্যাডো উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলে চলেছে। তোমার বুকের ডানদিকে হৃদযন্ত্রের অবস্থান ধরে নিই যদি, স্টেথোস্কপ সব সময়ে বাঁদিকেই বসাবে চিকিৎসক। যে লোক জুয়া খেলে সে হারবে জেনেও খেলে চলে। একটাই স্বপ্ন, কখনো বড় কিছু পাবে। অজানাকে জানার চেষ্টা করাটা কি কিছুই নয়?

হ্যাডো ক্রমেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, তার চোখে এসেছে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি,—আমার মনের গম্ভীরে অজানাকে জানার,—গোপনতম তথ্যসংগ্রহের যে অদম্য ইচ্ছে লুকিয়ে আছে, তার খবর তোমরা কি জানবে!

কিছুটা নিস্তব্ধতার পর সুসি হঠাৎ আনন্দঘনস্বরে বলে উঠলো, —সে যাইহোক্, আমার কিন্তু দারুণ আনন্দ হচ্ছে এক যাদুকরের দেখা পেয়ে—

মাংসল হাতটা শূন্যে আন্দোলিত করে বলে উঠলো হ্যাডো, —ভাই বলে ডাকলেই খুসী হবো।

—এরকম 'অসার' কিছুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এতো গভীর বলে আমার মনেই হয়নি কিন্তু। আর্থার হেসে কথা শেষ করলো।

প্রচণ্ড ক্রোধে রক্তবর্ণ হলো অলিভার হ্যাডোর মুখ। তার অস্বভাবিক চোখ দুটো নীল হয়ে গেলো, ঘৃণায় কুঁচকে গেলো ঠোঁট। সম্রাট নীরোর নৃশংস অভিব্যক্তি ফুটলো তার চোখমুখে। স্থূল রসিকতা তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। সুসি ভয় পেলো, এবার বুঝি হাতাহাতি লাগলো। সে তাড়াতাড়ি বলে ফেললো,—সত্যি, মেলায় যেতে হলে এবার কিন্তু আমাদের উঠতে হয়। মারি তো আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচি।

ওরা উঠে পড়লো। দুদ্দাড়িয়ে নেমে গেলো সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায়।

ব্যস্ত জনবহুল রাস্তায় নেমে এলো ওরা। বুলেভার দু মন্তপার-নাসের দিকের রাস্তায়। ইলেকট্রিক ট্রামগুলো কর্কশ ঘন্টাধ্বনি করে চলেছে দু'পাশে। মেলার জায়গাটা হলো—লায়ঁ দে বেলফোর—এ। মাইল খানিকও নয়। যাত্রার মুহূর্তে হঠাৎ ঘটনাটা ঘটলো। সুসি চালককে গন্তব্যের নির্দেশ দিতে, হ্যাডো—যে এতক্ষণ ওদের চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো, ঘোড়ার গলায় তার হাতটা রাখলো। ঘোড়াটা কাঁপতে শুরু করলো...সারা শরীরে বয়ে গেলো শিহরণ জন্তুটার। গাড়োয়ান লাফিয়ে নেমে এলো, ঘোড়াটার মাথাটা তুলে ধরলো। সুসি আর মার্গারেটও নেমে পড়েছে। এক

যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। ঘোড়াটা যেন যন্ত্রণার শিকার নয় আসলে, এক অস্বাভাবিক আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছে ..সুসির হঠাৎ কি মনে হলো, হ্যাডোর উদ্দেশে বলে উঠলো,—হাতটা সরিয়ে নাও না।

হ্যাডোর ঠোঁটে হাসি দেখা দিলো। সুসির কথায় হাত উঠিয়ে নিলো সে। কাঁপুনি ছেড়ে গেলো ক্রমে। স্বাভাবিক হয়ে এলো ঘোড়া। একটু ভয় যেন থেকে গেছে তবু।

—কি হলো কি ওটার, কে জানে! আর্থার বললো।

অলিভার হ্যাডো তার সাগর-নীল চোখে তাকালো এবার আর্থরের দিকে, সে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, টুপিটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে একটু তুলে বিদায় নিলো সে। হ্যাডো চলে যেতে সুসি ডাক্তার পোরোয়ের দিকে ফিরলো,—তোমার কি মনে হয় যাদুকরই ওই অবস্থা করেছিলো ঘোড়াটার? জন্তুটার ঘাড়ে হাত রাখামাত্র কেমন হয়ে গেলো সেটা, আবার হাত সরিয়ে নিতে স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

—ননসেন্স! আর্থার উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলো।

—কোনো কায়দা করেছে হ্যাডো, মনে হলো আমার। পোরোয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠলো,—আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো যখন ও, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিলো। আমার দুটো বেরাল আছে বাড়িতে, খাস পারস্যবংশোদ্ভূত জীব সে-দুটো। ঘরের আগুন-কুণ্ডের সামনেই পড়ে থাকে সে-দুটো, সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্যায় মগ্ন থাকে তারা। হ্যাডো ঢুকতেই ওরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছিলো, লোমখাড়া হয়েছিলো ওদের। পরে, ওরা উন্মত্তভঙ্গিতে দৌড়ে চললো, সারা ঘরময়—এক ভয়ানক আতঙ্কের শিকার হয়ে পড়েছে যেন। শেষে দরজা খুলে দিতে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো সেদুটো। ব্যাপারটা যে কি হলো বুঝতেই পারলাম না।

মার্গারেট শিউরে উঠলো,—সত্যি আমি এমন মানুষ দেখিনি জীবনে, ক্লেদাক্ত জীব যেন। ওর মধ্যে কি আছে জানি না, তবে—ভয় হয় আমার। এখনো যেন ওর সেই চোখ দুটোর দৃষ্টি চোখে

ভাসছে আমার। আমার সঙ্গে আর দেখা না হলেই ভালো, বাব্বা।

অর্থার একটু হেসে মার্গারেটের হাতটা ধরে চাপ দিলো একটু মার্গারেট চেপে ধরেছে তার হাত কাঁপছে। হ্যাডোর সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই আর—পাগলে যা বিশ্বাস করে, তা নিয়েই কারবার লোকটার, অথবা ভণ্ড বুকনি দিয়ে রাজ্য জয় করার মতলব তার। যাহোক, প্রশংসনীয় তার এই সবক বকলাপ। তবে এটা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত—হ্যাডো সাধারণ অন্য যে কোনো অলৌকিক কিছু করার ক্ষমতা নেই তার মত মানুষেরই

আমি কি করতে চাইছি, বলি। ওর সঙ্গে যদি সত্যিই ফ্রাঙ্ক হারেলের পরিচয় থেকে থাকে তাহলে সবই জেনে ফেলবো। আমি আজই চিঠি ছেড়ে দিচ্ছি হরেলকে সব লিখে।

—তাই দাও বরং লোকটা কিন্তু আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্যারিসের মত জায়গা তো দুনিয়ায় নেই এমনসব বিদঘুটে মানুষের দেখা পাবার মত। আবোল-তাবোল সব কিছুকেই বিশ্বাস করে এমন মানুষের তো অভাব নেই এখানে। এমন কোনো ধর্ম নেই, যাকে অস্বাভাবিক মানুষের অভাব আছে। তবে, এমন একটা লোকের সংস্পর্শে আসা ভাগ্যের কথা, এই বিংশশতকে—যে এসবে বিশ্বাসী।

—আমি এসব ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে অবশ্য বেশ কিছু অস্বাভাবিক মানুষের দেখা পেয়েছি। পোরোয়ে ধীর গলায় বলে গেলো,—তবু, মিস ডয়েডের সঙ্গে আমি একটা ব্যাপারে একমত—অলিভার হ্যাডো লোকটা সত্যিই অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তবে, একটা ব্যাপারে খটকা থেকেই যাচ্ছে, ও যা বলে তার কতটুকু নিজে বিশ্বাস করে বলতে পারবো না। নিজেকে ঠকাচ্ছে কি সে, নাকি মানুষকে ঠাট্টা করেই আনন্দ পায় সে? যতটুকু জানি, হ্যাডো বহু দেশ ঘুরেছে আর অনেকগুলো ভাষায় দখলও আছে ওর। অপরসায়নে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও আছে। যাদুর ওপর হেন বই নেই যা পড়েনি

সে। পোয়ারোর মাথাটা আস্তে ঝাঁকালো,—ওর সম্বন্ধে মতামত জাহির ক'রতে চাই না। আমার বন্ধু আর্থারের ফিলিংস্ আঘাত না করেই বলবো, লোকটা অলৌকিক ক্ষমতারও অধিকারী এটা জানলে আশ্চর্য হবো না।

আর্থার কোনো উত্তর দেবার আগেই ওরা পাঁয়দে বেলফোর-এ পৌঁছে গেলো।

মেলা পুরোদমে চলছে। প্রচণ্ড শব্দ চারদিকে, কানফাটানো। বাদ্য বেজে চলেছে একদিকে। চরকি চলেছে। দোকানে দোকানে তারস্বর আহ্বান চলেছে। আলোর জোয়ার চারদিকে। এক আশ্চর্য দৃশ্য।

ওরা ঢুকতে দেখলো অলিভার হ্যাডো এসে পড়েছে।

ওর সঙ্গ যে তাদের কাছে তেমন প্রীতিকর মনে হচ্ছে না, তাতে কিন্তু হ্যাডোর ভ্রূক্ষেপ নেই। দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে চলছে সে কারণ যথার্থভাবে হ্যাডো অত্যন্ত চালু। লোক ডেকে দেখিয়ে বল নাকিও ক'রছ কি সব। একটা স্পেনীয় ক্লোক জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে—লাল আর ভেলভেটে খোলস ই। লম্বা চেহারায় মানিয়েছেও।

ওরা বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরছে। ক্রমে একটা লোকের কাছে এলো—কালো কাগজের মূর্তি বানাচ্ছে সে। হ্যাডোও জুটে গেলো, তার মূর্তি বানাবে। ভীড় হয়ে গেলো চারদিকে। দম্ভের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হ্যাডো।

মার্গারেট সরে যেতে চেষ্টা করতে সুসি তার হাত ধরে ফেললো,—লোকটা দারুণ মজার, তাই না? ওকে কিন্তু চোখের বাইরে হতে দিচ্ছি না আমি। ফিসফিস করে বলে উঠলো সে।

মূর্তির কাজ শেষ হতে, সামান্য ঝুঁকে হ্যাডো সেটা বাড়িয়ে ধরলো মার্গারেটের দিকে,—অলিভার হ্যাডোর অস্তিত্বের একমাত্র

নিদর্শন গ্রহণ করে বাধিত কর।

—ধন্যবাদ। মার্গারেট জড়সড় গলায় বললো।

নেবার আদৌ ইচ্ছে নেই মার্গারেটের, ওটা তবু কৌতূকহলে একটা খামে ঢুকিয়ে দিলো হ্যাডো সেটা তাকে।

ওরা হেঁটে চললো। একটা ক্যাম্বিসের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রাচ্যদেশীয় একটা নাম খোদাই তাতে। কাপড়ে আঁকা বিচিত্র সাপের সমারোহ। আরব-বর্ণে বিচিত্র শব্দও খোদাই। সদরে একটা কালা আদমী পা মুড়ে বসে, ঢাক পিটিয়ে চলেছে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বাজনা বন্ধ করে দিলো সে, ভাঙ্গা ফরাসীতে কথা শুরু করে দিলো।

—নীলনদের ঘোলা জলের কথা মনে করিয়ে দেয় না, এসব? চলো ঢুকে দেখি কি ব্যাপার-স্যাপার। হ্যাডো বললো।

ডাক্তার পোরোয়ে এগিয়ে লোকটার সঙ্গে তার মাতৃভাষায় কথা শুরু করে দিলো।

—লোকটা অ্যাসউট থেকে এসেছে, মিশরের। ডাক্তার অন্যদের দিকে ফিরলো।

—আমি তোমাদের সবাইর টিকিট কিনছি। হ্যাডো এগিয়ে তাঁবুর কাপড় সরিয়ে দিলো। সুসি ঢুকলো। মার্গারেট আর আর্থরও অনিচ্ছায় ঢুকলো পেছনে পেছনে। 'কালা আদমী' ওদের পেছনে কাপড়টা টেনে দিলো।

নোংরা তাঁবুর ভেতরে এসে দাঁড়ালো ওরা। দুটো ধোঁয়ায়-ভর ল্যাম্পো জ্বলছে। উন্মুক্ত মেঝেয় বৃত্তাকার ডজন খানেক টুল বসানো। এক কোণে এক মেয়েমানুষ বসে, অনড়। কালো, নোংরা একটা ওড়না পরনে। মুখটা বোরখায় ঢাকা। শুধু বড় বড় চোখ-দুটো দেখা যাচ্ছে ফাঁক দিয়ে। কাজলে মাখা চোখের পাতা। হাতের আঙুলে 'হেনা' মাখানো।

ওরা ঢুকতে সামান্য নড়ে বসলো মেয়েমানুষটা। বাইরের লোকটা ঢাকটা তার দিকে এগিয়ে দিতে, সে হাত দুটো ঘষে চললো তাতে।

একটানা শব্দ হয়ে চললো...গুনগুন···রহস্যের ছোঁয়া সে শব্দে। এক বিদঘুটে গন্ধ ছড়িয়ে তাঁবুটার ভেতরে, কায়রোর দুর্গন্ধময় রাস্তাগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধুপধুনোর সঙ্গে গোলাপের খুসবু। সুসি আর মার্গারেট নাকে কাপড় চাপা দিলো। সুসি সিগারেট চাইলো। 'কালা আদমীর' কানে ইংরিজি শব্দ কানে যেতে দাঁত বের করে হাসলো সে। ঝকঝকে সাদা দাঁতের ফাঁকে।

—মহম্মদ নাম আমার। সর্দার লর্ড কিচেনারকে সাপ খেলা দেখিয়েছি একদিন, আপনাদেরও দেখাবো। সাপ কিন্তু খুব বিপদজনক।

লম্বা নীল গ্যাবার্ডিনের পোশাক লোকটার পরণে। প্যারিসের চেয়ে নীলনদের রোদে ধোঁয়া সৈকতেই মানাচ্ছো ভালো যেটা। ময়লাও চোখে পড়ছো না।

তাঁবুর কোণ থেকে একটা কম্বলের তলা থেকে ছাগলচামড়ার বস্তা বের করলো লোকটা। বৃত্তের মাঝখানটাতে রাখলো সেটা সে। মার্গারেটের গা ঘিনঘিন করে উঠলো--বস্তাটা নড়ে উঠেছে। মেয়েমানুষটা কিন্তু ঢাকে অঙ্গুল দিয়ে চলেছে। থেকে থেকে একটা বর্বর চিৎকার দিয়ে উঠছে। আরবটা ঝকঝকে দাঁতে হাসলো, থলের ভেতর হাত চালিয়ে দিলো—যেন শস্যের থলিতে হাত দিয়েছে।

একটা প্রকাণ্ড সাপ বের করে আনলো সেটা থেকে, পাক খেয়ে চলেছে সরীসৃপটা। মেঝের সেটাকে ফেলে একমুহূর্ত অপেক্ষা করলো, পরে তার ওপর হাত চালালো; চোখের পলকে সাপটা শক্ত হয়ে গেলো, যেন ইস্পাতে গড়া।

শুধু চোখদুটোতে জীবনের স্পন্দন—নিষ্ঠুর চোখে।

--দ্যাখো তোমরা। এই আলৌকিক শক্তিই প্রয়োগ করেছিলো মোজেস—ফারাওয়ের সামনে।

আরবটা একটা বাঁশীর মত বস্তু বের করলো এবার, গ্রীক পুরাণে উল্লেখ যে ধরণের বাঁশীর। একঘেয়ে সুর বাজিয়ে চললো সে। সচল হলো সাপটা, মাথা তুললো ধীরে ধীরে। বিরাট চেহারাটা খাড়া করলো; ল্যাজের ওপর খাড়া হয়ে উঠলো।

দুলতে শুরু করলো সাপ···

অলিভার হ্যাডো যেন ভীষণ আকর্ষণবোধ করছে। সাগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দিলো সে, তার অস্বাভাবিক চোখদুটো সাপুড়ের দিকে ধরেছে, এক অবর্ণনীয় দৃষ্টি তার চোখে।

—ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা এমন জীবজন্তু নিয়ে কাজ করে যেগুলোর বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আর্থার বলে উঠলো।

উত্তর দেবার আগে অলিভার হ্যাডো ওর দিকে তাকালো। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার আগে তাকে দেখে নিচ্ছে, কি ধরণের মানুষ সে।

—একটা লোক সাপুড়ে হয় তখনই, যখন বিনা ওষুধে বিষাক্ত সরীসৃপের দাঁতেও তার ক্ষতি না করতে পারে।

—তাই মনে হয় কি তোমার? আর্থার প্রশ্ন রাখলো।

—গোখরোর কামড় খেয়ে আমি এক পাকা সাপুড়েকে মরতে দেখেছি, মাদরাজে। দু'ঘন্টার মধ্যে মরে গেলো লোকটা। তার অনেক কথাই শুনেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে, তাই তাকে ধরে বসলাম একদিন, সাপুড়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমরা যখন পৌঁছলাম, সে বেরিয়েছে। অপেক্ষা করে চললাম। অল্প পরেই এলো লোকটা—সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গ। আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম। সাপগুলোকে আনিয়ে বিস্ময়কর সমস্ত খেলা দেখালো সে আমাদের। সে সব জীবনে শোনেনি এ' লোকটা। বিয়ে-বাড়ি থেকে ফিরেছে, প্রচুর মদ্যপানের ফলে মাতাল। শেষে থলি থেকে গোখরোটাকে বের করে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিলো। হঠাৎ সাপটা একটা কাণ্ড করে বসলো, ওর চোয়ালে দিলো কামড়। ছোট্ট বিন্দুর মত দুটো দাগ পড়ে গেলো। যাদুকর পিছু হটে এলো,—আমি মৃত। ঘোষণা করে দিলো সে। লোকটার আশে-পাশে যারা ছিলো সাপটাকে মারতে উদ্যত হলো। লোকটা তাদের নিবৃত্ত করলো,—ওটাকে বাঁচতে দাও। আমার পেশার অন্য মানুষদের উপকারে লাগবে সাপটা, আমার কাছে এর প্রয়োজন যদিও

ফুরিয়েছে। আমাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

—সবাই ওকে ধরাধরি করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। দু'ঘন্টার মধ্যেই মারা গেলো লোকটা। মত্তাবস্থায় মন্ত্র ভুলে বসেছিলো, তাই মরতে হলো তাকে।

—তোমার ঝুলিতে মেলাই আষাঢ়ে গল্প আছে দেখছি। এই সাপ-গুলো যে বিষাক্ত তার প্রমাণ কই? আর্থার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে উঠলো।

অলিভার হ্যাডো সাপুড়েটার দিকে ফিরে আরবীতে কিসব বললো। পরে আর্থারের উত্তরে বললো,—এর কাছে এক বস্তু…আছে, বিজ্ঞানের ভাষায় 'সিরা স্তম' বলো যাকে তোমরা। মিশরীয় সাপ-কুলে সবচেয়ে বিপদের সরীসৃপ এরা। ক্লিওপেট্রাস অ্যাস্প বলেই পরিচিত এগুলো, সিজারের রক্ষিতার কাছে আনা হয়েছিলো এরই পূর্বপুরুষদের কাউকে—অগাস্টাসের বিজয়কে যাতে সে বিদ্বেষের চোখে না দেখে।

—তা, তুমি কি করতে যাচ্ছো? সুসি প্রশ্ন করলো এবার।

হ্যাডোর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলে গেলো। কোনো জবাব দিলো না সে। তাঁবুর কেন্দ্রস্থলে এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো, আরবীতে বিড়বিড়িয়ে বলে চললো হ্যাডো। পোরোহিত্য সেটার তর্জমা করে শোনালো সবাইকে:

'হে সর্প, তোমাকে আদেশ করছি—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে, সামনে এসো। তুমি নিতান্তই একটি জীব, এবং ঈশ্বর সবার ওপরে। আমার আদেশ পালন করো—এসো।—

ছাগলচামড়ার থলে নড়ে উঠলো, কিছু পরেই একটা মাথা বেরিয়ে এলো। ছোট্ট শরীরও বেরোলো, হালকা ধূসর বর্ণের এক সাপ, দুটো চোখের ওপরই ক্ষুদে শিং দু'টা। সামান্য কুঁকড়ে রয়েছে।

—চিনতে পারো? ডাক্তারের কানে কানে প্রশ্ন করলো হ্যাডো।

—পারছি।

সাপুড়ে কিন্তু চুপচাপ বসে। মেয়েমানুষটাও তার রহস্যময় বাদ্য

থামিয়ে দিয়েছে। হ্যাডো সাপটাকে ধরে তার মুখটা ফাঁক করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা তার হাতে জড়িয়ে গেলো, দাঁত বসিয়ে দিলো চোখের পলকে। আর্থার তাকিয়ে আছে হ্যাডোর দিকে, যন্ত্রণার কোনো ছাপ পড়লো না অলিভার হ্যাডোর চোখমুখে। মোচড় খাওয়া সাপটা ঝুলছে তার হাত থেকে। আরবীতে কিছু বললো হ্যাডো—ছাদ থেকে জলের ফোঁটা পড়ার মত সাপটা তার হাত থেকে খসে পড়লো। রক্ত ঝরে চলেছে। হ্যাডো ক্ষতস্থানে তিনবার থুথু ছিটোলো, বিড়বিড় করে কিছু বলছে,—ওদের অগোচরে বার তিনেক আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থান ঘষে নিলো। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলো মুহূর্তে···হাতটা আর্থারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো হ্যাডো, এটা তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে—পয়লা ক্ষেপেই আরোগ্য, নয় কি?

আর্থার হতবাক, বিরক্তও। রক্তপাত বন্ধের পেছনে কোনো দৈব হাত আছে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় সে,—সাপটা যে বিষাক্ত তা কিন্তু জানা হয়নি আমাদের।

—আমার কাজও তো শেষ হয়নি। হ্যাডোর ঠোঁটে সেই বিচিত্র হাসি। মিশরীয় লোকটার উদ্দেশে আবার কিছু বললো সে। লোকটা তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে মেয়েমানুষটা উঠে একটা বাক্স খুলে সাদা খরগোস বের করলো একটা। কান ধরে তুললো খরগোসটাকে সে, পাগুলো শূন্যে আন্দোলিত সেটার। হ্যাডো সেটাকে এবার সাপের সামনে ধরলো। কেউ নড়বার আগেই সাপটা বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে এলো খরগোসটার দিকে, দংশন করলো···হতভাগ্য জীবটার গলায় একটা মৃদু আর্তনাদ উঠলো শুধু। একটা শিহরণ বয়ে গেলো তার শরীরে, প্রাণহীন দেহটা ঢলে পড়লো তার।

মার্গারেট চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো, ওঃ, কি নিষ্ঠুর! কি নোংরা—

—এবার বিশ্বাস হলো কি? হ্যাডো শান্তগলায় বললো।

মার্গারেট আর সুসি দরজার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো,

ভয়ার্ত তারা—সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি একটা ঘৃণাভাব তাদের।

অলিভার হ্যাডো আর সাপুড়ে তাঁবুতে রয়ে গেলো…

ইলে সেন্ট লুইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে রবিবার আমন্ত্রণ। পথে কিছুক্ষণের জন্যে অবশ্য লুভর-এ ওরা থামলো। সময় কাটাতে।

ছুটির দিন। ছবির গ্যালারীগুলো মানুষ ঠাসা। যাদুঘরের প্রাচীন ভাস্কর্যের অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জন। মার্গারেটের মনে এক আশ্চর্য ভাবাবেগের উদয় হলো, বর্ণনা করা যায় না তা। অপার্থিব এক অনুভব। আর্থার কিন্তু এতাবৎ শিল্পকলা নিয়ে মাথা ঘামায়নি, জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে মার্গারেটই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাস্তববাদী আর্থরের জীবনে সৌন্দর্যের স্থান যদিও অপ্রধান, মার্গারেটের প্রতি তার অনুরাগ অনেকখানি কাজ করেছে—কারণ প্রণয়িনীর ভাল লাগার সঙ্গে একান্ত হতে হবে তাকে। মার্গারেটের পাশে পাশেই চলেছে সে—তার উচ্ছ্বাসের কলতান কানে নিয়ে। গ্রীক অ্যানাটমির পূর্ণতা তাকে আকর্ষণ করেছে। এক ক্রীড়াবিদের প্রস্তরমূর্তি তার দৃষ্টি কেড়েছে। গ্রীসিয় নৈসর্গিক বর্ণনা মার্গারেটের মুখে শুনতে খারাপ লাগছে না আর্থারের। কোনো পুরুষকণ্ঠে এ'বর্ণনা তার অবশ্যই ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতো।

কিন্তু, লা ভিয়ানে দে গেবিস-এর স্ট্যাচু তাকে নাড়া দিয়েছে। মার্গারেট হেসেছে এ' নিয়ে, তবে অ-সুখী মনে হয় নি তাকে। এ মূর্তিটার প্রতি আর্থারের আকর্ষণের অন্যতম কারণ হিসেবে মনে হয়েছে তার, শুধুমাত্র মূর্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ নয় আর্থার—মার্গারেটের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেয়েছে সে। গ্যালারীর একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেটা. দৃষ্টিহীন হোমারের সঙ্গে বন্ধুত্বের অমানবীয় স্বাদ নিয়ে। এনডাইমিয়নকে যে দেবী প্রেম নিবেদন করেছে তার ঔদ্ধত্যের সঙ্গেও নেই মিল। একটি কিশোরীর সঙ্গেই কেবল চলে তুলনা। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।

আর্থারের চোখে মার্গারেটর এসমস্ত বস্তু দুর্লভ সম্পদেরই অধিকারিনী। গ্রীসিয় ভাস্কর্যের আভাষ তার মুখচোখে। সেই

অচেতন ধৈর্য। গায়ের বর্ণে ভোরের আর সাঁঝের সূর্যালোকের গাঁটছড়া বাঁধা।

—বোকার মত করো না। আর্থারকে মূর্তিটির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো মার্গারেট।

ধীরে চোখ ফেরালো আর্থর ওর চোখে চোখ রাখলো সে। মার্গারেট দেখলো, আর্থারের চোখে জল।

—কি হলো কি?

দীর্ঘশ্বাস পড়লো আর্থরের,—তুমি এত সুন্দর না হলেই ভালো ছিলো। কেমন নিরীহ ভঙ্গীতে বললো সে।—আমার মনে হচ্ছে আমাদের সুখের বাধা কিছু একটা হবে—সুখী হতে পারবো না আমরা। এত সুখ কি সইবে আমার কপালে।

মার্গারেট কোনো উত্তর দেয়নি, আর্থরের হাতটা শুধু নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়েছে। ওর প্রতি ছেলেটার এই ভালবাসায় ওকে কেমন অন্য মানুষ মনে হয়।

—এতদিন আমার সবকিছু ভালোভাবেই কেটেছে, নিজেকে যেন শোনাচ্ছে আর্থার,—যখনই সত্যি করে কিছু চেয়েছি, পেয়েছি তা। এখন আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কেন সব কিছু, বুঝতে পারি না।

অবস্থার বিরোধিতার মোকাবিলা করতে চাইছে আর্থর। হঠাৎ গাঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে,—নিজেকে এত অসুস্থ মনে করছি কেন, বোকার মত। বিড়বিড় করে উঠলো সে।

মার্গারেট হেসে উঠলো। ওরা গ্যালারী থেকে বেরিয়ে জাহাজ ঘাটার দিকে চললো। সেতু পেরিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে ডাক্তার পোয়োয়ের বাড়িতে পৌঁছালো।

সুসি দলছাড়া হয়ে পড়েছিলো। ছুটির ভীড় ঠেলে বুলেভার সেন্ট মিচেল দিয়ে চলেছে। প্যারিসের এই অঞ্চলটাই তার কাছে অতিপ্রিয়। সেইনের তীরে রয়েছে এক নিবিড় আকর্ষণ। ছোট্ট ছোট্ট রাস্তাগুলো তাদের সুন্দর বাড়ির সার নিয়ে দাঁড়িয়ে, মফস্বলের রাস্তার আমেজ বয়ে নিয়ে। রাস্তার নামগুলো রাজতন্ত্রের

দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নত্র্ দাম গির্জা তার ঐশ্বর্য নিয়ে খাড়া। সুসির ইচ্ছে করছে পাথরগুলোতে ঠোঁট ছোঁয়ায় তার।

ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছলো সুসি। চওড়া সিঁড়ি উঠে ডাক্তারের দরজায় পৌঁছলো সে। বোতাম টিপে দিলো দরজার।

ডাক্তার পোষোয়ে স্বয়ং খুলে দাঁড়ালো দরজা,—অর্থর আর মাদামোয়াজেল এসে গেছে। সুসিকে ভেতরের রাস্তা দেখিয়ে জানালো ডাক্তার।

ওরা খানারঘর পেরিয়ে চললো। নিখুঁত ঘরটা। কাঠের কারুকাজ করা। লাইব্রেরীতে এলো শেষে। প্রশস্ত ঘর, সারা ঘর জুড়ে বইয়ের তাক। লেখার টেবিলেও স্তূপীকৃত বই। বই ছড়ানো সর্বত্র। মেঝেয়, চেয়ারের ওপর। চলাফেরার জায়গা নেই বলা চলে।

সুসি আনন্দঘন গলায় বলে উঠলো,—এখন আর কথাই বলবো না তোমার সঙ্গে। আগে বইগুলো দেখি।

—এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। তবে, এগুলো তোমাকে নিরাশ করবে বলেই আমার ধারণা। অনেক ধরণের বই যদিও—তবু, তোমার মত ইংরেজদুহিতার ইন্টারেস্ট কাড়ার বই নয় এসব।

টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজে নিয়ে সবাইকেই একটা করে অফার করলো ডাক্তার। সুসি কিন্তু পুরণো বইয়ের সোঁদা গন্ধে আহ্লাদিত। সবগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে গেলো সে একে একে। কাগজের বাঁধাই অধিকাংশই। কিছুর মলাট ছিঁড়ে গেছে। কোণ ছিঁড়েছে কিছুর। সার দিয়ে রাখা বই। এলোমেলো ভাবে। আর্থার যেমন তার অপারেটিং থিয়েটারে অন্য মানুষ, তেমনি ডাক্তারও তার বইয়ের মাঝে। তার নির্মল চারিত্রিক ভঙ্গির জন্যে তাকে এত আকর্ষণের মনে হলেও তার হাবভাবে কোথায় যেন একটা গরমিল, তার স্বভাবসুলভ স্থৈর্যের বাইরে যেন খুঁজে পাওয়া যায় তাকে।

—তাই ঢোকার আগে বলছিলাম, ওই কেরাণের কথা। আলেকজান্ড্রিয়ার এক বিদগ্ধ লোকের কাছ থেকে পাওয়া বইটা। চোখের

'ক্যাটারাক্ট' অপারেশন করেছিলাম তার।

সুন্দর ঝকঝকে আরবীতে লেখা বইয়ের মলাট। সেটা দেখালো সুসিকে ডাক্তার—নাস্তিকের পক্ষে এ ধরণের পবিত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার জানোই তো। আর, এটা একটা দুর্লভ গ্রন্থ, মামেলিউক সুলতানদের অন্যতম প্রধান কাইত বে'র লেখা এটা।

ফুলের পাপড়িতে যেমন করে হাত রাখে পুষ্পপ্রেমী, সেইভাবে নরম পাতাগুলোর ওপর আঙুল ছোঁয়ালো ডাক্তার।

—অপরসায়নের অনেক বই আছে বুঝি তোমার সংগ্রহে?

ডাক্তার পোরোয়ের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটলো,—বলতে বাধা নেই, কোনো নিজস্ব পাঠাগারে এত বই নেই আমার মত। মানে, সম্পূর্ণ সংগ্রহের কথা বলছি। তবে, বন্ধুবর আর্থারের সামনে আর ওগুলো দেখাতে চাইছি না। আমাকে বোকা বলতে হবে না হয়তো সামনা-সামনি সৌজন্যের খাতিরে, কিন্তু ব্যঙ্গের হাসি তো চাপতে পারবে না ও!

সুসি এগিয়ে গেলো তাকের দিকে। এক আশ্চর্য উত্তেজনা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করেছে। রহস্যময় সংগ্রহের দিকে পরিপূর্ণ চোখ মেলে দিলো সে। নামগুলো পড়ে গেলো সুসি।

এক অজানা রোমান্সের রাজ্যে যেন ঢুকতে চলেছে সে। এক দুঃসাহসী যুবরাজ্ঞী যেন সুসি, বনের ভেতর দিয়ে চলেছে ঘোড়ায়, চোখ চারদিকে বিরাটকায় ঝাড়াগাছের সারে, আর অতীন্দ্রিয় নৈঃশব্দ্যের মাঝখান দিয়ে—অপার্থিব সব কিছুর বাধা অতিক্রম করে।

—সেই বিরাট, মহান পুরুষ ফিলিপ্পাস হোহেনহাইমের জীবনী লেখার ইচ্ছে আমার একবার হয়েছিলো, তার বইও সব জোগাড় করেছি।

একটা পাতলা বই নামিয়ে নিলো ডাক্তার, সপ্তদশ শতকে ছাপা বই। অদ্ভুত সব অক্ষর। দাগ ধরে গেছে।

—এই হলো 'গ্রিমোইর অফ অনরিয়াস'—যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত অপরিহার্য বই। যারা এই পেশায় নিযুক্ত তাদের কাছে মুখ্য অবশ্য-

প্রাচ্য গ্রন্থও।

একের পর এক দেখিয়ে চললো সে; টরকেমাদার 'হেক্সামেরণ' ডেলানকে-র 'ট্যাবলো দ্য লে ইনকনস্তানসি দেস দিমন্স', ডেলরিও-এর 'ডিসকুইজিসিজনেস ম্যাজিকে-'র ওপর আঙুল ছোঁয়ালো ডাক্তার। উইবাস-এর 'স্যুডোমনারকিয়া ডেমনরাম, হাউবার-এর 'অ্যাকটা এক্সক্রিপটা ম্যাজকা-র' ওপর চোখ বোলালো একবার। স্প্রেঞ্জারের ম্যালিয়ুস ম্যালেফিকোরাম থেকে সন্তর্পনে ধুলো ঝেড়ে দিলো সে। বিখ্যাত, অথচ কুখ্যাতির শীর্ষে যে বই।

—আমার মূল্যবান সংগ্রহের অন্যতম হচ্ছে এটা; ক্ল্যাভিকুলা সালমনিস আর—এটা অষ্টাদশ শতকের জ্যাকেস ক্যাসনোভার সেই বই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মালিকের নামটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। অক্ষরগুলোর নীচের অংশটুকু থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়—ক্যাসানভার সেই বই এটা। বিব্লিয়োথিক ন্যাশনালে আমি এই বই পেয়েছি। ভেনিসে যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় যাদুপ্রদর্শনীর আইনে, তখন এই বইটা নাকি তার বাজেয়াপ্ত হয়। এ সবই তার আত্মজীবনীতে বলা আছে। আলেকজান্ড্রিয়াতেই পাই এটা।

রেখে দিলো মূল্যবান গ্রন্থটি যথাস্থানে পোরোয়ে। আর একটা মোটা বইয়ের ওপর নজর গেলো তার এবার, ভেলাসে বাঁধানো সেটা।

—অপরসায়নের ওপর সবচেয়ে অদ্ভুত, রহস্যপূর্ণ বইটার কথাই তো ভুলে মেরে দিয়েছিলাম আমি। 'কাবালা'র কথা হয়তো শুনে থাকবে তোমরা, অবশ্যই শুধুই একটা নাম এটা তোমাদের কাছে।

সুসি হেসে উঠলো,—এসবের কিছুই জানি না আমি। শুধু বুঝি, এসবই দারুন রোমান্টিক, অসাধারণ ব্যাপার-স্যাপার—আর হাস্যকরও!

—তাহলে কাহিনীটা খুলে বলি। ডাক্তার বলে চললো,—ঈশ্বরের ভাবৎ জ্ঞানীগুণী মোজেস কাবালার প্রচলন করে সর্বপ্রথম তার দেশে।

পরবর্তী সময়ে বিদেশবিভুঁয়ে ঘোরাঘুরিতে আরও দক্ষ হয় সে। এই আশ্চর্যবিদ্যায় যে সে শুধু তার জীবনের অবকাশকালীন চল্লিশটা বছরই দিয়েছে, তাই নয়—সহৃদয়া এক পরীর কাছে শিক্ষাও নিয়েছে। ইশরায়েলীদের সমস্যার সমাধান করেছে সে এর সাহায্যে। পেন্টাটিউচের প্রথম চারটে বইতে সে যুক্তিগুলোর অবতারণা করে; ডিউটেরোনমি বাদ দিয়ে। 'সেভেন্টি ওয়াণ্ডারস' বলে পরিচিতদেরও এই গোপন তথ্য সরবরাহ করে সে। তারাও ক্রমে ছড়িয়ে দেয় দিকবিদিকে সেসব। কাবালা-র সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে চিহ্নিত ডেভিড আর সলোমন। সাইমন বেন জোচাইয়ের আগে কিন্তু লিখতে সাহস করেনি কেউ। জেরুজালেমের শেষ অবস্থায় জীবিত মানুষদের অন্যতম এই সাইমন। মৃত্যুর পর তার ছেলে রাবি ইলিয়াজার আর রাবি আবা, তার সচিব, তার পাণ্ডুলিপিগুলোকে সংগ্রহ করে তা থেকে 'জোহার' রচনা করে। বিখ্যাত সংগ্রহ।

—এই অত্যাশ্চর্য কাহিনীর কতটুকু তুমি নিজে বিশ্বাস করো? আর্থার এতক্ষণ পরে কথা বললো।

—এক বর্ণও নয়। ডাক্তার মৃদু হেসে জানালো। কারণ, সমালোচনায় জেনেছি 'জোহার' সাম্প্রতিক রচনা। একাদশ শতকে লেখা, ক্রুশেডের উল্লেখ ও আছে। বারশো চৌত্রিশ ঘটনাবলীরও—আমাদের প্রভুর সময়কার। বারশো—একানব্বইয়ের আগে কোনো সময়ে মোজেস নামে একজন স্পেনীয় ইহুদী 'জোহার'-এর প্রচার শুরু করে। সাইমনের নিজহাতে সইকরা পাণ্ডুলিপির অধিকারী বলে ঘোষণা করে সে নিজেকে। পরে মোজেসের মায়ের কাছে প্রস্তাব এসেছে এক ধনবান হিব্রু—জোসেফ দা আভিলার কাছ থেকে, তার কন্যার সঙ্গে মোজেসের বিয়ে হলে সে মোটা টাকা দিতে প্রস্তুত, অবশ্যই মূল পাণ্ডুলিপিটার বিনিময়ে। কিন্তু সেই মহিলা সবিনয়ে জানিয়েছে 'জোহার' মোজেসের স্বহস্তেই লেখা।

আর্থার উঠে দাঁড়ালো, পা ছাড়াবার জন্যে। হেসেও উঠলো একই সঙ্গে,—জানি না এর কতটুকু তুমি নিজে বিশ্বাস করো। এমন

গম্ভীরভাবে বলে চলেছো সব, যেন আমরা বিশ্বাস করেই ফেলেছি। আর, শেষে বুঝতে পারছি যে মজা করছো তুমি আমাদের সঙ্গে।
—বন্ধু, আমি কতটুকু এর বিশ্বাস করি. নিজেই জানি না আমি। ডাক্তার পোরোয়ে জানালো।
—হয়তো এই কারণেই হ্যাডো সাহেবকে আমাদের এত অস্বাভাবিক মনে হয়। সুসি বলে উঠলো।
—হ্যাঁ, এইবার একটা ইন্টারেস্টিং প্রসঙ্গের অবতারণা করেছো তুমি—আমি ওকে মোটামুটি অন্তরঙ্গ ভাবেই জানি, বলা যায়। তবে, বুঝে উঠতে পারি না কখন লোকটা আসলে ভাঁভামি করছে, নাকি—যে শক্তির অধিকারী বলে দাবী করে সে, সেগুলো অকৃত্রিম।
—গতরাতে যে ঘটনাগুলো চোখে পড়েছে আমাদের, সেগু'লা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়। সুসি বললো,—ধরো সরীসৃপটা—খরগোসটাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে পারলেও, তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কেন? আর, ঘোড়াটার ওই কাঁপুনিরই বা কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?

আর্থার বিরক্তির গলায় জবাব দিলো,—ওটার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছি না আমি। সরাসরি মাথায় 'ঢাকে না এমন কোনো ব্যাপারকেই অলৌকিক কিছুর পর্যায়ে ফেলতে প্রস্তুতও নই।
—ও লোকটার মধ্যে কি যে আছে জানি না, তবে ভয় করে আমার। এমন অপছন্দের মানুষ কমই চোখে পড়েছে আমার—মার্গারেট এবার বললো।

সংযত গলায় কথাগুলো বললেও, হ্যাডোর কথা আর কাজে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছে সে। একাধিকবার ঘুমের মধ্যে জেগে উঠেছে, দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়েছে সব—হ্যাডোর চেহারা কখনো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে সে স্বপ্নে। ওর বিদ্রূপভরা গলার স্বর তার কানে বাজছে, তার বিরাটাকৃতি শরীর আর পাশব মুখটাও ভেসে উঠছে তার চোখে। তার চোখে যেন এক অশুভ ছায়ামূর্তি। আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে মার্গারেট। আর্থারের ওপর ভরসা এখন শুধু,

ও ঐ সব হাস্যকর ভীতি থেকে দূরে থাকা।

—ফ্র্যাঙ্ক হ্যারেলের কাছে চিঠি দিয়েছি, ওই লোকটা সম্পর্কে জানাবার কথা লিখে। শিগগিরই উত্তর পাবো আশা করছি।

—ওর সঙ্গে আর দেখা না হলেই বাঁচি। দৃঢ়গলায় বলে উঠলো মার্গারেট।

—তোমরা সকলে ভীষণভাবে প্রেজুডিসড হয়ে পড়েছো। আমার কিন্তু দারুন ইন্টারেস্টিং মনে হয় ওকে। স্টুডিওতে চায়ের নেমন্তন্ন করবো ওকে। সুসি সজীবগলায় বললো।

—নিশ্চয়ই আসবো—আনন্দের সঙ্গে।

মার্গারেটের গলা ঠেলে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গেলো, কারণ অলিভার হ্যাডোর গভীর কৌতুকের গলা চিনেছে সে। দ্রুত ঘুরে তাকালো মার্গারেট। ওরা এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, যে কিছুক্ষণ কারোরই মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় হ্যাডোর পায়ের শব্দ পায়নি তারা। কতক্ষণ এসেছে সে কে জানে, কতটাই বা শুনেছে··· অপ্রতিভ ভাবনা শুরু হলো ওদের মনে।

—এখানে এলে কি করে? সুসি হালকা গলায় প্রশ্ন করলো, নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে, সবার আগে।

—কোনো খানদানী যাদুকরই দরজা দিয়ে ঢোকে না। রহস্যময় হাসি খেলে গেলো হ্যাডোর ঠোঁটে। জানলার কাছে তোমরা, ভাবলাম ওই দিক দিয়ে সেঁদোলে তোমরা চমকে উঠবে, তাই নিপুণ দক্ষতায় চিমনি বেয়ে নেমেছি।

—বাঁ হাতের কব্জিতে কালিঝুলি মাখানো দেখছি। পুড়ে-টুড়ে যায়নি তো কোথাও? সুসি উদ্বেগ প্রকাশ করলো।

—আদৌ না, ধন্যবাদ। কোট থেকে ধুলো ঝাড়লো হ্যাডো।

—যেদিক দিয়েই এসে থাকো না কেন, স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে। পোরোয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

আর্থার কিন্তু অধৈর্য.—তোমার এই সব বিষয়ে এত আগ্রহ হলো

কি করে জানতে ইচ্ছে করে। তোমার ডাক্তারী পেশায় এসব কুসংস্কারের স্থান নেই বলেই ধারণা ছিলো আমার।

ডাক্তার পোয়োরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছিলো,—মানবতার বৈচিত্র্যে আমি সবসময়েই আগ্রহী। একসময়ে দর্শন নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি। বিজ্ঞান নিয়েও। তাতেই জেনেছি যে কিছুই নিশ্চিত নয়। কিছুলোক বিজ্ঞানের কৃপায়—মানুষের মর্যাদা সম্পর্কেই আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু আমি তার তুচ্ছতার কথাই বিবেচনা করেছি। মানুষ শুধু একটা বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখতে পারে, বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে—সেটা তার মন। এখানেও সে আঁধারে আচ্ছন্ন। আমরা যে সমস্ত তথ্য জানবার যোগ্য, সেগুলোই জানা হয়ে ওঠে না, ফলে সেগুলোর সঙ্গে একাত্ম হতে পারছি না। সেগুলোর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই না, আর—যেহেতু জ্ঞানাহরণ সম্ভব নয়, নির্বোধ হয়ে আছি!

—এ ব্যাপারে একমত হতে পারলাম না। আর্থার জানালো।

—তবু, আমার কখনো মনে হয়নি এটা নিবুর্দ্ধিতা হচ্ছে। আর্থারের দিকে গম্ভীর চোখে তাকালো সে, শ্লেষের ছোঁয়া তাতে।—আমি যখন সত্যি কথা বলবো বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তখন মিথ্যে বলছি মনে করছো কেন?

—করছি না।

—আলেকজান্দ্রিয়ায় আর এক অভিজ্ঞতার কথা বলবো, তবে বিজ্ঞানের কোনো সূত্রেই কিন্তু তার ব্যাখ্যা মিলবে না। আমি যে জ্ঞাতসারে তোমাদের প্রতারিত করছি না, এইটুকুই বিশ্বাস করতে হবে।

তার কথার ভঙ্গিতে যথেষ্ট গুরুত্বের আভাব, তার বক্তব্যকে জোরদার করছে। ঘটনা বিবৃত করে চললো হ্যাডো,—এক শেখ সাহেবের কথা প্রায়ই শুনতাম, যে প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দিতে পারতো, কেউ জীবিত না মৃত—একটা আলৌকিক আয়নার সাহায্যে। স্থানীয় এক বন্ধু আমাকে বারবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনুরোধ

করেছে। তেমন গুরুত্ব দিইনি ব্যাপারটায়, তবে একটা দিন এলো, যখন আমি মনের দিক দিয়ে খুবই অ-সুখী—আমার মা, প্রবীন বিধবার কোনো খবর পাচ্ছিলাম না বহুদিন। চিঠি দিয়েছি বারবার, উত্তর নেই। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আমি, অ-সুখীও। যাদুকরের স্মরণাপন্ন হতে হবে ভাবলাম। আমার সেই বন্ধু, ফরাসী দূতাবাসে দোভাষীর কাজ করতো সে, তাকে একদিন নিয়ে এলো বিকেলের দিকে। লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ। ফরসা; ঘোর বাদামী দাড়ি গালে। পোশাকপরিচ্ছদ জীর্ণ, হজরত মহম্মদের অনুগামী যেহেতু, মাথায় একটা সবুজ পাগড়ী চাপানো ছিলো তার। কথাবার্তায় অমায়িক মানুষটা। জিজ্ঞেস করলাম কি ধরণের মানুষ তার সেই আয়নায় চোখ রাখতে পারে। উত্তরে বললো—বয়সন্ধিপ্রাপ্ত নয় এমন কিশোর, কুমারী, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বা সন্তানসম্ভবা মহিলারা। ব্যাপারটায় কোনো চাতুরী নেই নিশ্চিত হতে, আমার চাকরটাকে বন্ধুর কাছে পাঠালাম, তার ছেলেকে নিয়ে আসার জন্যে। অপেক্ষা করতে করতে যাদুকরের নির্দেশে গুলগুল; করিয়াণ্ডার বীজ: আর কাঠকয়লা দিয়ে এক পদার্থ তৈরী করলাম। ইতিমধ্যে ছ'টুকরো কাগজে প্রার্থণার ভাষায় কিসব লিখলো শেখ। ছেলেটি পৌঁছতে, যাদুকর গুলগুল আর কাগজের একটা টুকরো পাত্রে ফেলে দিলো। ছেলেটার ডান হাতটা টেনে নিয়ে তার তেলোতে একটা চতুষ্কোণ এঁকে দিলো, কতকগুলো রহস্যজনক চিহ্নও। চতুষ্কোণের মাঝখানে একটু কালিও ঢেলে দিলো। এইটাই যাদু আয়না। মাথা না তুলে ছেলেটাকে তার মধ্যে তাকিয়ে থাকতে বললো। গুলগুলের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেলো, ধোঁয়ায়ও। আরবীতে বলে যাচ্ছে কিছু শেখ, অস্পষ্ট গলায়। এ সবই করে চলেছে, ছেলেটাকে প্রশ্ন করার আগে পর্যন্ত। শেষে প্রশ্ন করলো,—কালির ভেতর কিছু দেখতে পাচ্ছো?

—না। ছেলেটা উত্তরে বললো।

কিন্তু মিনিটখানিক পরেই ছেলেটা কাঁপতে আরম্ভ করলো, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

—একটা লোককে মাটি ঝাঁট দিতে দেখছি। ছেলেটি বললো।
—ওর ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে বলবে। যাদুকর নির্দেশ দিলো।
—শেষ করেছে। কিছু পরে বললো ছেলেটা।
—যাদুকর এবার আমার দিকে ফিরলো, ছেলেটা কাকে দেখতে চাইবে প্রশ্ন করলো আমাকে।
—দাঁ—মারি। পোরোয়ের বিধবা স্ত্রীকে দেখুক।
—যাদুকর এবার দ্বিতীয় আর তৃতীয় কাগজের টুকরো ফেলে দিলো পাত্রে। নতুন করে গুগগুলও দেওয়া হলো। ধোঁয়ায় কষ্ট হচ্ছে আমার রীতিমত। ছেলেটা আবার কথা শুরু করলো, এক প্রবীণাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখছি। কালো পোশাক পরণে—মাথায় একটা ছোট্ট সাদা টুপি। চোখমুখে খাঁজ পড়েছে। চোখ বুঁজে আছে। চিবুকে একটা বাঁধনও চোখে পড়ছে। খাটটা যেন একটা গর্তের মধ্যে মনে হচ্ছে, দেয়ালের গাঁথা। খড়খড়িও রয়েছে।
—ছেলেটা ঠিকঠিকই বলে যাচ্ছিলো, কালো পোশাকে—চিবুকে বাঁধন থাকার একটাই অর্থ।
—আর কি দেখছে ও? জিজ্ঞেস করলাম।
—আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো যাদুকর, ছেলেটিও বলে চললো,—চারটে লোক ঢুকেছে, একটা লম্বা বাক্স নিয়ে। চারদিকে মহিলারা কাঁদছে। ওদেরও মাথায় সাদা টুপি, কালো পোশাক পরে আছে। সাদা আলখাল্লা পরণে একটা লোকও রয়েছে, হাতে একটা প্রকাণ্ড ক্রুশ। একটা ছোট ছেলে, লাল গাউন পরণে। লোকগুলো মাথা থেকে টুপি সরিয়ে নিয়েছে। এবার সবাই হাঁটু মুড়ে বসেছে।
—আর শুনতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে। বলে উঠলাম।
আমার মা মারা গেছেন, জানলাম।
—কিছু পরেই একটা চিঠি পেলাম। মা যে গ্রামে ছিলেন সেখানকার পুরোহিত লিখেছে। ছেলেটি যখন আয়নায় তাঁকে দেখেছে তারপরই মাটি দেওয়া হয়েছে মাকে।

ডাক্তার পোরোয়ে হাত দিয়ে তার মুখটা ঢাকলো। নৈঃশব্দ্য

নামলো সারা ঘরে।

—কি বলবার আছে তোমার? অলিভার হ্যাডো অনেক পরে প্রশ্ন করলো আর্থারকে।

—কিছুই না। উত্তর দিলো সে।

হ্যাডো অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তার দিকে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে,—এলিফাস লেভাইয়ের নাম শুনেছো কখনো? ইদানীংকালের সবচাইতে খ্যাতিমান অপরায়নজ্ঞ। পবিত্র প্যারাসেলসাসের পরে এমন কৃতীপুরুষ আর দেখা যায় নি।

—একবার দেখা হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে। পোরোয়ে বললো মাঝখান থেকে। যাদুকরের চেহারাই নয় ভদ্রলোকের। সরল মানুষ, প্রশান্ত মুখে দীর্ঘ ধুসর দাড়ি, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। ছোট্ট-খাট্টো মোটা চেহারার মানুষ।

—মোটা মানুষরাই ইন্দ্রজালের খপ্পরে পড়ে বোধহয়। আর্থার ঠাণ্ডা গলায় বললো।

হ্যাডো ঠাট্টা গায়ে মাখলো না এবার। সুসি লক্ষ্য করলো সেটা। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে শুধু আর্থারের দিকে, ভাবলেশ-হীন চোখে।

—লেভাইয়ের আসল নাম হলো অ্যালফোঁসে-লুই কন্সট্যান্ত। রোমান্টিকতার কারণেই নামটা নেয় সে। বাবা মুচির কাজ করতেন। পৌরোহিত্যের কাজ নেবার আগে এক সুন্দরীর সঙ্গে প্রণয় হলো, বিয়েও। বিয়ে সুখের হয় নি। ছাড়াছড়িও হলো শেষটায়। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে অপরসায়নের গবেষণায় মগ্ন হলো লেভাই। কিছুদিনের মধ্যেঃ প্রচুর বইও লেখা হলো যাদুর ওপর।

—হ্যাডো সাহেব নিশ্চয়ই লোকটার সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনাবে আমাদের এবার? সুসি বললো।

—লণ্ডনে টয়ানার অ্যাপোলোনিয়াসের আত্মাকে কিভাবে জাগ্রত করেছিলো সেই কাহিনীই শুধু বলবো।

সুসি একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো।

—আঠারোশো ছাপ্পান্নোর বসন্তকালে সেখানে চলে যায় সে মানসিক শান্তি খুঁজতে। নিরবচ্ছিন্ন পড়াশোনায় মন দেবার জন্যে। কিছু খ্যাতিমান লোকের কাছে পরিচয়পত্রও দেখায়, তারা সবাই যাদুবিদ্যার স্তম্ভ এক এক জন কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া মিললো না দেখে কাবালার পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করলো। একদিন হোটেলে ফিরে একটা চিরকুট পেলো লেভাই। একটা কার্ড—আড়া-আড়ি দু'ভাগ করা। সলোমনের ছাপ রয়েছে মাথায়। পেনসিলে লেখা কটা কথা:—"কার্ডের বাকি অংশ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে-র সামনে আগামীকাল তিনটের সময় দেওয়া হবে।" পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছলো সে। একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোচওয়ান নেমে সংকেত করলো তাকে, গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে। কালো সাটিনে মোড়া এক মহিলা বসে। মোটা ওড়নায় মুখটা ঢাকা। পাশে বসতে ইঙ্গিত করলো সে। সেইসঙ্গে কার্ডের বাকি অংশটা বের করে দেখালো। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, গাড়ি চলতে লাগলো। মহিলা ওড়না সরিয়ে নিতে লেভাই দেখলো পরিণত বয়সের এক নারী তার সামনে; কালো উজ্জ্বল চোখ দুটো অস্বাভাবিক, স্থির।

আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠলো সুনি,—দারুণ! এর প্রতিটি কথাই সত্যি মনে হয় আমার। ওঃ! ভিক্টোরিয় যুগে ওয়েস্ট-মিনস্টার অ্যাবে-তে সাক্ষাৎকার! এক বয়স্কা মহিলা, প্রকাণ্ড বনেট। আর অন্যদিকে এক যাদুকর। বিদঘুটে একটা টুপি, বোতল-বর্ণ ফ্রককোট, কালো রেশমী টাই গলায়, হাওয়ায় দুলছে।

—এলিফ্যাস-এর মনে পড়ে মহিলা ফরাসীতে কথা বলছিলো—ইংরিজি টান কথায়। হ্যাডো বলে চলেছে, মহিলা—তাকে সম্বোধন করলো,—মহাশয়, গোপনতার ব্যাপারটা আধারদের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় এটা জানা আছে আমার। সম্ভবত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাব ঘটেছে। আমি আপনাকে একটি সম্পূর্ণ যাদুর সংগ্রহশালা দেখাবো। এ' সম্পর্কে নীরবতার প্রয়োজন। নিশ্ছিদ্র। এই আশ্বাস যদি আপনি না দিতে পারেন আমাকে, তাহলে আপনাকে

বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলবো।

আলভার হ্যাডো তার কাহিনী হালকা গলায় না বিবৃত করলেও তার কথার মধ্যে অন্যধরণের কৌতুকমিশ্রিত গাম্ভীর্য রয়েছে। ফলে কিভাবে নেওয়া যায় কাহিনী, তাই নিয়েই ভাবনা সবার।

—লেভাই আশ্বাস দিলে তাকে দেখানো হলো সমস্ত কিছু। মহিলাটি তাকে কিছু প্রয়োজনীয় বই ও ধার দিলো। এবং দীর্ঘ আলোচনার পর তার বাড়িতে পরীক্ষাদির ব্যবস্থা হলো। একুশ দিন ধরে নিজেকে তৈরী করলো লেভাই। কঠোর নিয়মে নিগড়ে। শেষে সব ঠিক হলো। আপোলোনিয়ার আত্মাকে ডাকা হবে স্থির হলো! দুটো প্রশ্ন করার রয়েছে—এলিফাস লেভাই সম্পর্কে প্রথমটা, পরেরটা সেই মহিলা সম্পর্কিত। বিপত্তি হলো শেষ মুহূর্তে —তিনজনের তৃতীয় জন অস্বীকার করলো আবির্ভাবের টেবলে বসতে।

পরীক্ষার জায়গাটা ঠিক হয়েছিলো এক চিলেকোঠায়। চারটে কাঁপা আয়না খাটানো। সাদা মার্বেল পাথরের এক যজ্ঞবেদী। পেন্টাগ্রামের চিহ্নে চিহ্নিত —সাদা ভেড়ার চামড়ার ওপর খোদাই করা। লেভাই একটা সাদা আলখাল্লা পরেছে। মাথায় ভার্ভেইন পাতার এক মুকুট, সোনার চেনে মোড়া। এক হাতে এক নতুন তরোয়াল, অন্যহাতে আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ।

সুনি মজা করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না, ফরাসী লোকটার লাল, গোলাকার মুখটার বিশেষ ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সে।

হ্যাডো কিন্তু বলে চলেছে,—মালমশলা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলো প্রথম অনুচ্চস্বরে পরে গলা চড়িয়ে মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিলো। কাঁপা কাঁপা আগুন ছড়িয়ে পড়ে সবকিছু ছুঁলো, আশপাশে —পরে নিভেও গেলো সহসা। আরও ডালপালা গুঁজে দিলো যাদুকর। আগুন নতুন করে জ্বলে উঠতে একটা মানুষের মূর্তি বেদীর সামনে ভেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই সেটা বিলুপ্ত হলো। মন্ত্রপাঠ শুরু হলো

আবার, নিজেকে একটা বৃত্তের মধ্যে নিয়ে গেলো—বেদী আর শরীর মাঝখানে সেটা আগেই চিহ্নিত হয়ে আছে। ক্রমে সাধনের আবেদনার গভীরতা বেড়ে চললো। একটা অস্পষ্ট মূর্তি আত্মপ্রকাশ করলো, এগিয়ে আসছে যেন আস্তে আস্তে...চোখ বুজে ফেললো, অ্যাপেলোনিয়াসের নাম ধরে তিনবার ডাকলো। চোখ যখন মেলেছে, তার সামনে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে একটা আবরণ তার শরীর জুড়ে—কালোর চেয়ে ধূসর বলেই মনে হচ্ছে আবরণ। লম্বা বিষণ্ণ চেহারা, দাড়িহীন। এলিফ্যাসের প্রচণ্ড শৈত্যানুভব হলো, প্রশ্ন শুরু করতে গিয়ে দেখলো কথা বলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তার পক্ষে। পেন্টাগ্রামে হাত রাখলো যাদুকর, তরোয়ালের মুখটা মূর্তির দিকে চালিয়ে দিলো, অবশ্যই তার আদেশের প্রত্যাশায়।

মূর্তি সহসা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেলো। যাদুকর সেটাকে ফিরে আসার আদেশ দিলো, এবং পরে তার এক আশ্চর্য অনুভূতি হলো; মনে হলো তার পাশ দিয়ে হাওয়ার ঝলক বয়ে গেলো। তরোয়ালধরা হাতে কিছু একটা ছুঁলোও যেন। কাঁধ পর্যন্ত অবশ হয়ে গেলো হাত। যাদুকরের মনে হলো তরোয়ালটাই বিপত্তির উৎস—আত্মার অসন্তোষের কারণ—বৃত্তের মাঝখানে বসিয়ে দিলো সেটাকে সে। সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যমূর্তির পুনরাগমন হলো, কিন্তু এলিফ্যাসের শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলাতে এমন একটা অসাড়তা অনুভব করলো, যে বসে পড়তে হলো তাকে। অচেতন অবস্থার মধ্যেই চললো তার স্বপ্ন...চৈতন্য ফিরে আসার পর কিন্তু এর একটা অস্পষ্ট রেশ থেকে গেলো শুধু ..হাতটা বেশ কিছুদিন ওই অবস্থায় থেকে গেলো—

মূর্তি কোনো কথা বলেনি, কিন্তু এলিফ্যাস লেভাইয়ের মনে হয়েছে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে সে নিজের কাছে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দই ভেসে এসেছে: মৃত।

—তোমার সিংহভীতির চেয়ে বন্ধুটির প্রেতাতঙ্ক বেশী নয় মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমার ধারণা—ওসব প্রস্তুতিপর্ব;

গন্ধের ছড়াছড়ি, আয়নার ভোজবাজী, পেন্টাগ্রাম—সবই কল্পনার সার্থক ফসল;

শুধু একটাই বিস্ময় থেকে গেলে আমার মনে—তোমার যাদুকরটি আর কিছু দেখতে পেলো কি! আর্থার আবার আঘাত করলো পেরোয়েকে।

এর সমস্তই এলিফ্যাস লেভাইয়ের নিজের মুখে শোনা আমার। স্বীকার করেছে সে, এর একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে তার মনে। সে আর আগের সেই মানুষ নেই—পারলৌকিক কোনোকিছু তার আত্মার সঙ্গে একাত্ম মনে হয়েছে তার।

—নিজে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং পরীক্ষা চালাওনি কেন সেটা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি। হ্যাডোর উদ্দেশে বলে উঠলো আর্থার।

—চালিয়েছি। শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো হ্যাডো,—বাবা মারা যাবার কিছু আগে তাঁর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন, এবং বলা বাহুল্য—আমাকে, কিছু বলে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর বছর খানিক পরে তাঁর আত্মাকে জাগরিত করেছি শেষ ইচ্ছা কি ছিলো তাঁর জানার জন্যে। এইমাত্র যা শোনালাম তার সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে ব্যাপারটা, তফাৎ শুধু একটা জায়গায়—আমার বাবা কথা বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন তিনি? সুদির প্রশ্ন।

—গম্ভীরগলায় বলেছিলেন,—'আসান্তিস কেনো', দাম বেড়ে যাবে। তাঁর কথা মত কাজ করলাম। কিন্তু বাবার তো স্পেকুলেশনের ব্যাপারে চিরদিনই ভাগ্য খারাপ, দাম পড়তে লাগলো। বেশ কিছু গচ্ছা দিয়ে বেচে দিলাম। পরলোকের মানুষেরাও স্টক এক্সচেঞ্জের নাড়ি সম্বন্ধে অজ্ঞ!

সুদির আবার হাসি পেলো। আর্থার অধৈর্যভঙ্গিতে তার কাঁধ ঝাঁকালো। হ্যাডোর কথায় গুরুত্ব দেওয়া যায় কিনা না—এখনকার মজার ছলেই তার সবকিছু মেনে নিতে হবে।

তার বাস্তবতার ছোঁয়ালাগা মনে এর কোনো ব্যাখ্যা মিললো না।

দিন দু'য়েক পরে ফ্রাঙ্ক হারেলের উত্তর এলো। দীর্ঘ চিঠি, বোঝা গেলো অতীত দিনের রোমন্থনে তার অনিচ্ছা নেই। অলিভার হ্যাডোর চরিত্র বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী মনের আশ্রয় নিয়েছে সে, যে মন নতুন কোনো আকর্ষক গবেষণায় নিযুক্ত···

প্রিয় বারডন,

যে মানুষের সঙ্গে সেদিনও কুইন অ্যান-এর গেট-এ ডিনারের টেবিলে দেখা হয়েছে, তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো ভেবে কিছুটা আশ্চর্য লাগছে। ওর প্রতি তোমার আকর্ষণের হেতু জানার আগ্রহ হচ্ছে আমার, কারণ অলিভার হ্যাডোর অস্বাভাবিক চালচলন তোমার মত পার্থিবতাবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। লোকটার সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে পারি আমি। আমাকে তার 'অন্তরঙ্গ বান্ধব' বলে অভিহিত করে থাকলে ভুল করেছে সে। একথা সত্যি, তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে আমার এক সময়ে, কিন্তু কোনোদিনই লোকটাকে পছন্দের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি। ইটন থেকে অক্সফোর্ড দুটো ব্যাপারে দক্ষতার ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছে, এক ক্রীড়াবিদ, দুই—খামখেয়ালীপনা। আর, জানোই তো ওইসব দেখলে মন্দ ছেলেদের কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়, লোকটা অসম্ভব অ-পছন্দের মানুষ হয়ে দাঁড়ালো। ফুটবলটা ভালোই খেলতো হ্যাডো, এবং অলসপ্রিয়তার দোষে দুষ্ট না হলে 'ব্লু' হতে পারতো সে। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তার বক্তব্য—কিশোরদের উপযোগী খেলা, বয়স্কদের সময় কাটানোর পক্ষে অচল! আঠারো বছরের কিশোর তখন সে। শিকারের গল্প ফাঁদতো প্রায়ই, পাহাড়ে-চড়ার ব্যাপারেও উৎসাহী ছিলো। এগুলোতে নাকি সাহস আর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, বলতো। ফুটবলটাও খেলতো সে অত্যন্ত বর্বরোচিত কায়দায়, ফলে সেটাও তার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবার অন্যতম কারণ। আর, পরাজিত পক্ষকে বিদ্রূপে জর্জরিত করতেও ছাড়তো না সে।

বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে অলিভার হ্যাডো প্রথম যখন এলো—অনবদ্য শারীরিক আকর্ষণের বস্তু ছিলো সে। এখন অবশ্য শরীরে প্রচুর মেদের বাহুল্য ঘটেছে তার। এককালে অ্যাপোলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতো তার দেহসৌষ্ঠব। প্রচুর পরিমাণ কোঁকড়ানো চুল মাথায়—কাব্যিক কমণীয়তা এক ধরণের। এখন শুনি মাথার চুল পড়ে, টাক দেখা দিয়েছে তার। খুসীমনে অবশ্যই নিতে পারেনি এটা হ্যাডো। চোখের দৃষ্টিতে তার এক অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছি, সাধারণ বলা যায় না তাকে কোনোক্রমেই। কিভাবে আয়ত্ত করেছে সে এটা, তাও জানি না। অধিকাংশ মানুষেরই দৃষ্টি লক্ষ্যবস্তুর ওপর অভিমুখীন হয়। হ্যাডোর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে—সমান্তরাল চলে তার দৃষ্টি। যেন মানুষের অন্তর ভেদ করে যাচ্ছে দৃষ্টি: পোশাকের সৌখীনতার জন্যে খ্যাতি ছিলো তার, জেল্লাদার রঙের প্রতি ছিলো দুর্বলতা। লম্বা কোট, বহুবোতাম ফ্রককোট পরে ঘোরাঘুরি করতে একমাত্র তাকেই দেখেছি।

লোকটার জনপ্রিয়তা ছিলো না বলেছি, কিন্তু সেটার ধরণ এমন নয়, যা একটা মানুষকে অবজ্ঞার পর্যায়ে ফেলে—একঘরে করে দেয়। সবার সঙ্গেই পরিচয় ছিলো তার, এবং বহু সম্ভাবনাহীন জায়গাতেই দেখা যেতো তাকে। হ্যাডোকে অপছন্দ করলেও তারা তার সাহচর্যে একধরণের বিচিত্র আনন্দ পেতো। সবসময়ে মানুষ ঘিরে থাকতো ওকে, যারা ওর পেছনে গালমন্দ করতো তারাও এড়াতে পারতো না তার সঙ্গ।

এর ব্যাখ্যা খুঁজেছি, ওকে পছন্দ না করলেও। সুযোগ পেলেই দেখা করতেও ছাড়তাম না। কখন যে কিকরে বা কি বলে বসবে সে কেউ বলতে পারতো না—সবসময়েই সতর্ক থাকতে হয়েছে। রসিকতার ধার অবশ্য ধারেনি হ্যাডো, স্থুল পরিহাসের প্রচেষ্টা চালিয়েছে সর্বক্ষণ। প্রচুর জ্ঞান ছিলো তার, আশ্চর্য স্মরণশক্তি—সর্বদ্রষ্টার ভাব সবসময়ে, যা একাধারে প্রশংসনীয় আবার বিরক্তিকরও মনে হয়েছে। কোনো বই অপঠিত থেকে গেছে তার

এটা শুনিনি কখনো। আর যখনই তাকে পাকড়াও করেছি, কোনো না কোনা বইয়ের অনুরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছে সে, যা —আমি হলপ করে বলতে পারি সে জীবনে চোখে দেখেনি। সুবক্তা, অলংকার দিয়ে কথা বলার অভ্যাস তার, যা থেকে তার বক্তব্যের বিষয় আরও হাস্যকর হয়ে উঠতো। বংশমর্যাদার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, বিচিত্র সব কাহিনীও শোনাতো পূর্বপুরুষদের। ওর যদি তেমন পরিবর্তন না ঘটে থাকে, তাহলে এখনো সেসব কাহিনীর বর্ণনা সবিস্তারে শুনবে; ওর বাবা গত হয়েছেন, স্ট্যাটফোর্ড-শায়ারে কিছু সম্পত্তিও আছে হ্যাডোর। ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যাপার। আমি তার ছবি দেখেছি, সুদৃশ্য সে ছবি। অক্সফোর্ডের দিনগুলো তাই তার কেটেছে একধারে—শ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসের সংমিশ্রণে, মিথ্যেবাদী এবং বদমাস বলে কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। যার সংস্পর্শেই এসেছে হ্যাডো তার সঙ্গে কৌতুক করেছে, রাগিয়েছেও, বিরক্ত করেছে। সবসময়ে রহস্যের আভাস—একটা রোমান্টিকতার ছোঁয়া।

এত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েও তাদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে সে। গোপন কু-অভ্যাসও ছিলো কিছু—প্রাচ্য দেশীয় নেশাভাঙের অভ্যেস।

তারপর একদিন অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে যায় সে। দেশবিদেশ ভ্রমণ করছে ও শুনেছি পরে। পরে যখন দেখা হয়েছে তার পরিচিতদের সঙ্গে, কেউ বলেছে সে মার্কিনমুলুকে পাড়ি দিয়েছে। অন্যে বলেছে ভারতে চলে গেছে, মঠে দেখা গেছে নাকি তাকে। কেউ-বলেছে, মিলানের এক নাচওয়ালীকে বিয়ে করেছে। আর একজন নিঃসন্দেহ; মদ্যপ বনে গেছে হ্যাডো। তথ্য সরবরাহকারীরা অবশ্য একটা বিষয়ে একমত—হ্যাডো সাধারণ জীবনযাপন করছে না। অবশেষে, একদিন পিকাডেলীতে দেখা, সৌভাগ্যে বসে গেলাম ডিনারে। হ্যাডোকে চেনাই যায় না—এত মেদবৃদ্ধি হয়েছে ওর—চুলও পাতলা হতে শুরু করেছে। পঁচিশ বছরের যুবকটাকে অনেক বেশী বর্ষীয়ান মনে হচ্ছিলো। ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করলাম—কিন্তু

না, হ্যাডো যে রহস্যের মানুষ, তাই রয়ে গেছে। আমাকে একটা কথাই জানালো—মেলা দেশ পরিক্রম করেছে সে, যেসব দেশে সাদা মানুষের পায়ের ধুলো পড়েনি কখনো। এমন সব গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে—যা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে সক্ষম। মনে হলো দেহের দিক থেকে স্থূলত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনটাও স্থূল হয়ে গেছে তার। তাকে আর আগেকার মতো সেই ক্ষুরধার মানুষ মনে হয়নি। রসিকতারও ধার নষ্ট হয়েছে। ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে বাঁচলাম যেন, কারণ আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে, ভুলকি চালে বেরিয়ে পড়েছিলো সেদিন হ্যাডো—বিল মেটাবার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েই।

সেদিন পর্যন্ত ওর আর কোনো খবরই পাইনি, যেদিন ডিনারে মিস লে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো জর্মন অনুসন্ধানকারী বার্কহার্ডট-এর সঙ্গে। মধ্য এশিয়ার ওপর একখানা বই বেরিয়েছে কিছুদিন আগে বার্কহার্ডট-এর, মনে আছে বোধহয় তোমার। অলিভার হ্যাডো তার সঙ্গী হয়েছিলো সে যাত্রায়, জেনেছি। তাই বইটা পড়ার ইচ্ছে ছিলো। ব্যস্ততার দরুণ পড়া হয়নি। জর্মন ভদ্রলোকটির কাছে আমার বন্ধুটির খবর জানতে চাইলাম। বার্কহার্ডট—এর সঙ্গে আফ্রিকার মোম্বাসায় দেখা হয়েছিলো হ্যাডোর, হঠাৎই। বড় শিকারের ব্যাপারে চিন্তায় বিভোর নাকি হ্যাডো। একসঙ্গেই যাওয়া ঠিক করেছিলো ওরা। বার্কহার্ডট-এর ধারণা হ্যাডো অসাধরণ ক্ষমতাশালী শিকারী, তবু তার দম্ভে সন্দিহান হয়েছিলো। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো হ্যাডোর একটা কথাও অতিরঞ্জিত নয়। এক হাতে একা বেরিয়ে তিনটে সিংহ সে মারে, এবং প্রতিটিকেই এক এক গুলিতে। এসবের কিছুই জানা ছিলো না, কিন্তু বার্কহার্ডট-এর কথায় মনে হলো ঘটনাটার প্রতি বর্ণই সত্যি।

যথেচ্ছাচারের ভঙ্গিতে মেরেছে হ্যাডো জন্তুজানোয়ার, শুধুমাত্র আমোদের কারণে। তাদের চামড়া বা সিংগুলোকে সঙ্গে নেবার প্রয়োজনও বোধকরে নি কখনো। কৃষ্ণসার হরিণ মারা প্রায়

অসম্ভব জেনেও, এবং সন্ধ্যে নামার পর সেগুলোর পশ্চাদ্ধাবন প্রায় অনিশ্চিত মনে করেও মেরেছে তা হ্যাডো। চরম স্বার্থপর লোক। এ সবের সম্পর্ক ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি বার্কহার্ডটকে পূর্বাহ্ণে। এসব মেনে নিয়েও তাকে তার সঙ্গে সঙ্গী করেছে বার্কহার্ডট। একাধিক বার তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে হ্যাডো, একথাও স্বীকার করেছে বার্কহার্ডট। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে হ্যাডোর অসদ্ব্যবহার নিয়ে তার ও বার্কহার্ডট-এর মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে। নৃশংসতার পরিচয়ও পাওয়া গেছে। শেষে, তাঁবু রক্ষকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার ফলস্বরূপ লোকটাকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে হ্যাডোর হাতে। হ্যাডো অবশ্য বলেছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মারতে হয়েছিলো লোকটাকে, কিন্তু অবস্থা ঘোরালো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে।

বার্কহার্ডট-এর ধারণা হ্যাডোই এর জন্যে দায়ী, এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বার্কহার্ডট ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছে। হ্যাডো মৃতের পরিজনতাড়িত হয়ে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। তোমার চিঠি পাবার আগে আর ওর কোনো পাত্তা ছিলো না।

লোকটা অসাধারণ স্বীকার করে নিয়েও, জানাচ্ছি—ওর ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময়ই থেকে গেছে। ওর সম্পর্কে অদ্ভুত কোনো খবর শুনলেও বিস্মিত হবো না। মহামারীর মত তাকে বর্জন করা উচিৎ বলে মতে করি আমি। হ্যাডো কারো বান্ধব হতে পারে না। পরিচিতের কাছেও বিশ্বাসঘাতক সে, শঠ। নিষ্ঠুর—নীতিজ্ঞানশূন্য মানুষ অলিভার হ্যাডো।

বিদায়, বৎস। ফরাসী শল্যচিকিৎসার কাজ আশাকরি ভালোই চালাচ্ছো স্টুডিওতে তোমার। শল্যচিকিৎসকের রাজকীয় সম্মান লাভ করো—রাজপুরুষদের রোগমুক্তি ঘটাও। তোমারই একান্ত

ফ্রাঙ্ক হারেল॥

বার দুয়েক চিঠিটা পড়ে আর্থার একটা খামে পুরে বিনা মন্তব্যে রেখে দিলো একপাশে মিস বয়েডের পড়ার জন্যে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সুসি বর্থেডের উত্তর এলো—ওকে বুধবার চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। এখন আর সেটার পরিবর্তন সম্ভব নয় তুমিও আসবে আমাদের সাহায্যে। কিন্তু অবিনয় দেখানো চলবে না তাকে, কারণ আমাদের অনেকের মতই, লোকটা 'টেন কমাণ্ডমেন্টস-এর মানসিক সুযোগ নিয়েছে মাত্র।

হ্যাডোকে যেদিন চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে ছিলো ওরা, মার্গারেটের দরজায় ক্রিসান্থিমামের এক বিরাট গোছা ছেড়ে এসেছিলো সে। সাদামাটা স্টুডিওর চেহারাই ফিরে গেছে তাতে। আর্থারের মন খারাপ হয়ে গেলো ঢুকেই, এটা আগেই ভাবা উচিত ছিলো তার, —অত্যন্ত দুঃখিত আমি। আমাকে হয়তো খুব অবিবেচক ভাবছো—

মার্গারেট হেসে তার হাতটা ধরলো,—তোমাকে ভাল লাগে বোধহয় এ'জন্যে যে, ছোটখাটো প্রেমনিবেদনের ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাও না তুমি—

—মার্গারেট মেয়েটা বুদ্ধিমতী। সুসির ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো,—জানে, কেউ যখন ফুল পাঠায়, সে একাধিক নারীর প্রশস্তি গেয়েছে।

—আমার মনে হয় না এগুলো আমাকেই বিশেষ করে পাঠানো।

আর্থার বারডন প্রফুল্ল মনে আগুনকুণ্ডের পাশে বসলো। পর্দাগুলো টানা রয়েছে, আলোর কমনীয়তায় ঘরে একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মুক্ত পরিবেশের এক আবহাওয়া—এ আবহাওয়ায় গম্ভীর হওয়া যায় না।

কদিনের পরিচয়ে আর্থার আর সুসি অনেক অন্তরঙ্গ হয়েছে। আর্থারকে করুণার চোখে দেখে সে—বয়স্কা অবিবাহিতার চোখ নিয়ে। তার কাছে ছেলেটা বোকামিতে ভরা এক প্রেমপাগল ছোকরা। তার ধারণা, এই অবস্থাতেই বুদ্ধিমান যে কারোরও একই প্রতিক্রিয়া হতো। মার্গারেটের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বাড়াতে আর্থারের নিরেট ব্যক্তিত্বেরও সন্ধান মিলেছে। কোনো ভান নেই ছেলেটার।

একনজরে ছেলেটার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়—বিনয়ী, সৎ—সরল এক যুবকের চরিত্র। কল্পনার আতিশয্য নেই, বুদ্ধিদীপ্ত না হয়েও

বিশ্বাসযোগ্য—নির্ভরশীল। মার্গারেটের টেবিলের কুকুরটাকে হাঁটুর ওপর নিয়ে বসেছে, মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে সস্নেহে সেটার। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুসির বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে—এমন একজনের ভালবাসা তো সেও পেতে পারতো…

সঙ্গী হিসেবে আদর্শ ছেলেটা—আর্থার এমন চরিত্রের যুবক, যার ভালবাসার কোনো রূপান্তর হবে না…

ডাক্তার ঢুকে বসে পড়লো, স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টতার আমেজ তার চোখমুখে। মন্দভাষী পোরোয়ের কিন্তু শ্রোতা হিসেবে খ্যাতি আছে। কুকুরটা আর্থারের কোল থেকে নেমে ডাক্তারের দিকে ছুটে গেলো, তার পায়ে মুখটা ঘষলো প্রিয়জনের ভঙ্গিতে। ওরা হালকা গলায় কথা শুরু করলো, আর এক অভ্যাগতের আগমনের কথা প্রায় বিস্মৃত। মার্গারেটের কায়মনোবাক্য প্রার্থনা—সে যেন না আসে।

আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মার্গারেটকে। তার পাকা গৃহিনীর মত চালাফেরা আরও লাবণ্যময় করে তুলেছে তাকে। চা তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মার্গারেট। ডাক্তারের গলা থেকে ফরাসীতে স্তুতিবাক্য বেরোলো একটা।

পরিবেশটা সত্যিই এক নৈসর্গিক রূপ নিয়েছে।

দরজায় শব্দ উঠতে আর্থার উঠে গেলো সেটা খুলতে: কুকুরটা পায়ে পায়ে চলেছে তার।

অলিভার হ্যাডো ঢুকলো। সুসির চোখ কিন্তু কুকুটার ওপর, তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে। ল্যাজটা পা'দুটোর ফাঁকে গুটিয়ে নিয়ে বেচারা ঘরের কোণে সরে গেলো। সন্দেহাকুল, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে সেটা হ্যাডোর দিকে। মাথা নামিয়ে নিলো কুকুরটা।

অভ্যাগত, হ্যাডো—অভিবাদনের পর্বে ব্যস্ত থাকায় নজরই করলো না ঘরে একটা পশুর অস্তিত্ব। তার পুষ্পোপহারের প্রত্যুত্তরে যথাযথ ধন্যবাদের বার্তাও জুটলো। এবং তা অনাড়ম্বরে গ্রহণ করলো হ্যাডো। তার ব্যবহার ওদের বিস্মিত করেছে। ভনিতা ছেড়ে হ্যাডো স্টুডিওর চারপাশে চোখ ফেরালো—মুগ্ধ সে।

মার্গারেটকে তার স্কেচগুলো দেখাতে অনুরোধ করলো। হ্যাডো নিরহঙ্কার চোখে দেখে চললো স্কেচগুলো। সমালোচনায় ধার আছে তার, যে সম্পর্কে বলছে সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে। নিজে অপেশাদার বলে দাবী করলেও শিল্পবোধ আছে তার। ছবিগুলো একদিকে সরিয়ে দিলো সে। মেয়েরা তার সমালোচনায় প্রীত। হ্যাডো বলে চললো কথা, এই প্রথম। নিজের কথা নয়। নানান দেশের ব্যাখ্যান। আনন্দ দিতে চায় হ্যাডো, সুসি বুঝলো। কি করে হ্যাডো অক্সফোর্ডের তরুণ শিক্ষার্থীদের মন জয় করেছিলো। হ্যাডোর আলাপে রোমান্সের ছোঁয়া ছিলো, ছিলো হাসির খোরাক, আর ফ্র্যাঙ্ক হারেল যেমনটা বলেছিলো—বুদ্ধিদীপ্ত না হলেও, রসের অভাব নেই সেই আলাপচারীতে। সুসি মুগ্ধ হলেও জানে শুধু এই কারণেই হ্যাডোকে এখানে আসতে বলেনি সে। অপরসায়নের বই পড়েছে সে ডাক্তার পোরোয়ের কাছ থেকে নিয়ে, হ্যাডোর অভিজ্ঞতা যে শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে তার দিকেই মোড় ফেরাতে চায় সুসি প্রসঙ্গে। বইটা পড়েছে সেও—তার বিষয়বস্তু। আরও জানতে চায় সে, আগ্রহ তার এ বিষয়ে অসীম। যে পরিশ্রমের কাজে এত মানুষ জীবন অতিবাহিত করেছে—ভাগ্যহত হয়েছে—অত্যাচার আর নির্যাতন যার নিত্যসঙ্গী হয়েছে, সে বিষয় তার মনোযোগ কেড়েছে।

ডাক্তার পোরোয়ের দিকে ফিরলো সে,—প্রবীন অপরসায়নজ্ঞরা বিত্তবান হয়েছে একথা ঘোষণা করে যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয়ই দিয়েছো তুমি।

—অতদূর বোধহয় যেতে পারিনি আমি, এটুকুই বলার আমার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা যদি প্রামান্য বলে স্বীকৃত হয়, তা গ্রহণ-যোগ্য হবেই।

—ভূমিকায় প্যারাসেলসাসের যে উল্লেখ করেছো তাঁর জীবনী লিখবে তুমি কোনোদিন, আশা করি?

ডাক্তার পোরোয়ের ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো,—ওটা আর

কোনোকালে সম্ভব হবে মনে হয় না। অথচ, অপরসায়নের মানুষদের মধ্যে সবচাইতে কৌতূহলের মানুষ ছিলেন উনি। ওই বিদ্যের কতটুকু তাঁর আয়ত্তে তা নিজেই হয়তো জানতে পারেননি।

অলিভার হ্যাডোর দিকে চোখ ফেরালো সুসি বয়েড। নিঃশব্দে বসে সে, তার মাংসল মুখে ছায়া পড়েছে। বক্তার মুখের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিরাট দেহটাও আশ্চর্য স্থির।

ডাক্তার কিন্তু তার কথা বলে চলেছে—পরবর্তী তথ্যাদিতে যে বিবরণ মেলে তাঁর সম্পর্কে, ততটা হাস্যস্পদ মানুষ অবশ্য তিনি নন। বম্বাস্টের খ্যাতিহান পরিবারে জন্ম—বংশ পরম্পরায় যার নাম হয়েছে হোহেনহাইম। ওয়ারটেমবার্গে স্টুটগার্টের কাছাকাছি প্রাসাদটা। পুঁথিগত প্রমাণের অভাবই তাঁর সম্পর্কে সবিস্তার কিছু জানার প্রতিবন্ধক। জর্মনী, ইতালী, ফ্রান্স থেকে শুরু করে নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, সোভিয়েত দেশও ঘুরেছেন। ভারতবর্ষেও গেছেন। তাতারদের হাতে বন্দী হয়েছেন। মহান খানের সামনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর ছেলের সঙ্গে। পরে কনস্ট্যান্টিনোপল যেতে হয়েছে। ষোড়শ শতকে এখানেই তিনি সলোমন ট্রিসমনিসাসের হাত থেকে দার্শনিকের সম্মান গ্রহণ করেন। সলোমন নাকি ইউনিভার্সাল প্যানাসিয়ার অধিকারী হয়েছিলেন, এক ফরাসী পর্যটকের মতে তাঁকে সপ্তদশশতকের শেষেও জীবিত দেখা গেছে। প্যারা-সেলসাস এরপর ড্যানিউবের সীমান্তবর্তী দেশ পেরিয়ে ইতালীতে পৌঁছেছেন। সেখানকার রাজকীয় বাহিনীতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে, 'প্যাভিয়ার' লড়াইতে তার উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। চিকিৎসক থেকে শুরু করে অপরসায়নবিদ—জহ্লাদ, ক্ষৌরকার, মেষপালক, ইহুদী, ঘরণী—জীপসী আর ভবিষ্যদ্বক্তা কাউকেই বাদ দেননি, তথ্যসংগ্রহের তালিকা থেকে। শিক্ষিত থেকে অপোগণ্ড একাধারে। তোমাকে যে বই দিয়েছি তার ভূমিকায় তাঁরই কিছু কথা আমি উদ্ধৃত করছি।

ডাক্তার সুসির কাছ থেকে বইটা নিয়ে খুললো, চিন্তার ছায়া

তার চোখে। পড়তে শুরু করলো সে :

'শিল্পসন্ধানে ঘুরেছি আমি, বিপদ মাথায় নিয়ে। যা শিক্ষনীয় তা নিয়েছি—ভবঘুরে, জহলাদ বা ক্ষৌরকার নির্বিশেষে। জীবনের ঈপ্সিত নারীর সন্ধানে মানুষ অনেক দূর যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানান্বেষণে মানুষ কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত—জানি না।

পাতা উল্টে গেলো ডাক্তার, পড়ছে ;

'জ্ঞান আহরণের কারণে আমাদের সেইসব জায়গাতেই যাওয়া উচিত, যেখানে তার সন্ধান মিলতে পারে। আর, যে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখার যৌক্তিকতা আছে কি ? নিশ্চিন্তে যারা বাড়িতে বসে থাকে, হয়তো আরাম পায়—ধনবানও হয়, ভবঘুরেদের তুলনায়—কিন্তু আমি আরাম চাই না, চাই না বিত্ত।

বাঃ। সুন্দর কথাগুলো তো! আর্থার উঠে পড়লো।

সরল কথা—অলংকারবাহুল্যবর্জিত। ডাক্তার পোরোয়ের ঠোঁটে একফালি হাসি দেখা দিলো,—অথচ দ্যাখো—যে লোক এসব লিখেছে সে কিন্তু ভাঁড়েরও অধম! নিজের সম্পর্কে তার অতিশয়োক্তি হাস্যকর। ভদ্রলোকের চরিত্রে শুধু অসারতা, বাহ্যাড়ম্বরতা, অতি দম্ভে ভরা ; শোনো—আমার অনুগামী—হে অ্যাভিকেনা, গ্যালেন ; র‍্যাসেস অ র মন্টাগনানা। আমার অনুগামী তোমরা, তোমাদের অনুগামী আমি নই—প্যারিস, মন্তপোলয়ের, মাইসেন আর কোলোনের মানুষেরা ডানিউব আর রাইন নদীতীরের মানুষেরা—সমুদ্রের তটবর্তী মানুষেরা। আমি তোমাদের মতানুসারে চলবো না—কারণ আমি সর্বময়। একটা সময় আসবে যখন তোমরা সবাই হেয় হবে দুনিয়ার চোখে, এবং আমি তখন সম্রাট।

পোরোয়ে বই বন্ধ করলো।

—এরকম কিছুর কথা শুনেছোকস্মিন কালে? তবু, বলিষ্ঠতা আছে তার কাজে—লাতিনের পরিবর্তে জর্মন ভাষায় লিখছে সে—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। দেশ-

দেশান্তরে ঘুরে চলেছে সে শিষ্যপরিবৃত হয়ে। কখনো প্রাপ্তির আশা নিয়ে কোনো ধনবান রাষ্ট্রে, কখনো কোনো যুবরাজের আমন্ত্রণে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাজদরবারে। তার নির্বুদ্ধিতা আর শত্রুপক্ষের বিদ্বেষ কিন্তু তাকে কোনো জায়গাতেই স্থিতি দেয়নি। নুরেমবার্গের চিকিৎসকেরা তাকে হাতুড়ে বলে চিহ্নিত করেছে, প্রতারক আখ্যা দিয়েছে। ওদের মোকাবিলা করতে শহরের পুরসভাকে অনুরোধ জানিয়েছে। প্যারাসেলসাস দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কাঁধে তুলে নিয়েছে। এলিফ্যান্টিয়াসিস রোগের অসংখ্য রোগী এসেছে তার কাছে। সে তাদের সারিয়ে তুলেছে। নুরেমবার্গের সংগ্রহশালায় সেসব নথির সন্ধান মিলবে। এক সরাইখানার হল্লাতে শেষে প্রাণ হারালো সে। সালজবার্গে মাটি দেওয়া হয়েছে তাকে।

কিংবদন্তী, তার নশ্বরদেহ জীবিতাবস্থায়ই সচেতন হয়ে যাওয়ায় সে এখনও সপ্রাণ আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত। এশিয়ার কোনো এক জায়গায় নাকি অন্যদের সঙ্গে আছে সে। তার অনুগামীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, কখনো সশরীরে দেখাও দেয় তাদের, স্পর্শসুভগও কখনো।

—কিন্তু দ্যাখো—প্যারাসেলসাস কিন্তু এইসব প্রবীণদের মতই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো বস্তুর আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি।

ড. ক্লারের ঠোঁটে আবার হাসি দেখা দিলো,—অপ্রাপ্তবগুলোই পছন্দ আমার। টিঙ্কুরা ফিসিকোরাম-এর কথাই ধরো, যা পোপ বা অন্য কোনো সম্রাটের পক্ষেই কেনা সম্ভব ছিলো না। অপরসাধ্য যে এক বিরাট রহস্য, এবং বেশ কিছু বইয়ে 'দি রেড লায়নের' কথা উল্লিখিত হলেও প্যারাসেলসাসের আগে কম মানুষই তার কথা জানতো। জানতো হারমিস ট্রিসমেগিস্টাস আর অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস। টিঙ্কুরা-র প্রস্তুতির ব্যাপারটাও জটিল, কারণ সুসঙ্গত দুটি মানুষের প্রয়োজন, যারা দক্ষতারও সমান। এক ধরণের লাল পদার্থ—ঐশ্বরিক। তার অনেক গুণের অন্যতম যে কোনো নিকৃষ্ট ধাতুকে

সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা। ব্যাভোরিয়ার দক্ষিণে একটা গির্জার মাটি খুঁড়লে নাকি এখনো টিঞ্চার বেরোবে। ষোলোশো আটানব্বইতে তার খানিকটা মাটি ফুঁড়ে দেখা দিয়েছে—বন্ধু মানুষে দেখেছে তা। অলৌকিক কিছু বলে বিশ্বাসও করেছে। তার ওপর যে গির্জাটি তৈরী হয়েছে তা আজো তীর্থস্থান। প্যারাসেলসাস এর প্রস্তুতির নির্দেশ শেষ করেছেন এই বলে। তবে, এটা যদি দুর্বোধ্য মনে হয় কখনো, তাহলে মনে রাখতে হবে—যে মানুষ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে কিছু চায়—তার কাছেই, শুধু তার বন্ধদুয়ারে করাঘাত করছে যে প্রবলভাবে—তার কাছেই দুয়ার হবে উন্মুক্ত।

—আমার দ্বারা কখনোই তা সম্ভব নয়—মৃদু হাসি দেখা দিলো আর্থারের ঠোঁটে।

—তারপর আছে ইলেকট্রাম ম্যাজিকান—যে যাদু আয়নার ভেতর দিয়ে অতীতের সব কিছু নজরে পড়বে, বর্তমানেরও। মানুষের দিবা-রাত্রের কার্যকলাপও। যে মানুষের মুখ দিয়ে সে কথা উচ্চারিত তাকেও দেখা যাবে—কি কারণে বলা হয়েছে তাও জানা যাবে। কিন্তু প্রাইমাম এন্স মেলিসে সবচেয়ে বেশী পছন্দ আমার। তার প্রস্তুতির ফিরিস্তি দেওয়া আছে। জীবনকে দীর্ঘতর করার ওষুধ—প্যারাসেলসাসই শুধু নয়, তার পূর্বসূরীরা—গ্যালেন, ভিলানোভা-র আর্নল্ড, রেমণ্ড লালী—পরিশ্রম করেছে অসীম, এসব আবিস্কার করতে।

—আমি কি আঠারো বছরে ফিরে যেতে পারবো? সুসি সাগ্রহে বলে উঠলো।

—তাই করবার অঙ্গীকার রয়েছে—চতুর্দশ লুইয়ের এক চিকিৎসক, লেসেব্রেন—স্বচক্ষে দেখা কিছু পরিষ্কার কথা জানিয়েছে। তারই এক বন্ধু ওষুধটা তৈরী করেছে, আর স্বচক্ষে তার কর্মদক্ষতা না দেখা পর্যন্ত তার স্বস্তি ছিলো না।

—এইতো সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর্থার হেসে উঠলো।

—প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক পাত্র করে শ্বেত মদ্য এই বস্তুটির সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন তিনি। চোদ্দদিন ব্যবহারের পর নখগুলো খসে পড়তে লাগলো তাঁর, অবশ্যই ব্যথাহীন। এই পর্যায়ে তার সৎসাহসও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক বৃদ্ধা পরিচারিকাকেও দিয়েছেন তা খেতে। যৌবনের একটা বিশেষত্ব অন্তত লক্ষ্য করা গেলো—বিস্ময়ের সঙ্গে তা অনুভব করেছেন তিনি—কারণ সে যে ওষুধ সেবন করছে তা জানে না সে। ভয় পেয়ে গেলো সে, ওষুধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। পরীক্ষক তখন কিছু শস্য নিয়ে সেই মিশ্রণে ভিজিয়ে এক বয়ঃপ্রাপ্তা মুরগীকে দিলেন। ষষ্ঠদিন থেকে মুরগীটির পালক খসতে শুরু করলো, ক্রমে সেটা এক সদ্যোজাত ছানার অবস্থায় এলো। আরও সপ্তাহ দুয়েক না যেতে আবার পালক গজালো—এগুলোর রঙ আরও উজ্জ্বল. আবারও ডিম দিয়ে চললো সেটা।

আর্থার এবার জোরে হেসে উঠলো,—এ গল্পটা কিন্তু আমার অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে। 'প্রাইমাস' অবশ্য যাদু সংগোপনতার চেয়ে অন্তত বেশী সংখ্যক অকিঞ্চিৎকর সুযোগের সন্ধান দিয়েছে।

—স্বর্ণ অন্বেষণের ব্যাপারটা তাহলে অকিঞ্চিৎকর বলতে চাইছো? হ্যাডো এতক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর বলে উঠলো।

—অর্থ লিপ্সা প্রণোদিতও বলা যায়।

—নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করছো তুমি!

—কারণ, রহস্যসন্ধানী মানুষরা তাদের লক্ষ্যে দুষ্ট। আমার সরল মাথায় শুধু একটা কথাই মনে হয়, মৃতদের অস্পষ্ট ঠোঁট থেকে কেবলমাত্র তুচ্ছ কথা শোনার জন্যে তাদের জাগ্রত করার ব্যাপারটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আর, আধুনিক সভ্যযুগে এক স্বর্ণসন্ধানী অপরসায়নজ্ঞকে একটা শ্রদ্ধেয় মনে করার কোনো কারণ নেই।

—সোনার খোঁজে যদি সে সময় ব্যয় করেই থাকে, তাহলে সে তা করেছে—যে শক্তি সে অর্জন করেছে তার জোরেই। সেই শক্তির

সাধনাই তো করেছে সে দিবারাত্র। তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে, তার প্রভাব বিস্তৃত করতে। ঈশ্বরের ওপর প্রভুত্বর স্বপ্ন নিত। অসীম লালসা তাকে আকাশের তারকার ওপর প্রভাব বিস্তারের স্বপ্নেও বিভোর করেছে।

হ্যাডো এই প্রথম তার রহস্যজনক চালচলন বিসর্জন দিলো। কথার মধ্যে কেমন একটা মত্ততার প্রলাপ তার—এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখমুখে, যা আগে দেখা যায়নি। চোখের তারায় এক বিচিত্র ঔদ্ধত্যের প্রতিফলন—আর, মানুষের জীবনে শক্তির সাধনা ছাড়া আর কি কোনো লক্ষ্য আছে? অর্থই যদি কাম্য হয় তাদের, তাহলেও তার সঙ্গে শক্তি বা ক্ষমতার সূত্র গাঁথা। সুখ চায় শুধু বোকারা, মদ্যপে। মানুষ চায় ক্ষমতা। যাদুকরই বলো, অপরসায়ন নিয়ে যাদের কাজ—অজানার হাতছানিতে ভেসে তারা। সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত এক মহত্ত্বের অধিকারী হয় তারা। যে বিষয়ের চিন্তা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে তারই শিকার হয় তারা, ধৈর্যের পরীক্ষা চলে, শক্তির যাচাই—ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় কল্পনার। যাদুকরের এ-ই অস্ত্র। ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার শক্তি।

অলিভার হ্যাডো এবার তার বিরাটকায় শরীরটা নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। পায়চারী করে চললো সে স্টুডিওর মধ্যে। এক বিচিত্র উত্তেজনার শিকার হ্যাডো—কৌতুকের চোখে দেখছে সবাই তাকে।

—প্যারাসেলসাসের কথা হচ্ছিলো। বলে চললো হ্যাডো। —তাঁর একটা পরীক্ষার কথা ডাক্তার বলেনি। সেটা অবশ্যই হীন কিছু নয়, অর্থের লোভপ্রসূতও নয়—তবে ভয়ঙ্কর। কতটুকু সত্যতা আছে এ কাহিনীর—জানি না, তবে—যেকোনো মানুষ তা পরীক্ষা করে অসাধারণ বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে।

ঘরের চারটে মানুষ, যারা ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে—তাদের দিকে তাকালো হ্যাডো একের পর এক। তার কথার

ভঙ্গিতে এক আশ্চর্য উত্তেজনার অনুভব—যেন, যে সম্বন্ধে বলতে চলেছে সে, তা তার হৃদয়ের একান্ত গভীরেই,—স্বতঃস্ফূর্ত বংশানুক্রমে বিশ্বাস করতেন প্রাচীন অপরসায়নজ্ঞেরা। দৈহিক শক্তির সঙ্গে বিচিত্র সব সারভাগের সমন্বয়ে তারা এমন আত্মাদের সৃষ্টি করেছে যাতে জীবনের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশী বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে পুরুষ ও নারীর স্বপ্ন। যাদের নাম দেওয়া 'হোমানকালি'। প্রাচীন দার্শনিকেরা এর রূপায়ন অসম্ভব মনে করেছেন, কিন্তু প্যারাসেলসাস দাবী করেন, তা সম্ভব। একবার লণ্ডন ব্রিজের কাছে ঠেলাগাড়িতে বিক্রি বইয়ের স্তূপ থেকে গানের মনে করে একটা ছেঁড়া বই তুলে নিয়েছিলাম। জার্মান ভাষায় লেখা বই। ময়লা, হাতের ছাপে ভর্তি। অনেকগুলো পাতা ছিঁড়েও গেছে। বাঁধাই খুলে পাতা আলগা হয়ে এসেছে। 'ডাই স্ফিংক্স' নাম বইটার, ডক্টর এমিল বেসেটজনি সম্পাদিত। এতে সতেরোশো পঁচাত্তরের টাইরলের জোহান-ফার্দিনান্দ, কাউন্ট ফন কুফস্টাইনের আত্মা সম্পর্কিত কিছু আশ্চর্য সব ঘটনার উল্লেখ ছিলো। এগুলোর সূত্র পাণ্ডুলিপি থেকে, তবে জনৈক জোসেফ কামেরার-এর দিনপঞ্জি থেকেই বেশী। কাউন্টের পাচক হিসেবে কাজ করেছে লোকটা।

বোতলের মধ্যে রাখা হতো—শক্ত একটা পাত্রের মধ্যে। ফল রাখার মত করে তৈরী, জলে পরিপূর্ণ। পাঁচ সপ্তাহ পরে সেগুলোকে তৈরী করা হতো, কাউন্ট করতেন কাজটা—সঙ্গে একজন ইতালীয় মিস্টিক, নাম তার আবে গেলোনী। যাদু-ছাপ দিয়ে বোতলগুলো এঁটে দেওয়া। কাউন্টের ধারণা, সেগুলো বেড়ে উঠবে কখনো। দুগাড়ি ভর্তি গোবর-সারে ভরা সেগুলো। প্রতিদিন এক ধরণের তরল পদার্থে সিঞ্চিত করা হতো। সিঞ্চনের পর সেগুলো ফুটতে শুরু করতো, যেন আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। বোতলগুলো সরিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেলো আত্মাগুলো বেড়ে উঠেছে। পুরুষ হোমানকালির গালে দাড়ি জন্ম নিয়েছে। আঙুলের নখও বেড়েছে।

দুটো বোতলে শুধু জলই চোখে পড়েছে, এবং আবে ছিপিতে তিনবার আঘাত করেছে, মুখে কিছু হিব্রু শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে। জলটুকু এক বস্তু্যজনক রঙ নিতে, আত্মাগুলোর মুখ দেখা দিলো একে একে—ক্রমে সেগুলো আকারে বড় হয়ে একটা পরিপূর্ণ মানুষের চেহারা নিয়েছে। ভয়ঙ্কর, শয়তানের প্রতিমূর্তি সেগুলো।

হ্যাডো অনুচ্চগলায় কথা বললেও পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে তার মনে নাড়া পড়েছে। স্বাভাবিকভাব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে তার পক্ষে,

—কাউন্ট প্রতি তিনদিন অন্তর সেগুলোকে খেতে দিতেন একটা রৌপ্যপাত্র থেকে গোলাপীরঙ জলীয় পদার্থ। সপ্তাহে একবার বোতলগুলোকে শূন্য করা হতো, বৃষ্টির জলে নতুন করে ভরবার জন্যে। দ্রুতপরিবর্তন সাধন করতে হতো, কারণ—উন্মুক্ত অবস্থায় চোখ খুলে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তো তাদের। দুর্বল হয়ে পড়তো, চেতনা হারিয়ে ফেলতো। অদৃশ্য আত্মাগুলোকে দিয়ে নিয়মিতভাবে রক্ত ঢালা হলো জলে। মিলিয়ে যেতো সেটা সঙ্গে সঙ্গে, জলে কোনো রঙের রেখা না রেখে।

একদিন দৈবক্রমে বোতলগুলোর একটা মাটিতে পড়ে ভাঙলো। 'হোমানকালিটা' মরলো। তাকে বাঁচাবার সর্বচেষ্টা ব্যর্থ হলো। বাগানে কবর দেওয়া হলো সেটাকে। আর একটাকে উৎপাদন করার প্রচেষ্টাও চেষ্টা ব্যর্থ হলো; জোঁকের মত একটা কীটের জন্ম হলো—শক্তিহীন, সেটাও মরে গেলো।

হ্যাডো কথা শেষ করলো। আর্থার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে,—কিন্তু এটাকে সম্ভব মেনে নিলেও—ওই বিচিত্র জন্তু-গুলোকে উৎপন্ন করার দরকার ছিলো ?

—ব্যবহার করবার জন্যে। অস্তিত্ববাদের রহস্য আবিষ্কৃত হলে মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারতো মনে হয় তোমার ? তার সামনে মৃত বা জীবিত কিছু দেখলে ? ঐতিহাসিক মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এ'সব—কাউন্ট ম্যাক্স লেমবার্গ,

কাউন্ট ফ্র্যানজ যোশেফ ফন থান তাঁদের অন্যতম। আরও অনেকেই। সেগুলোকে যে উৎপন্ন করা হয়েছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে —দক্ষতার সঙ্গে, সাহস থাকলে কোনো কিছু করা কি অসম্ভব হতো? মৃতের থেকে মূলীভূত উপাদান সংগ্রহ, অজৈব থেকে জৈব উপাদন সংগ্রহের জন্যে গবেষণাগারে মাথা খুঁড়ে চলেছে বিজ্ঞানী। তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। ওরা যা জানে তাও আমার অজ্ঞাত নয়। তাহলে প্রবীন আধারের সাহায্যে আরও বড় করে আজকের বিজ্ঞানীরা কাজ করবে না কেন?

ফল কি হবে জানি না। হয়তো বৈচিত্র্যেভরা বা আশ্চর্যজনক কিছু হতে পারে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে—প্রাণহীন বস্তু কিছু আমার যাদুর প্রভাবে কাজ করছে. দেখতে।

এক অলৌকিক হাসির রেশ ফুটলো তার ঠোঁটে, আধানিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয় সুখবর্ধক সে হাসি। মার্গারেট শিউরে উঠলো। হ্যাডো চেয়ারে তার বিপুল দেহটা ছেড়ে দিয়েছে, ছায়ায় বসে সে। রক্তলাল হয়ে গেছে তার চোখ দুটো। শূন্যে মেলে ধরেছে সে দৃষ্টি, ভীতি-জনক। আর্থার চমকে উঠলো, সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো হ্যাডোর দিকে সে। ওই হাসির সঙ্গে অদ্ভুত এক দৃষ্টি মিলে. আবেগে এক হয়ে অন্য অর্থ বয়ে এনেছে। অলিভার হ্যাডোর ব্যাখ্যা যেন অপ্রকৃতিস্থের ব্যাখ্যা!

অস্বস্তিকর নীরবতা নামলো ঘরে। হ্যাডোর কথাগুলো যেন ঘরের বাকি মানুষের মনের সঙ্গে বেসুরো। ডাক্তার পোরোয়েরর ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তার বক্তব্য কিছুটা শ্লেষ থাকলেও, রসের অভাব ছিলো না। সুসিও বেশী উৎসাহ দেখিয়েছে। হ্যাডো সকলের মুখই বন্ধ করে দিয়েছে। ডাক্তার বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালো। সুসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্গারেটের দিকেও ফিরলো।

দরজাটা আর্থারই খুলে দিলো তার জন্যে। ডাক্তার ঘরের মধ্যে তাকালো, মার্গারেটের কুকুরটাকে খুঁজছে সে—তোমার ছোট্ট

কুকুরটার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়নি।

কুকুরটা এতো নিঃশব্দ, যে সবাই তার অস্তিত্ব ভুলে গেছে।

—কপার, এদিকে আয়—মার্গারেট ডাকলো।

কুকুরটা আস্তে উঠে এলো, ভয়ার্ত চোখে মার্গারেটের পায়ের নীচে গুটিয়ে বসলো।

—তোর হয়েছে কি? মার্গারেট প্রশ্ন করলো।

—আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। হ্যাডো কর্কশ গলায় হেসে উঠলো।

—নন্সেন্স! ডক্তার ঝুঁকে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। তার থাবাটাও একটু ঝাঁকিয়ে দিলো। মার্গারেট কপারকে তুলে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলো,—এবার একটু ভদ্র হওতো! আঙুল তুলে কুকুরটার মুখের সামনে ধরলো।

ডাক্তার মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলো। আর্থার দরজা টেনে দিলো। হঠাৎ, যেন অশুভ কিছুর ভয় হয়েছে কুকুরটার, লাফিয়ে নেমে অলিভার হ্যাডোর হাতে দাঁত বসিয়ে দিলো সে। হ্যাডোর মুখ থেকে আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো। কুকুরটাকে ঝেড়ে ফেলে, সেটাকে প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিলো সে। কপার এক পাক গড়িয়ে গিয়ে জোরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, যন্ত্রণায়। একমুহূর্ত নিশ্চল পড়ে রইলো, যেন খুব আঘাত পেয়েছে। মার্গারেট চিৎকার করে উঠলো—ভয় আর ঘৃণা মিশ্রিত রাগ তার গলায়। আর্থারের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো; অসহায় জন্তুটার যন্ত্রণাকাতর মুখ, মার্গারেটের ভীতি-বিহ্বল চোখ আর হ্যাডোর প্রতি তার ঘৃণা যেন এক হয়ে গেলো।

—জানোয়ার কোথাকার! বলে উঠলো সে।

হ্যাডোর মুখে প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো সে। মাটিতে পড়ে গেলো হ্যাডো, তার বিরাট শরীর নিয়ে। আর্থার এগিয়ে তার কলার ধরে লাথি মেরে চললো উন্মত্তের মত। কুত্তা যেমন করে ইঁদুর ঝাঁকায় সেই ভাবে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ঝাঁকিয়ে আছড়ে ফেলে দিলো মেঝেয়। যে কোনো কারণেই হোক হ্যাডো কোনো বাধা দিলো না। অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে রইলো সে, সেইখানেই। আর্থার মার্গারেটের

দিকে ফিরলো, আহত কুকুরটা তার কোলে ধরে আছে। মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে চলেছে। কুকুরটার হাড়গোড় কিছু ভেঙেছে কিনা দেখলো আর্থার সন্তর্পণে। আগুনের পাশে বসলো ওরা। সুসি তার নার্ভ ঠিক রাখতে সিগারেট ধরালো একটা। তাদের পেছনে সেই মানুষটা মাটিতে পড়ে আছে। তার সম্পর্কে সে সচেতন, ভীষণভাবে। কি করা উচিত ভাবছে সে। কেন চলে যাচ্ছে না লোকটা সেটাই চিন্তা তার এখন।

তার হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেলো এবার. হ্যাডো উঠতে চেষ্টা করছে ধীরে—মেদ-হুল মমি যেন যেভাবে মাটি ছেড়ে ওঠে : দেয়ালে হেলান দিয়ে ওদের দিক তাকালো সে। অনেকক্ষণ, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো অলিভার হ্যাডো। ওর এই ভঙ্গিতে সুসি যেন আরও সন্ত্রস্ত—চেঁচিয়ে উঠতে পারে যে কোনো মুহূর্তে—ওর ওই অস্বাভাবিক চোখদুটো, এই মুহূর্তের দৃষ্টি যেন অকল্পনীয়—

ঘুরে তাকাবার লোভ সামলাতে পারলো না সুসি—হ্যাডোর চোখদুটো মার্গারেটের ওপর স্থির নিবদ্ধ, যেন নিজেতে নিজেই আবদ্ধ লোকটা। প্রচণ্ড উত্তেজনার স্বাক্ষর তার চোখমুখে, আরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে হ্যাডোকে। একটা অমানুষিক বিদ্বেষের মুখোস যেন তার মুখ, বিকৃত হয়ে গেছে চাহনি।

ক্রমে রূপান্তর ঘটলো তার। রক্তাভা মিলিয়ে গিয়ে বিকট পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলো। প্রতিহিংসামূলক ভ্রুকুটিও চলে গেলো, মুখচোখে ছড়িয়ে পড়লো এক ফ্যাকাসে হাসি, মুখটাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে হ্যাডোর এ' হাসি। এই হাসির অর্থ কি?

সুসি চেঁচাতে গিয়েও পারলো না—গলা দিয়ে বেরোলো না আওয়াজ ওর।

হাসি মিলিয়ে গেলো অলিভার হ্যাডোর ঠোঁট থেকেও। মার্গারেট আর আর্থারও যেন তার চোখের ভয়ে যা পড়েছে। তারাও নিশ্চল। কুকুরটার গোঙানীও থেমে গেছে। নিস্তব্ধতায় হৃৎস্পন্দনও বুঝি শোনা যাচ্ছে—

অসহনীয় একটা অবস্থা। হ্যাডো নড়ে উঠলো এবার।

ধীরপায়ে এগিয়ে এলো সে,—আমি যা করে ফেলেছি ক্ষমা চাইছি সবার কাছে। কুকুরটা এত জোরে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলো যে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ওটাকে লাথি মারার জন্যে দুঃখিত আমি। বারডন আমাকে মেরে ঠিক কাজই করেছে। এটা আমার পাওনা ছিলো।

অনুচ্চগলায় কথা বলছে হ্যাডো। পরিষ্কার কাটা আসছে তার কথাগুলো। সুসি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এ'ধরণের হীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বসবে হ্যাডো, সে কল্পনাও করেনি।

মার্গারেটের মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো হ্যাডো। সে মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। সে যখন কথা শুরু করলো, তার গলা প্রায় শোনাই যায় না। কেন সে নিজেই জানে না। হ্যাডোর ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটা আরও ঘৃণ্য মনে হচ্ছে তার কাছে,—আমার মনে হয়, যদি মনে কিছু না কর—তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো তোমার—মার্গারেট বললো।

হ্যাডো সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন করলো তাকে। বারডনের দিকে ফিরলো সে,—তোমাকে বলতে বাধা নেই। তুমি যা করেছো সে জন্যে আমার মনে এতটুকু বিদ্বেষ জন্মেনি। তোমার রাগের কারণ সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

আর্থার কোনো কথা বললো না। হ্যাডো এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো, আস্তে প্রত্যেকের মুখের ওপর চোখ রাখলো। সুসির মনে হলো তার চোখে যেন হাসির ছায়া দেখলো পলকের জন্যে। বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে হ্যাডোকে সে।

টুপিটা হাতে নিয়ে আর একবার ঝুঁকে, হ্যাডো বেরিয়ে গেলো।

হ্যাডো যে সত্যি অনুতপ্ত, সুসি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছে না। ওর বিনয় যেন তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। তার ঠোঁটে সেই হাসিটুকু ভুলতে পারছে না। সুসি, তীব্র ঘৃণার পরিবর্তে ব্যাখ্যা করে নিয়েছে সে হাসি। অশিষ্টার হ্যাডো তার প্রতিশোধ

চরিতার্থ করবে বলেই অনুমান, এবং তার গতিপ্রকৃতিও নিশ্চয়ই সরল হবে না। আর্থারকে তার সন্দেহের কথা জানাতে হেসে উঠলো সে—আমার কি মনে হয় ওর ভেতরে কিছু থাকলে ওভাবে লাথিগুলো হজম করতো?

হ্যাডেরর কাপুরুষতা আর্থারকে তার প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। সুসিও ভীত, কিন্তু তার মনে কৌতূকের সঞ্চার করেছে—কি করতে পারে লোকটা ভাবছো? আমার মাথায় ইট মারতে পারবে না। গুলি করে যদি, গর্দান কাটা যাবে ওর —আর ওরকম কোনো ঝুঁকি নেবে এমন বোকা নয় সে।

মার্গারেট একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত—এ' ঘটনায় হ্যাডোর হাত থেকে রেহাই অন্তত মিলেছে।

দিন দুয়েক পরে রাস্তায় দেখা হয়েছে তার সঙ্গে, এবং ফরাসী ভঙ্গিতে যেভাবে হ্যাডো তার টুপি তাকে অভিবাদন করে প্রত্যাভিবাদনের অপেক্ষা না করে চলে গেছে; তাতেই মার্গারেট আরও নিশ্চিত।

আর্থারের সঙ্গে তাদের বিয়ের তারিখ নিয়ে আলোচনা শুরু করলো মার্গারেট এরপর। প্যারিসের কাছ থেকে যেটুকু পাওনা তার যেন পাওয়া হয়ে গেছে মার্গারেটের, নতুন জীবনের হাতছানিতে ভুলেছে সে।

আর্থারের প্রতি তার ভালবাসা যেন গাঢ়তর হয়েছে। আর্থার তাকে যে সুখী করবে সেই চিন্তায় তার মন ভরে গেছে।

দু' দিন পরেই টেলিগ্রামটা পেলো সুসি।

'গারে দু নর্দে দেখা করো, দুটো চল্লিশে'।

ন্যানসি ক্লার্ক॥

ন্যানসি তার পুরনো বান্ধবী। হয়তো প্যারিসে সেদিন ফিরেছে। চিমনিপটের ওপরে তার সই করা একটি ছবিও আছে সুসির ঘরে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো আজ সে ছবিটার দিকে।

—কি একঘেঁয়েই লাগছিলো! যেতে হবে আজ।

নদীর অন্যপারে ওরা চা খাবে ভাবলো সুসি। স্টেশানের রাস্তাটা এত দীর্ঘ যে সুসির পক্ষে মাঝখানে ফেরা সম্ভব নয় ভেবে ওরা যে বাড়িতে আমন্ত্রিত সেখানেই মিলবে ন্যানসির সঙ্গে, ঠিক করলো সে। ছুটোর একটু আগেই সুসি বেরিয়ে পড়লো। মার্গারেটের একটা ক্লাস ছিলো। সেও মিনিট দুতিন পরে বেরোলো। উঠোনটা পেরোতেই চমকে উঠলো সে, নার্ভাস হয়ে পড়েছে—হ্যাডো ধীর পায়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো তার! মার্গারেটকে বোধহয় দেখেনি সে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো হ্যাডো, বুকে হাত রেখে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলো...

হাতের কাছে একমাত্র পরিচারিকাটি দাঁড়িয়ে, সেই ছুটে গেলো—মুখে অস্ফুট শব্দ করে। হাঁটু মুড়ে বসতে মার্গারেটকে দেখতে পেলো সে,

—মাদামোয়াজেল, ভেজে ভিতে।

মার্গারেটকে যেতে হলো। তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে চলেছে। কাছে পৌঁছে অলিভার হ্যাডোর চোখে তাকালো সে—দেহে প্রাণ নেই মনে হচ্ছে···লোকটাকে যে ঘৃণা করে সে ভুলে গেলো মার্গারেট। হাঁটু গেড়ে বসে গেলো সেও—কলারটা আলগা করে দিলো। আস্তে চোখ মেলে তাকালো হ্যাডো—অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ছাপ তার চোখমুখে।

—আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো, নয়তো রাস্তায় মরে পড়ে থাকবো—

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো মার্গারেটের। পরিচারিকার খুপরিতে নিয়ে তোলা যায়না ওকে, বাতাসহীন—দুর্গন্ধময় কুঠুরিটা। তবে তার সাহায্যে হ্যাডোকে দাঁড় করিয়ে দিলো মার্গারেট। স্টুডিওতে নিয়ে এলো তাকে ওরা ধরাধরি করে। একটা চেয়ারে নিজেকে ছেড়ে দিলো হ্যাডো, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত তার।

—একটু জল নিয়ে আসবো কি? মার্গারেট জিজ্ঞেস করলো।

—আমার পকেটে বড়ি আছে, বের করে দিতে পারো?

সাদা বড়ি বের করে আনলো মার্গারেট তার পকেট থেকে।

—তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি দুঃখিত। হ্যাডো কোনো রকমে

বলতে পারলো,—বুকের ব্যারাম আছে আমার, অনেক সময়ে মৃত্যুর কাছাকাছি হয়ে যাই—

—তোমাকে সাহায্য করতে পেরে ভাল লাগছে আমার। মার্গারেট উত্তর জানালো।

নিশ্বাস অনেক সহজ হয়ে এসেছে। হ্যাডোকে কিছুক্ষণের জন্যে একা থাকতে দিলো মার্গারেট, তার দম ফিরে পাবার জন্যে। একটা বই খুলে পড়তে বসলো সে। হ্যাডো চেয়ারে বসে সঙ্গে সঙ্গেই বললো,—এভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্যে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখছো।

গলার জোর ফিরে এসেছে তার। মার্গারেটের সমবেদনাও যেন কমে এসেছে,—তোমার জন্যে এর কম কিছু করা যেতো না। রাস্তায় একটা কুকুরও যদি অসুস্থ হয়ে পড়তো তাকেও নিয়ে আসতাম ঘরে। বললো মার্গারেট।

—আমি চলে যাই এটাই তোমার অভিপ্রায় দেখছি—উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালো হ্যাডো, কিন্তু পরমুহূর্তেই পদস্খলন হলো তার। একটা কাতরানি উঠলো তার ঠোঁট থেকে, হাঁটু ভেঙ্গে পড়লো সে। আবার মার্গারেট দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো তার সাহায্যে। নিজেকে ধিক্কার দিলো মনে মনে সে, রূঢ় কথাগুলো বলার জন্যে লোকটা অল্পের জন্যে মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে, আর সে কিনা নিষ্ঠুরভাবে… না, না—তুমি যতক্ষণ খুসী থাকো। আমি—আমি দুঃখিত। তোমাকে আঘাত দেওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিলো না আমার।

অনেক কষ্টে চেয়ার পর্যন্ত নিজেকে টেনে নিয়ে গেলো হ্যাডো। মার্গারেট অসহায়ভঙ্গিতে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, বিবেকের দংশনে জর্জরিত। একগ্লাস জল ঢেলে দিতে, হাতের ইসারায় সরিয়ে দিলো তা হ্যাডো।

—তোমার জন্যে কি কিছুই করতে পারি না আমি? মার্গারেট বেদনার গলায় শুধালো।

—কিছুই না, শুধু আমাকে এই চেয়ারে বসতে দেওয়া ছাড়া। দমকে

এমকে কথাগুলো ছেড়ে দিলো হ্যাডো।
—যতক্ষণ খুসী থাকো তুমি।
হ্যাডো নিরুত্তর। মার্গারেট বই খুলে বসলো, পড়ার ভান করে। একটু পরেই হ্যাডো কথা বললো, যেন অনেক দূর থেকে আসছে কথাগুলো,—সেদিনের ঘটনার জন্যে কি আমাকে কখনোই ক্ষমা করবে না?
মার্গারেট তার দিকে না ফিরেই বললো,—তাতে কি এসে যায় কিছু তোমার?
—তোমার শরীরে দয়ামায়া নেই। আমি তো বললামই যে হঠাৎ উত্তেজনার বশে করে ফেলেছি একটা কাজ, আর তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। ওই অবস্থায় আমার পক্ষে ক্রটি স্বীকারের ব্যাপারটাও যথেষ্ট কঠিন হয়েছিলো।
—ও প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। ওই ভয়ানক দৃশ্য ভাবতেও পারছি না আমি।
—যদি জানতে তুমি, আমি কত নিঃসঙ্গ, কত অসুখী—কিছুটা দয়া অন্তত দেখাতে। হ্যাডোর গলায় আশ্চর্য পরিবর্তন। মার্গারেট তার ঐকান্তিকতায় সন্দিহান নয় আর।
—আমাকে ভণ্ড মনে করার কারণ থাকতে পারে, কারণ তোমাদের অজানা ব্যাপার নিয়েই আমার কাজ। বাহবাও দেবে না নিশ্চয় সে জন্যে।
মার্গারেট কোনো কথা বললো না। বেশ কিছু সময় নীরব কাটলো। হ্যাডোর গলা এখন অন্যরকম শোনাচ্ছে, অনেক মোহময় যেন।
—তোমার মনে শুধু ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যই আছে আমার জন্যে, জানি। আমার দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে রাস্তায় মরতে দিতেও চেয়েছিলে। আর, অনিচ্ছায় আমার ওপর তুমি সদয় না হলে আমি মরে যেতাম।
—তাতে তোমার প্রতি আমার মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে

না। মৃদুস্বরে জানালো মার্গারেট।

হ্যাডোর নরম গলায় উচ্চারিত কথাগুলো তার হৃদয়ে এক রহস্যময় আলোড়ন সৃষ্টি করছে কেন বুঝতে পারছে না সে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো মার্গারেটের।

—হচ্ছে বইকি। দুনিয়ায় ওইটুকুই তো ভরসা আমার—তোমার অবজ্ঞা নিয়ে বাঁচার কথা ভাবলেই আমার অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। তুমি পবিত্র, সুন্দর। আমার অক্ষমতাকে অসহনীয় মনে হয় আমার নিজের কাছে। আমি যেন অশুচি তোমার কাছে।

মার্গারেট তার চেয়ারটাকে সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা তাকালো হ্যাডোর চোখে। তার চোখমুখের আশ্চর্য পরিবর্তনে সে বিস্মিত। লোকটার মাংসল মুখটা আর আকর্ষণহীন মনে হচ্ছে না ওর কাছে। চোখে এক নতুন ভাবের প্রতিফলন হ্যাডোর, অনেক কমনীয় সে-দুটো এখন, জলে ভরে গেছে। বাঁধভাঙা যন্ত্রণায় তার ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত। মার্গারেট এমন অসুখের স্বাক্ষর পড়েনি কোনো মানুষের মুখে—তীব্র অনুশোচনাবোধ হলো তার।

—তোমার ওপর নির্দয় হতে চাই না আমি—

—আমি যাই। তোমার ঋণ এইভাবেই শুধু শোধ করতে পারি আমি।

কথাগুলোতে এত তিক্ততা, এত হীনতা ছিলো, যে মার্গারেটের গালে রঙ ধরলো,—তোমাকে থাকতে বলছি। তবে, অন্য কথা বলো তুমি—

হ্যাডো মুহূর্তের জন্যে চুপ করলো। মার্গারেটকে যেন আর দেখছে না সে, সে দেখছে হ্যাডোকে, চিন্তার ছায়া তার চোখে।

অলিভার হ্যাডোর দৃষ্টি এখন দেয়ালে টাঙানো লা গিওকোণ্ডার ছবির ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলো সে,—ওই পরিপূর্ণ চিত্রের প্রশস্তিতে ওয়াল্টার পেটার যে মধুময় কথাগুলো আবৃত্তি করেছিলো, তারই পুনরাবৃত্তি করে চললো সে,—'পৃথিবীর শেষ নেমে আসবে ওর মাথার ওপরে—চোখের পাতায় তাই নেমেছে

ক্লান্তি তার; দেহের মজ্জা থেকে এই সৌন্দর্যের বিস্তার বিন্দুতে বিন্দুতে জমা বিচিত্র চিন্তার ফসল—অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন আর তীব্র কামনারও; ওই শ্বেতবর্ণা গ্রীক দেবীদের একজন না প্রাচীনাদের কারুর পাশে মুহূর্তের জন্যে রাখো না. তার সৌন্দর্যে ম্লান হয়ে যাবে ওরা...যে দেহে সমস্ত সুখ নিয়ে সত্তা স্থান করে নিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা আর অভিজ্ঞতা নকশাঙ্কিত, বাহ্যিক প্রকাশকে আকর্ষণের করে তোলার হাতিয়ার আছে যাতে—গ্রীস সব সজীবতা, রোমের লালসা, মধ্যযুগের মিস্টিসিজম, তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আর কাল্পনিক ভালবাসা, প্যাগান দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন আর বর্গিয়াস-এর পাপ'...

হ্যাডোর কথাগুলো তীক্ষ্ণ কিন্তু কেমন মিষ্টি, যেন গানের অংশ। মার্গারেট এমনটা শোনেনি আর যেন। কেমন নেশা লাগছে তার। হ্যাডো আরও বলুক—মনে এই ইচ্ছে থাকলেও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ এলো না তার। হ্যাডো যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেছে, বলে চললো সে, অনেক দূর থেকে আসছে তা—এক অগ্রাহ্যপূর্ব সৌরভে সুরভিত...

...যে পাথরের মধ্যে তার আসন তার চেয়েও বেশী তার বয়স, বহুমরণে মৃতা সে; রক্তশোষক বাদুড়—কবরের রহস্য তার কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার। গভীর সমুদ্রে চলেছে তার সন্তরণ। প্রাচ্যদেশীয় ব্যবসার মানুষগুলোর সঙ্গে অশুভ সংযোগ এবং ট্রয়-এর হেলেন-এর মাতা লেডা, বা মেরীমাতা সেন্ট অ্যানের মত এসবই শুধু বাঁশী আর গাঁথার মধুর আওয়াজ। মুখাবয়বের পরিবর্তনশীল মাধুর্যের সঙ্গে তার বাস, চোখের পাতা আর হাতের আঙুলে রঙীন'...

লেওনার্দো দ্য ভিনসির কথা বলতে শুরু করলো এবার অলিভার হ্যাডো। যেন কথাগুলো তার মনে গাঁথা হয়ে আছে। সেন্ট জন আর ব্যাকাসের বৈসাদৃশ্যের মধ্যে মিল খুঁজেছে। অতৃপ্ত সুখ আর অমানবীয় কামনার উর্ধ্ব ভাস্কর যা খুঁজেছে। সে চিত্রে আনন্দ

পেয়েছে সে। অলিভার হ্যাডোর কথায় ভাস্কর্যের যেন এক নতুন পৃথিবী উদ্ঘাটিত মার্গারেটের চোখে। লুভরের লং গ্যালারীতে মূর্তি-বিষয়ক একটা চিত্রও আছে ব্রনজিনোর রেখায় কল্পিত। মুখচোখ অভিজ্ঞ—প্রাচ্যদেশীয়ের বাদামী দৃষ্টি তার চাহনিতে। রক্তলাল ঠোঁটে এক কামনার আমন্ত্রণ। এক অশুভমুখ—নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি। এ মুখ তোমাকে বারংবার তাড়া করে ফিরবে…'

অলিভার হ্যাডো যেন অস্বাভাবিক সবকিছুর শিকার, বিকলাঙ্গ, ঘৃণনীয় সব কিছুর। রিবেরা-র পৈশাচিক বাননদের মিছিল তুলে ধরেছে মার্গারেটের সামনে, তাদের ধূর্ত হাসি,—অপ্রকৃতিস্থ চোখের আলো, বিদ্বেষজর্জরিত। ভ্যালডেস লিয়াল-এর চিত্র বর্ণনা করেছে, সেভিল-এর কোন এক স্থানের বর্ণনা—বেদীমূলে এক সন্ন্যাসীর প্রতীক……

একের পর এক বর্ণনা দিয়ে চলেছে হ্যাডো। শ্রোতা মার্গারেট,—রুদ্ধশ্বাসে শুনছে সেই কাহিনী। এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের ভূমির পরিকল্পনা সামনে মেলে যে উত্তেজনার শিকার হয় আবিষ্কারক, সেই উত্তেজনা তার চোখমুখে ছড়িয়ে। হ্যাডোর দিকে তার চোখ মেলে দিয়েছে—এক অস্বাভাবিক অবসাদে ভরে গেলো মার্গারেটের মন।

হ্যাডো থামতে মার্গারেট নিস্তব্ধ বসে রইলো, অনড়। সারা মনে মোহ ছড়িয়ে তার, শক্তিহানা এক নারী সে…

—আমার জন্যে তুমি অনেক করেছো—তার বিনিময়ে আমিও কিছু করতে চাই।

উঠে পিয়ানোটার দিকে পা বাড়ালো হ্যাডো,—এই চেয়ারটায় বসো।

ওর কথা অমান্য করার কথা যেন মার্গারেট স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। পিয়ানো বাজাতে শুরু করলো হ্যাডো। অভিজ্ঞ হাতে বাজিয়ে চলেছে। মাংসল আঙুলগুলোতে এমন কমনীয় স্পর্শের ছোঁয়া যেন অকল্পনীয়। এক বিচিত্র স্নিগ্ধতায় যেন সুরের মায়াজাল বিস্তার করে চলেছে সে। অস্বস্তিকর, অস্পষ্ট আবেগে পূর্ণ সুর। ভীতিজনক।

এ বাজনা কখনো শোনেনি মার্গারেট, কিন্তু সে সুর আনে এক মোহময় মূর্ছনা, তার অস্তিত্বের প্রভাবে কি বিদ্যুৎ বইছে। অপূর্ব স্মরণশক্তি লোকটার—মার্গারেটের বুকে যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় বইছে তা যেন হ্যাডো জেনেছে…।

হ্যাডো বাজিয়ে চললো, এ বাজনা সম্পূর্ণ অজানা মার্গারেটের,—অশ্রুত—বর্বর…অপার্থিব—নির্জন রাতের ভয়াবহতার কথা মনে করিয়ে …রাস্তাহীন পরিবেশে বোবা তালগাছের সারি, অন্যদিকে আঁকা-বাঁকা ছোটাছোট গলি—চাঁদের আলোয় ছায়াছায়া সাদা বাড়ি, নিঃশব্দ। পীতাভ আলো ছড়িয়ে আছে জানলার ফাঁকে ফাঁকে… বিচিত্র যন্ত্রের বাজনা। প্রাচ্য দেশীয় সুগন্ধির রেশ ছড়িয়ে…

অমানবীয় মানুষের মিছিল চলেছে, তবু অস্তিত্ববিহীন নয়—রক্ত শোষকের সঙ্গে যার তুলনা চলে—মোনালিসা আর সেন্ট জন; ব্যাকাস আর মেরীমাতা—প্রহেলিকার মত চলেছে একের পর এক। হেরোডিয়াস-এর মাথা কিন্তু অন্য এক ভঙ্গিতে মৃত—ঊর্ধ্ববাহু কোনো দুর্বোধ্য আত্মিক ভাবের পরিবেশনে ব্যাকুল। সাদা ফ্যাকাসে মুখে চোখদুটোয় অনিদ্রার স্বাক্ষর। উজ্জ্বল রঙগুলো যেন আগুন ছড়াচ্ছে পোশাক থেকে—বর্ণহীন সে পোশাক। রাজ্যের দুঃখ ছড়িয়ে ঠোঁটে, মৃত্যুশীতল কণ্ঠস্বরে সে কবির কথা আবৃত্তি করে চললো…

…আমি তোমার শরীরের প্রেমে আসক্ত, আইকোনাস! মাঠের লিলি ফুলের মত তোমার শ্বেতশুভ্র শরীর, যে মাঠে কর্ষণ হয়নি কখনো। জুডার পাহাড় শ্রেণীর গায়ে যে বরফ জমে তারই শুভ্রতা তোমার অঙ্গে, উপত্যকায় ঝরে পড়া যে বরফ… আরবের সাম্রাজ্ঞীর গোলাপও তোমার শরীরের চেয়ে শুভ্র নয়—নয় সে চাঁদের আলো—যে আলোর হৃদয় শয্যা পাতে সাগরের বুকে—দুনিয়ার সব কিছুই হার মানে শুভ্রতায় তোমার কাছে—তোমার শরীর ছুঁলে শান্তি দিও আমাকে…

অলিভার হ্যাডো তার বাজনা শেষ করলো। দুজনেই নিশ্চল

ওরা। শেষে, মার্গারেট যেন নিজেকে ফিরে পেতে চেষ্টা করলো,—তুমি যে সত্যিই যাদুকর, এটা মনে রাখতে চেষ্টা করবো।

হ্যাডো তার আশ্চর্য চোখদুটো তুলে ধরলো,—তোমাকে অনেক বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, যদি দেখতে চাও—

—অপরসায়নের দর্শনে আমাকে বিশ্বাসী করে তুলতে পারবে তুমি বলে মনে হয় না। মার্গারেট হেসে উঠলো।

—তবু, পারস্যের পুরোহিতেরা এর চর্চা করেছে, ভারতের ঐতিহ্য গৌরবান্বিত এর আশ্চর্য প্রভাবে। অরফিউসের বীণার ঝঙ্কারে গ্রীস সভ্যতার আলো দেখেছে···

মার্গারেটের সামনে দাঁড়ালো হ্যাডো, তার বিরাট শরীর নিয়ে। চোখে তার সেই অসাধারণ দৃষ্টি। তার শক্তির পরিচয় গোপন রাখতেই যেন কথা বলছে হ্যাডো, শুধু—পিথাগোরাসের গণনায় বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতি গুহ্য ছিলো এই বিদ্যায়—তার দৈববাণীতে সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্য...বজ্রনির্ঘোষে স্বেচ্ছাচারী একনায়কের সিংহাসন টলেছে—কৌতূহলের খোরাক জুগিয়েছে কিছু মানুষের, অন্যদের মন আচ্ছন্ন করেছে ত্রাসে।

হ্যাডোর গলা নেমে গেছে খাদে, আর—তা এত মোহময়, যে মার্গারেটের মাথা ঘুরে উঠছে। সুবাসে ভরপুর গলা, কিন্তু বিহ্বলকারী···

—এ' বিদ্যায় কিছুই অসম্ভব নয়; প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে যাদু—তারার ভাষা তার আয়ত্তে; গ্রহের গতিপথে তাদের পরিচালনা করে। চাঁদ আকাশ থেকে নেমে আসে তার নির্দেশে। মৃতেরা কবর থেকে উঠে আসে, নিশীথ বাতাসের সঙ্গে একাকার হয়ে ওদের কানে কানে কথা বলে। স্বর্গ ও নরক একাকার হয়েছে। ভালবাসার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ঘৃণা। যাদুর চাবিকাঠি যার হাতে, জীবন-মৃত্যু তার হাতের মুঠোয়।

মার্গারেট যেন তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। কেমন অবসাদ-

গ্রস্তা সে, হ্যাডোর অসুখী দৃষ্টিতে। উঠে নিজেকে মুক্ত করার সাহসটুকুও বিলুপ্ত তার। এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে যেন সে।

—তোমার যদি শক্তি থাকে, তা দেখাও। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো মার্গারেট। কথা বলছে নিজের অজ্ঞাতেই যেন।

হ্যাডো যে মানসিক চাপের সৃষ্টি করেছিলো মার্গারেটের ওপর, হঠাৎই যেন তার বাঁধা আলগা করে দিলো সে। কোনো বিশেষ কাজে সর্বশক্তি নিয়োজনের পরে তার শেষে যে অবসন্নতা নামে মানুষের মনে তাই দেখা দিলো হ্যাডোর চোখে। মার্গারেট নিস্তব্ধ। ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে, এ' বিষয়ে সে নিশ্চিত। শৃঙ্খলিত পাখীর মত বুকটা তোলপাড় হচ্ছে তার; অসহায়ভাবে চলেছে ডানার ঝাপটানি—এখন ফেরা যায়না আর, বড় দেরী হয়ে গেছে। যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা যেন কোনো লৌকিক নির্দেশ—ফিরিয়ে নেওয়া যায় না তা···

টেবিলের ওপর যে ছোট্ট পালিশ করা পেতলের বাটিটা বসানো স্টোভের ওপর, সেদিকে উঠে গেলো অলিভার হ্যাডো। একটা খুদে রুপোর কৌটো বের করে নিলো পকেট থেকে। ঠোঁটে মৃদু হাসি তার, কৌটোটাতে একটা টোকা দিলো—নস্যির কৌটোয় যেমন করে আঙুল ছোঁয়ায় লোকে, সেইভাবে। কৌটোর মুখটা খুলে গেলো, নীল রঙের পাউডার এক টিপ তুলে নিলো হ্যাডো সেটা থেকে—বাটির মধ্যে ছেড়ে দিলো সেটুকু সে···আগুন জ্বলে উঠলো—মার্গারেটের গলা থেক আর্তস্বর বেরিয়ে এলো...হ্যাডো দ্রুত ফিরলো তার দিকে—সঙ্কেতে স্থির থাকতে বললো। মার্গারেট বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে, জলে আগুন! উজ্জ্বলভাবে জ্বলে চলেছে, যেন সাধারণ আঁচ...সগর্জনে—

হঠাৎ নিভে গেলো আগুন। মার্গারেট ঝুঁকে বসলো... বাটি শূন্য!

খড়ের মত শুষে নিয়েছে জলটুকু। এক ফোঁটাও নেই অবশিষ্ট।

আস্তে আস্তে কপালটা বুলিয়ে নিলো মার্গারেট, অন্যমনে, কিন্তু জল তো জ্বলে না···নিজের সঙ্গে যেন কথা বলছে সে।

হ্যাডো যেন তার মনের কথা পড়েছে, বিচিত্র হাসি স্পষ্ট-তর হলো তার,—এই নীলবর্ণ পদার্থটি দিয়ে যেকোনো বিপদ-জনক কিছুর সৃষ্টি হতে পারে—এমন আগুন জ্বলবে যে গোটা প্যারিসের সবটুকু জল পুড়ে যাবে, বুঝলে, কেউ স্বপ্নে ভাবতে পেরেছে জল ভুষীর মত জ্বলবে?

হ্যাডো থামলো, মার্গারেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেন উদাসীন সে। ক্ষুদে কৌটাটার দিকে তাকিয়ে আছে, চিন্তার রেখা তার কপালে,—কিন্তু এই পদার্থটির মাত্র সামান্যই প্রস্তুত করা সম্ভব, এবং তাও প্রচণ্ড শ্রমের বিনিময়ে। তিন দিনের বেশী বাতাসে রাখা সম্ভব নয়। বাষ্পিত হয়ে যাবে। অনেক সময়ে ভেবেছি হবে না—রেডি-য়ামের মত, তা নিয়েও ভেবেছি। প্রচণ্ড শক্তিধর হতে পারবো আমি—অন্তহীন হবে সে শক্তি। পৃথিবীর শেষ বিন্দু জল থাকা পর্যন্ত জ্বলবে। সারা দুনিয়া গ্রাস করার মত···কিন্তু বিশেষ একজনের হাতে এটা থাকা বিপদের···কারণ একবার জলের স্পর্শে এলে, যে বিপদ নেমে আসবে—তা আর নাকচ করা যাবে না···

লম্বা নিঃশ্বাস নিলো হ্যাডো, চোখ দুটো জ্বলছে তার—দানবীয় উত্তাপে—এক এক সময় সেই বিভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সাধ জেগেছে আমার—এক বর্বর কামনা—সাগরে আর নদীতে নেমে চলেছে আগুনের হলকা—বেড়ে ওঠা সমস্ত কিছুর আর্দ্রতা শুষে নিয়ে ···বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে···সারা মানবতাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে জলের কিনারায়; আর—জল তো তখন অগ্নিকুণ্ড···

মার্গারেট কুঁকড়ে গেলো, কিন্তু হ্যাডোকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না তার। তাকে বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে।

হ্যাডো সেই সর্বনাশা বস্তুটির আরেক টিপ তুলে নিয়ে বাটিতে ছেড়ে দিলো। পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে আর একটা বস্তু বের করলো ·· টুকরো করা কিছু, শুকনো পাতার মত···প্রায় গুড়ো হয়ে যাওয়া।

তাতে এখনও কিছুটা বাষ্পের ভাগ বর্তমান।

আবার জ্বলে উঠলো আগুন—ঘন ধোঁয়ায় ভরে গেলো ঘর।

একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ উঠলো, কিসের তা মার্গারেট বুঝতে পারছে না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কাঁপতে শুরু করলো সে। অলিভার হ্যাডোকে অনুনয় জানাতে চাইলো সেটা বন্ধ করার জন্যে, পারলো না।

হ্যাডো বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো,—দ্যাখো! আদেশের ভঙ্গিতে বলে উঠলো সে।

মার্গারেট ঝুঁকে পড়ছে—বিচিত্র কঠিন, যেন ইস্পাতে গড়া। কিন্তু স্থির নয়—অস্বাভাবিকভাবে হেলেছে, অপার্থিব আগুনের সৃষ্ট সরীসৃপ যেন নিজের দুর্গন্ধে জর্জরিত...

—ভালো করে নিশ্বাস নাও!

মার্গারেট নিলো। শরীরটা কেঁপে উঠলো তার। একটা কালো ছায়া যেন তার চোখ দুটোকে আচ্ছন্ন করে দিলো। চেঁচিয়ে উঠতে গেলো সে, শব্দ বেরোলো না তার কণ্ঠ থেকে। মাথা ঘুরে উঠলো। তার মনে হলো হ্যাডো তাকে ইশারায় মুখ ঢাকতে বলছে। দম নেবার চেষ্টা করছে মার্গারেট, পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠছে। যেন প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে সে। মার্গারেট শরীরটাকে একটু নাড়াতে হ্যাডো তাকে ফিরে তাকাতে নিষেধ করলো...

আতঙ্কে ভরে গেলো মার্গারেটের মন, কোনদিকে চলেছে সে জানে. তবু চলেছে·· হ্যাডোর সঙ্গে···দ্রুত, আরও দ্রুত···ক্রমে গতি স্তব্ধ হলো। হ্যাডো তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে,—ভয় পাবার কিছু নেই। চোখ খুলে দাঁড়িয়ে পড়।

রাত নেমেছে। কিন্তু এ' যেন সে রাত নয়, মানুষের মনকে আরামের আমেজ এনে দেয় যে রাত; এ' রাত রহস্যজনক, শরীরের প্রতিটি শিরাউপশিরাকে নাড়া দেয়—পাণ্ডুর এক রাত, আশপাশের সব কিছুকে বিকৃত করে দেয় যে আঁধার। আকাশে চাঁদ নেই, শুধু

ক্ষুদে তারকার বিস্তার...ইতঃস্তত রাতের আগুন চারিদিকে ··অশুভ আত্মার প্রতীক...

এক বিরাট উন্মুক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে ওরা—পাতাহীন গাছ আর বিরাটকায় পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে...এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের শেষের অবস্থা যেন। সারা প্রকৃতি যেন নির্ঘাতীত—বিধ্বস্ত...অতিকায় পাখী উড়ে চলেছে দিকবিদিকে, বিচিত্র ফিসফিস আওয়াজে অন্তরীক্ষ ভরিয়ে।

অলিভার হ্যাডো মার্গারেটের হাত ধরে একটা আড়াআড়ি পথের কাছে নিয়ে চললো, কিন্তু পাথরের মাঝ দিয়ে চলেছে মনে হলো না মার্গারেটের। শিঙাধ্বনি কানে এলো তার। চারদিক থেকেই যেন বেজে চলেছে। এক অশান্ত জোট—বিরাট এলাকা ভরে গেছে ছায়া ছায়া মূর্তিতে...সাগর উত্তাল, একে অন্যের ওপরে পড়ছে...ইতিহাস যেন তার চোখের ওপর...একদা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মৃতের মিছিল...নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী আছে তাতে···উগ্র প্রসাধন গনিকাও। রোমক সম্রাট থেকে প্রাচ্যের সুলতান কেউ বাদ নেই। পূর্বাকালের ভয়ঙ্করা নারীরা পাশ দিয়ে চলেছে, এসেছে মোনালিলো, হেরোডিয়াস—কন্যার অস্পষ্ট মুখচ্ছবিও আছে। জেজেবেল তাকিয়েছে তার দিকে আঁকা ভ্রূতলা থেকে, ক্লিওপেট্রার লাম্পট্যভরা ফ্যাকাসে মুখটাও ভেসে উঠেছে। মেসালিনার কামজ ঠোঁট আর চোখও পড়েছে চোখে তার...লালসার ছাপ ছড়ানো ফাউস্টাইনের চোখে...চোখে পড়েছে প্রধানদের, পরণে উগ্রঅস্ত্র তাদের—ধর্মে আচরিত যোদ্ধা, পরচুলার আবরণে সুখী মানুষ, প্রসাধনে মোড়া নারী। আর—তারপর, হঠাৎই—বাত্যাতাড়িত চুলের মত মিলিয়ে গেলো...বালুবেলার মত—সরু সরু মুখগুলোতে পার্থিব যন্ত্রণার স্বাক্ষরও রোগের শিকার—গহ্বরময় সে মুখ। নানা বেশে, নানা ছাঁদে। দাঙ্গার শিকার জনতার মত চলেছে গলি বেয়ে···সারা দুনিয়া যেন হতবুদ্ধি···

আবার শূন্যতায় ভরে গেলো সমস্ত কিছু···এক বিরাট গাছের

ধ্বংসাবশেষের ওপর নিবদ্ধ মার্গারেটের দৃষ্টি এখন—নিঃসঙ্গ, মৃত হয়েও মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে—বজ্রপাতে ছিন্নভিন্ন, কিন্তু শতাব্দীর বাতাসও পারেনি তাকে তার জায়গা থেকে নড়াতে···ক্ষতবিক্ষত ডালগুলো, পাতাশূন্য—দাঁড়িয়ে টাইটানের বাহুর মত ছড়িয়ে··· অসহ্যযন্ত্রণায় কাঁপছে—

মার্গারেটের মুখ আতঙ্কে ছেয়ে গেলো—কারণ গাছটার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিলো—জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে; শুকনো ছাল যেন জান্তব মাংস—আঁকাবাঁকা ডালগুলো মানুষের বাহুতে পরিণত··একটা দানবীয়, ছাগলের পা জাতীয় কিছু—দুঃস্বপ্নের বস্তু···শিং আর দড়িও ভেসে উঠেছে চোখে, খুরওলা বিরাট রোমশ পা···মানুষের অপহরণকারী হাত যেন···সারা মুখে নিষ্ঠুরতা, লালসার চিহ্ন—তবু স্বর্গীয়। বাঁশী বাজাচ্ছে, লম্পটের চোখে এক অদ্ভুত কোমলতা—তাকিয়ে মার্গারেটের দিকে। মার্গারেটের চোখের ওপরই ক্রমে রূপান্তর ঘটলো—দিনের প্রারম্ভের কুয়াশার মত আস্তে দানবীয় মূর্তির পরিবর্তন হয়ে চললো···এক সুঠাম যুবাপুরুষ শক্তিমান কিন্তু উদাত্ত। একটা বিরাট পাথরে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সে। মাইকেল এঞ্জেলোর অ্যাডামকে ম্লান করে দিয়েছে তার সৌন্দর্য, বিষণ্ণ, কিন্তু মর্যাদাময়—দিনের নির্বাসিত সন্তানের মত মার্গারেট তার চোখে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না, কারণ তার অনন্ত যন্ত্রণার ভাগীদার হবার মত অবস্থা নেই তার। অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে এসেছে কাছে...কিন্তু সেই বিরাট মূর্তি যেন মেঘে বিলীন হঠাৎ।

আরও একবার মার্গারেট যেন সেই দ্রুত ধাবমান জনতার মিছিল দেখছে···

চলেছে মিছিল, কিংবদন্তীর দৈত্যদের আঁধারে ভেসে উঠেছে বিরাটকায় ঘৃণার পাত্রেরা। গুবরে পোকার ভীড়; ডানামেলা পাখী আরও কত না-দেখা জীব। কর্কশ চিৎকার কানে এসেছে মার্গারেটের, হাসির ফোয়ারা—মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তি...জীর্ণ

বেশ রমণীর মিছিল, কামনার দৃষ্টি নিয়ে—হাতে মদের পাত্র তাদের, ••
সে মদ ছড়িয়ে পড়ে রক্তরেখার রূপ নিয়েছে•••মার্গারেটের শিরায়
যেন আগুনের স্পর্শ...শরীর ছেড়ে যেন আত্মা বেরিয়ে পড়েছে, নতুন
এক সত্ত্বা তার জায়গা নিয়েছে। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে তার—
সব কিছু অশালীন...ভয়ে কুঁকড়ে গেছে মার্গারেট। অলিভার
হ্যাডোর ঠোঁটে কিন্তু বিদ্রূপের ছোঁয়া। অবর্ণনীয় দৃশ্যপট...হাত
দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে মার্গারেট•••

অলিভার হ্যাডো তার হাত ধরলো—ভয় পেয়ো না।

স্বাভাবিক তার কণ্ঠস্বর। চমকে উঠলো মার্গারেট, স্টুডিওতেই
বসে সে। আতঙ্কগ্রস্ত চোখে চারদিকে তাকালো। যেখানের যা
সবই আছে। শরতের প্রাক-ঋতুরাত নেমেছে। ঘরের একমাত্র
আলো আগুনটা থেকে আসছে।

হ্যাডো যা পুড়িয়েছে একটু আগে—তার অস্পষ্ট, কটু গন্ধ এখনো
বাতাসে•••

—মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেবো? হ্যাডো প্রশ্ন রাখলো। দেশলাই
মেরে পিয়ানোর ওপরের বাতিগুলো জ্বেলে দিলো হ্যাডো। বিচিত্র
আলো এলো সেগুলো থেকে। মার্গারেট এতক্ষণ যা দেখেছে সবই
চোখের ওপর ভেসে উঠলো। মনে পড়লো। হ্যাডো তার পাশেই
ছিলো। লজ্জানত হলো সে, অজস্র লজ্জায় ভেঙে পড়লো মার্গারেট।
গালের রক্তাভা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে গণ্ড। হাতদুটোর মধ্যে তার
মুখ লুকোলো, অঝোরে কাঁদলো মার্গারেট,—চলে যাও, দোহাই
তোমার। যাও—

মুহূর্তের জন্তে তার চোখে চোখ রাখলো অলিভার হ্যাডো,
ঠোঁটে হাসি ফিরে এলো তার; আর্থারের সঙ্গে তার সংঘর্ষের পর
যে হাসি চোখে পড়েছিলো সুসির।

—আমার কথা মনে পড়লে রুয়ে দে ভাউগিরাউয়েতে পাবে
আমাকে, নম্বরটা ভুলো না। বাঁদিকের ছু নম্বর দরজা, চারতলায়।

মার্গারেট এবারও নিরুত্তর। লজ্জায় মরে আছে সে।

—ভুলে যেতে পারো, লিখে দিই বরং। টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে হ্যাডো লিখলো ঠিকানাটা। মার্গারেট এসব কিছুই দেখছে না, কেঁদে চলেছে সে, বুক ভেঙ্গে গেছে তার যেন। হঠাৎ চোখ তুলেই দেখলো সে চলে গেছে কখন। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো মার্গারেট, প্রার্থনা করে চলেছে কায়মনে—যেন কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে এসেছে তার জীবনে।

দরজায় সুসি চাবি ঢোকাতেই লাফিয়ে উঠে পড়লো—হাতদুটো পেছনে জড় করা, দাঁড়িয়ে সে আগুনকুণ্ডর দিকে পেছনে ফিরে, কয়েদী নিজেকে নিরপরাধ প্রমানে তৎপর হয় যে ভঙ্গিতে। সুসির কিন্তু এতসব চোখে পড়লো না, রাগের গলায় প্রশ্ন করলো, —চায়ের আসরে গেলে না কেন? তোমার কি হয়েছে বুঝলাম না।

—ভীষণ মাথা ধরেছিলো। নিজেকে সংযত করার প্রয়াস চালাচ্ছে মার্গারেট।

ক্লান্ত সুসি চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলো। মার্গারেট কথা শুরু করলো, কষ্টে,—ন্যানসির কি বিশেষ কিছু বলার ছিলো তোমাকে?

—এলোই না তো সে! বিরক্তির গলা সুসির,—বুঝতে পারি না ওর ব্যাপার-স্যাপার। ট্রেন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, কোনো চিহ্নই নেই তার। স্টেশানে পায়চারী চালালাম আধঘন্টা।

চিমনির কাছে এগিয়ে ন্যানসির পাঠানো টেলিগ্রামটা নিয়ে আর একবার পড়লো। বিস্ময়ের গলায় বলে উঠলো,—ওঃ কি বোকা আমি! ডাকঘরের ছাপটাই দেখিনি, ব্রয়ে লিভ্রে থেকে পাঠিয়েছে।

স্টুডিও থেকে দশ মিনিটের রাস্তা জায়গাটা। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো সুসি সেটার দিকে;—কেউ রসিকতা করেছে কিনা কে জানে, আমার সঙ্গে! আমার মন যদি সন্দিগ্ধপ্রকৃতির হতো তাহলে ভাবতাম আমাকে সরিয়ে দেবার জন্যে তুমিই করেছো এসব।

মার্গারেটের মাথায় খেলে গেলো ব্যাপারটা,—এটা অলিভার হ্যাডোর পক্ষে সম্ভব। স্টুডিওতে প্রথম দিন ছবিতে ন্যানসির

নামটা হয়তো পড়ে থাকবে সে। ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে বলে উঠলো,—তোমাকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে, মুখেই বলতাম দ্বিধা না রেখে।

—এখানে কেউ আসেনি? সুসি জিজ্ঞেস করলো।

—কেউ না। মার্গারেটের মন তৈরী হবার আগেই মিথ্যে ভাষণ বেরিয়ে এলো ঠোঁট থেকে তার। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো। গালে যেন রং পড়লো...

সুসি উঠে পড়লো সিগারেট ধরাতে। নার্ভগুলোকে বিশ্রাম দিতে চায় সে। টেবিলের ওপরই ছিলো সিগারেটের বাক্সটা, সেটা তুলতে গিয়ে হ্যাডোর ঠিকানায় চোখ পড়লো তার। তুলে নিয়ে পড়লো সুসি,—এখানে আবার কে থাকে?

—জানি না। মার্গারেট কোনোরকমে বলে উঠলো।

পরের প্রশ্নের জন্যে মনটাকে বাঁধছে সে, কিন্তু সুসি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নামিয়ে দিলো কাগজটা। দেশলাই জ্বালালো সে।

মার্গরেটর মাথা কাটা গেলো। সরলতায় ভরা মনটা তার প্রিয়তম বান্ধবীর কাছে এই মিথ্যের বেসাতি তার নিজের কাছেই অত্যন্ত অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। সুসির মনে অবিশ্বাস জন্মাক চায় না সে, অন্যদিকে অলিভার হ্যাডোর উপস্থিতি, আর, সেই সঙ্গে বিভৎস দৃশ্যের ব্যাখ্যান শোনানো. সুসি নিঃসন্দেহে তাকে অপ্রকৃতিস্থ ভাববে।

দরজায় টোকা পড়লো। মার্গারেটের নার্ভ আবার বিধ্বস্ত হলো—আর্ত চিৎকার উঠলো তার গলা চিরে। হয়তো হ্যাডো ফিরে এসেছে—

কিন্তু না—এসেছে আর্থার বারডন। এক আতিশয্যেভরা অভ্যর্থনা জানালো আর্থারকে সে, নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে—যেন অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। মনটাও ক্লান্ত। আলাপ-আলোচনায় সে নিজেকে অংশীদার করে নিতে পারছে না। কিন্তু তার গলা বিশ্বাসঘাতকতা করছে বারবার। আর্থার তার দিকে

তাকিয়ে কৌতূহলের চোখে একাধিকবার।

মার্গারেট নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি শেষপর্যন্ত, কান্নায় বাঁধ ভেঙেছে। আর্থার সস্নেহে তার হাত ধরেছে, জানতে চেয়েছে কারণ তার ভেঙে পড়ার। মার্গারেট তাকে অবলম্বন করে কেঁদে চলেছে।

—ও কিছু না। কান্নাভরা গলায় বলেছে,—আমার কি যে হয়েছে বুঝতে পারছি না। নার্ভাস হয়ে পড়ছি খালি, ভয়ও বাড়ছে।

আর্থার অত্যন্ত সহজভাবে নিলো ব্যাপারটা। ছেলেমানুষীর কিছু মনে হয়েছে তার, সেই মনোভাব নিয়েই মার্গারেট সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে।

—আমাকে দেখো, আর্থার। আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে পারে আমার। সর্বশক্তি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াও তুমি। একটু থেমে বললো,—আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও ছেড়ে যাবে না কখনো আমাকে?

আর্থার হেসে তার গালে ঠোঁট ছোঁয়ালো। মার্গারেট ঠোঁটে মৃদু হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলো,—আমরা কি এখনি বিয়ে করতে পারি না? আর দেরী করতে পারছি না—তোমার স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারি না।

আর্থার তাকে বোঝালো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তো তারা বিয়ে করবে। তাড়াহুড়ো করে লাভ হবে না, কারণ বাড়ি ঠিক হয়নি। তাছাড়া মার্গারেটই ঠিক করেছে দিন।

মার্গারেট সবই শুনলো, মনে মনে চরম ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে তার—আমার যদি কিছু হয়, তোমাকে দায়ী করবো কিন্তু—মৃত পশুর মতো যন্ত্রণাকাতর চোখ তার।

—আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

রাতে ভাল ঘুম হলো না মার্গারেটের, পরের দিন তাই স্বাভাবিক প্রশান্তি নিয়ে কাজে বেরোতে পারলো না সে। সমস্ত কিছুর একটা সোজা ব্যাখ্যা খুঁজে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। টেলি-

গ্রামের ব্যাপারটা হ্যাডোর পরিকল্পনার একটা অংশ বলে মনে হয়েছে তার, হঠাৎ অসুস্থতা স্টুডিওতে ঢোকার একটা ভানও হওয়া সম্ভব। মার্গারেটের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়েছে, যা দেখেছে তার সমস্তটুকুই অলিভার হ্যাডোর অলৌকিক কল্পনার ফসল হতে পারে।

হ্যাডো তার ওপর এরকম জঘন্য একটা সুযোগ নেওয়া সত্ত্বেও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না মার্গারেট। ওর প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আতঙ্ক, হতাশা। অলিভার হ্যাডো যা বলেছে, যা শুনেছে মার্গারেট, সব কিছুরই একটা পার্থিব অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস জন্মেছে তার মনে। তার হৃদয়ে আগাছার মত আঁকড়ে আছে তা, দীর্ঘ বিষাক্ত প্রশাখার বিস্তার যেন, শরীরের প্রতিটি শিরা বয়ে নেমেছে··· সারা অঙ্গ তার কাঁদে ..

কোনো কিছুই তার মন কাড়তে পারে না, জীবনের সমস্ত কিছু আর তার মাঝে শুধু একটাই সত্তা—অলিভার হ্যাডো, তার জমকালো মেদ্‌বহুল শরীর নিয়ে বিদ্যমান। এমন আতঙ্ক বুঝি মার্গারেটকে এত গভীরভাবে ছোঁয়নি আগে। হ্যাডোর শরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা, যা এতদিন অন্য সব অনুভবের উর্ধ্বে ছিলো—তা ম্লান হয়ে গেলো। নিজের সঙ্গে লড়াই চলেছে তার—লোকটার ছায়া আর মাড়াবে না সে—তবু, হ্যাডোকে দেখবার এক অদম্য ইচ্ছে তার মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। নিজের ইচ্ছে যেন অন্তর্হিত—এক স্বয়ংক্রীয়যন্ত্রে পরিণত সে···শিকারীর জালে জড়িয়ে পড়া এক পাখীর মত ছটফট করে চলেছে, ডানার ব্যর্থ ঝটপটানি শুধু··· হৃদয়ের গভীরে এক মৃদু বাসনা, অপ্রতিরোধের···

হ্যাডো তার ঠিকানা রেখে গেছে, তার কারণ সে জানে মার্গারেট নিশ্চয়ই তা কাজে লাগাবে একদিন। কেন সে হ্যাডোর কাছে যেতে চাইছে তা নিজেই জানে না সে, যাওয়া দরকার এইটুকুই জেনেছে। বলার কিছুই নেই হয়তো, তবু যাওয়া···

নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে⋯ক্ষতবিক্ষত হয়েছে...বুঝেছে হ্যাডোর শক্তিকে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই তার।

মার্গারেট জানে এ' ভয়ঙ্কর আকর্ষণের একটাই অর্থ—নিজেকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া। সুসি বা আর্থারের কাছে সাহায্যের আকুতি জানাতে চেয়েছে, কিন্তু এক অদৃশ্য বাধা দেখা দিয়েছে।

শেষে, মানসিক অধৈর্যের এক অসহায় অবস্থায় ডাক্তার পোরোয়ের কথা মনে হয়েছে তার, সে অন্তত তার মনোবেদনা উপলব্ধি করবে। আর দেরী করা চলে না, ডাক্তারের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলো মার্গারেট।

পোরোয়ে বাড়ি ছিলো না। দমে গেলো মার্গারেট, শেষ আশাও বুঝি বিলুপ্ত তার। নিমজ্জমান মানুষের অবস্থা এখন তার, পাথর আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়⋯ঢেউয়ের আঘাতে জর্জরিত⋯ তার রক্তাক্ত হাতদুটোকে শেষ আশ্রয়চ্যুত করার প্রয়াস চালিয়ে চলেছে যেন কেউ⋯

স্কেচ-এর ক্লাসে আর গেলো না মার্গারেট, সন্ধ্যে ছ'টায় যাবার কথা সেখানে তার। অলিভার হ্যাডোর দেওয়া ঠিকানার উদ্দেশে চললো সে। সন্তর্পণে চলেছে রাস্তা দিয়ে মার্গারেট—জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে, কেউ দেখে ফেলবে ভয় তার—বুকটা তোলপাড় তার—বারবার ফিরে যেতে চেয়েছে, তবু চলেছে...সিঁড়ি উঠে গেছে দ্রুতপায়ে, দরজায় তুলেছে আঘাত। হ্যাডোর নির্দেশ পরিষ্কার মনে আছে তার।

দরজা খুলে গেলো ; অলিভার হ্যাডো দাঁড়িয়ে তার সামনে। লেশমাত্র বিস্ময়ের ছোঁয়া নেই তার চোখে। সিঁড়ির রেল ধরে দাঁড়িয়ে মার্গারেটের মনে হলো ওর আগমনের কোনো হেতু তো নেই। হ্যাডোর গলা এলো, মার্গারেটকে তার ব্যাখ্যা থেকে রেহাই দিয়ে,—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।

বসার ঘরে নিয়ে বসালো মার্গারেটকে সে। ভারী আসবাবে ঠাসা ঘর। হ্যাডোর মত মানুষের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক।

প্রশস্ত ঘরটাতে আরামের আসবাব বেশী নেই, যার অর্থ—পার্থিব সামগ্রীতে হ্যাডোর অনাকর্ষণ। ভারী আসবাব পেরিয়ে বিরাট চেহারা নিয়ে এগোচ্ছে হ্যাডো—এক বিচিত্র দৃশ্য। সেই তিক্ত গন্ধও নাকে আসছে।

মার্গারেটকে বসতে বলে আলাপ শুরু করলো সে, যেন কতকালের পরিচয়। ওদের মধ্যে কোনো মনান্তর হয়েছে একথা যেন হ্যাডো সম্পূর্ণ বিস্মৃত। মার্গারেট সাহস করে বলেই ফেললো শেষে,—আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করলে কেন?

—অবিশ্বাস্য শক্তিপ্রদর্শনের জন্যে তো এখন নিশ্চয়ই প্রশংসা করছো আমার—

—আমি আসবো তুমি জানতে?

—জানতাম।

—আমি তোমার কি করেছি যে আমার জীবনটাকে এমন বিস্মৃত করে তুলছো। আমি একা থাকতে চাই।

—তুমি যদি চলে যেতে চাও বাধা দেবো না। কোনো ক্ষতি তো করিনি তোমার। দরজা খোলাই আছে।

মার্গারেটের হৃৎস্পন্দন বেড়ে চলেছে, যন্ত্রণাও। তবু নিঃশব্দ সে। সে জানে তার যাওয়ার ইচ্ছে নেই। অলিভার হ্যাডোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে কাছে টানছে। বাধা দেবার শক্তিও হারিয়ে ফেলছে ক্রমে মার্গারেট। এক বিচিত্র অনুভূতি তার শরীর বেয়ে উঠছে...তার প্রতিটি শিরায় পাক খেয়ে···আতঙ্কিত মার্গারেট, তবু সে নিজের অজ্ঞাতে উল্লসিত।

মৃদুস্বরে কথা বলতে শুরু করলো হ্যাডো, মার্গারেটের কানে এক রোমাঞ্চকর ছোঁয়া। এখন আর ছবির আলোচনা করছে না সে, বইয়ের কথাও নয়। জীবনের কথা বলছে। প্রাচ্যের বিচিত্র সব জায়গার উল্লেখ করে চলেছে হ্যাডো, যেখানে কোনো নাস্তিকের পা পড়েনি। মার্গারেট মুগ্ধ তার মধুস্বরে। ঘুমন্ত জনহীন নগরের কথা বলছে হ্যাডো, মরুভূমির চাঁদের আলোয় স্নাত রাতগুলো,

সূর্যাস্তের সৌন্দর্য আর বলছে দুপুরের জনবহুল রাস্তাগুলোর কাহিনী। প্রাচ্যের সুন্দর একটা চিত্র মার্গারেটের চোখের সামনে ভেসে উঠলো—নানাবর্ণ মাকড়সার জাল আর রেশমী কার্পেটের ব্যাখ্যানও শুনছে হ্যাডোর মুখে, ঘৃতকুমারী আর বিচিত্রবাস সুগন্ধের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয় মার্গারেট—নাকে লেগে যেন সেসব—ক্রমে সমস্ত কিছুই আস্তে তার চোখের সামনে মেলছে। আর্থারের স্ত্রী হবার বাসনা ক্ষীণতর হচ্ছে তার। হারলে স্ট্রিটের গৃহকোণের একঘেঁয়েমি আর কাজের গতানুগতিকতা। সাধারণের মাঝে যে বৈচিত্র্য অনুপস্থিত তারই হাতছানি যেন পাওয়া যাচ্ছে হ্যাডোর রূপকথায়। অসমসাহসিকতায় ভরা কাজের প্রতি এক আশ্চর্য আকর্ষণ তার শরীর ছুঁয়ে—যেন অঙ্গারের পরশ।

দ্রুত উঠে পড়লো মার্গারেট, বুকটা তার উথালপাথাল, চোখমুখে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য—হ্যাডো বহুবর্ণ অলৌকিক চিত্রের কল্পনায় মোহিত—

অলিভার হ্যাডোও উঠে দাঁড়িয়েছে; ওরা মুখোমুখি—মার্গারেট বুঝতে পেরেছে—কামনার শিকার সে। দ্রুত এগিয়ে এলো হ্যাডো, চোখদুটোয় তার রহস্যের ইঙ্গিত যেন বাড়ছে। মার্গারেটকে দুহাতে টেনে নিলো তার বুকে, ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে দিলো—ইন্দ্রিয়াতীত সুখের স্বপ্নে নিজেকে ছেড়ে দিলো মার্গারেট, তার সমস্ত শরীর হ্যাডোর আলিঙ্গনের তাপে পুড়ছে—উচ্ছ্বাসে—

—তোমাকে ভালবাসি—অস্ফুট কথাগুলো বেরিয়ে এলো মার্গারেটের ঠোঁট থেকে। চোখ তুলে তাকালো সে অলিভার হ্যাডোর দিকে, লজ্জাহীন চোখে।

—তোমার যাওয়া উচিত এবার—হ্যাডো অনুচ্চগলায় বললো।

দরজা খুলে ধরলো সে। মার্গারেট বেরোলো, নিঃশব্দে।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললো সে, যেন কিছুই হয়নি। অনুশোচনাবোধ নেই, নেই বিতৃষ্ণা।

এরপর প্রতিদিনই মার্গারেটের মনে হয়েছে হ্যাডোর কাছে

যাওয়া দরকার তার, আত্মসমর্পণ না করার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু সে প্রয়াস তার কাছে একটা ভান মনে হয়েছে। আকস্মিক সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা মনে দেখা দিতেই উত্তেজনা বেড়েছে। তার আহ্বানে সাড়া দিতেই হয়েছে, তার সঙ্গের সময়টুকুই তার মন ভরিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন তার বুক ভরেছে, হ্যাডো তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার ভারী, কামজ ঠোঁটে রেখেছে তার ঠোঁট। কিন্তু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশেছে বিতৃষ্ণাও—শারীরিক আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র ঘৃণাও—

তবু, তার ম্লান নীলচোখে যখন তাকিয়েছে হ্যাডো, তার গলায় অস্বাভাবিক ফিসফিসানির ঝড় তুলেছে—সব কিছু বিস্মৃত হয়েছে মার্গারেট। অপবিত্র সমস্ত জিনিষের নাম করে চলেছে হ্যাডো—এক একবার পরদার একাংশ তুলে ধরছে ; পলকের জন্যে অপার্থিব বস্তুর সন্ধান মিলছে।

অনন্ত জ্ঞানের পিয়াসায় মানুষ কিভাবে মাথা খুঁড়ে চলেছে, জেনেছে মার্গারেট। মন্দিরশীর্ষে যেন দাঁড়িয়ে সে—আধ্যাত্মিক রাজ্যের গহন আঁধারে চোখ মেলে, অভিজ্ঞাতের অজ্ঞাত দুয়ার যেন খুলে গেছে—ধ্বংসের হাতছানি—কিন্তু অলিভার হ্যাডো সম্পর্কে জানা হলো না কিছুই। মার্গারেটকে সে ভালবাসে কিনা তাও জানা হলো না। মানবতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেন তার অস্তিত্ব। শুধু একটা কথাই জেনেছে মার্গারেট তার পরিবার সম্পর্কিত ; হ্যাডোর মা জীবিত, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তথ্যপ্রকাশে অনাগ্রহী সে।

—এক দিন তো দেখতেই পাবে তাঁকে।

—কবে ?

—খুব শীগগিরই।

মার্গারেটের জীবন বয়ে চলেছে নিয়ম নিগড়ে। বান্ধবীদের প্রতারিত করতে অসুবিধে হয়নি তার, নিয়মিত অনুপস্থিতির আপাত-যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। প্রথম প্রথম মিথ্যা ভাষণে যন্ত্রণাবোধ হয়েছে, ক্রমে তা স্বচ্ছন্দ হয়েছে। স্বাভাবিক মনে

হলেও মার্গারেট ভয় পেয়েছে। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বারবার আতঙ্কিত হয়েছে। কখনো বিছানায় শুয়ে একাকী অর্থারের কথা ভেবেছে, তার সঙ্গে অভিনয়ের কথা ভেবে বেদনা বোধ করেছে। আর্থারের প্রতি তার অনুভূতির আকস্মিক রূপান্তরের প্রসঙ্গ তোলেনি সে। আর্থারকে নিস্তেজ মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন তার, হ্যাডোর স্পষ্টবাদীতার কাছে তার ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে গেছে। আর্থারের প্রতি এক বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছে তার মনে, কারণ মার্গারেটকে বুঝতে চেষ্টা করেনি সে কখনো। মনটা অনুদার হয়ে আসছে তার। ক্রমে ঘৃণার ভাবও জন্মেছে মার্গারেটের মনে। বদান্যতা দেখিয়ে মার্গারেটকে বিয়ে করতে চাইছে সে, মনে হয়েছে তার।

তবু, মার্গারেট আলোচনা চালিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

চতুর্দশ লুইয়ের কায়দায় তাদের ঘর সাজাবার পরিকল্পনা করেছে: সব কিছুই মনের মতো হওয়া দরকার—

বিয়ের তারিখ স্থির হলো। আনুষঙ্গিকের সবিস্তার আলোচনাও শেষ। আর্থারের মনে আনন্দের জোয়ার বইছে। মার্গারেট কিন্তু নির্লিপ্ত। ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা নেই তার মনে। শুধু সন্দেহ এড়াতেই যে সম্পর্কে আলোচনা চালিয়েছে সে। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে তার, এই বিয়ে কখনোই বাস্তবে রূপায়িত হবে না, কিন্তু তা রোধ করার কোনো বুদ্ধি খেলেনি তার মাথায়। আর্থার আর সুসিকে লক্ষ্য করে চলেছে মার্গারেট, নিঃশব্দে—ধূর্ত চোখে। নিজের গোপনতা রক্ষা হয়েছে, আর এক গোপন তথ্য উন্মোচিত অন্যদিকে। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে মার্গারেট—সুসি আর আর্থার পরস্পরের অনেক ঘনিষ্ঠ। এ' আবিষ্কার এতই হতবুদ্ধিকর, যে প্রথমটায় তা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে মার্গারেটের কাছে।

—আর্থারের যে ক্যারিকেচার করবে বলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা কিন্তু করোনি। সুসিকে একদিন বলে বসলো মার্গারেট।

—চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওকে ঠিক মত পাচ্ছি না। সুসি হেসে জানিয়েছে।

—ওই লম্বা নাক আর ঢ্যাঙ্গা চেহারায় অদ্ভুত মজার খোরাক মিলবে তোমার আশা করেছিলাম।

—ওর সম্পর্কে এমন বিশ্রী করে কথা বলো কেন। আমার তো ওর সুন্দর হাসিমাখা মুখটাই নজরে পড়ে, কমনীয় ঠোঁট। ক্যারিকেচার না করে তো ভাবছি আমার একটা প্রিয় কবিতার প্যারোডী লিখবো।

সুসি যে পোর্টফোলিওতে ছবি রাখে সেটা তুলে নিলো মার্গারেট। সুসির চোখে আশংকা ফুটলো, কিন্তু মার্গারেটকে নিষেধ করার ভাষা হারিয়েছে সে। অলসহাতে উল্টে চললো বইটা মার্গারেট, যেন কিছুই চোখে পড়েনি তার। সে বইটা বন্ধ করতে সুসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো

—আরও পরিশ্রম করা উচিত তোমার, ক্যারিকেচার যখন করো না তখন আর্থারের মুখ আঁকারও পরিকল্পনা নেই তোমার!

—ওই ছেলেটির প্রতি তোমার যে অপরিসীম আগ্রহ তা নিশ্চয়ই সবার মধ্যে থাকবে এটা আশা করো না তুমি!

মার্গারেটের সন্দিগ্ধ মনে নিশ্চয়তা দেখা দিলো: সুসিও তার চেয়ে কম মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে না।

পরের দিন, সুসি বেরোতে—মার্গারেট বইটা নিয়ে বসলো। আর্থারের স্কেচগুলো উধাও! প্রচণ্ড রাগে তার শরীর-মন আচ্ছন্ন হলো...সুসি তার মনের মানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছে—

হ্যাডো যে জাল ছড়িয়েছে তা নিপুণ জটিলতার। মার্গারেটের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে সে, প্রভাব বিস্তার করে চলেছে গভীরভাবে। তার কার্যকলাপে নারকীয় প্রতিফলন থেকে গেছে, তবু—যথাসময়ে মার্গারেটের ভয়মিশ্রিত ঘৃণা দূর হয়েছে। মার্গারেট আর তার জীবনকে হ্যাডোর জীবন থেকে আলাদা করতে পারছে না।

হ্যাডোও বুঝেছে সেটা, তাই একদিন কথাচ্ছলে জানালো,—
—আগামী বৃহস্পতিবার আমি প্যারিস ছেড়ে যাচ্ছি।
চমকে উঠলো মার্গারেট, নিজের অজ্ঞাতেই কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বিস্ফারিত চোখে তাকালো সে,—আমার তাহলে কি হবে?
—কেন, সুশ্রী তরুণ বারডন রইলো, তাকে বিয়ে করবে।
—তুমি জানো—জানো তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। এত নিষ্ঠুর হতে পারো কি করে?
—তাহলে, বিকল্প একটাই রাস্তা আছে—আমার সঙ্গে যাওয়া।
—মানে?
—উত্তেজিত হবার কিছু নেই। তোমার প্রার্থিত ইচ্ছে পূর্ণ করতে চাই—বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে।
অসহায় ভঙ্গিতে বসে পড়লো চেয়ারে মার্গারেট। ভবিষ্যতের ভাবনা মন থেকে মুছে দিয়েছিলো সে—ভাবেনি কখনো, এমন করে চলবে না দিন। হ্যাডোকে হয় ছেড়ে দিতে হবে, বা তার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে তার জীবন। হ্যাডোর প্রতি এক বিতৃষ্ণায় ভরা আকর্ষণ থেকে গেলেও, মার্গারেট তাকে ঘৃণা করে, ভয় পায়। আর্থারের কথা মনে পড়লো তার, মার্গারেটের জন্যে সে যা করেছে তাও ভাসছে তার মনে। নিজের ওপর ঘৃণা হলো তার। খাঁচা-বন্দী পাখীর মত মাথা খুঁড়ে চলেছে যেন, মুক্তির আশায়। দ্রুত উঠে পড়লো মার্গারেট,—আমি এখান থেকে চলে যাবো। তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো ছিলো। কি করেছো তুমি আমার কে জানে।
—যেতে যদি চাও, তাহলে আটকাবো না।
দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লো অলিভার হ্যাডো, অলস পায়ে। তার বিরাটকায় দেহে ভয়ঙ্কর কিছুর একটা আভাস; গলা দিয়ে নেমেছে মাংসের স্তূপ, ঘাড় ঢাকা পড়ে গেছে তাতে। বিরাট বিরাট গাল, দাড়িহীন মুখটাকে আরও নগ্ন, ভয়াল করেছে। তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে মার্গারেট থমকে দাঁড়ালো, প্রচণ্ড

বিতৃষ্ণার মধ্যেও এক দুর্নিবার আকর্ষণ...হ্যাডো তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করুক এই কামনা তার মনে, ঠোঁটে চেপে ধরুক তার স্থূল, কামনাতপ্ত ঠোঁট—শয়তান যেন তার সৌন্দর্যের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়...এই পৈশাচিক জীবের কবলিত করে। কামনার উদগ্র আগুনে জ্বলছে মার্গারেট। হ্যাডো নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে আছে,—কই, যাও।

মাথা নুইয়ে এলো মার্গারেটের। হ্যাডোর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো। বাড়ির পথে লুক্সেমবর্গের উদ্যান পড়লো, পাদুটো যেন বইছে না আর মার্গারেটের—একটি বেঞ্চিতে বসে পড়লো। নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, এ' জায়গা সুপরিচিত তার—বিগত দিনে এখানে এসেছে সে, একটা বিশেষ গাছের আকর্ষণে। গাছটার ওপর নজর গেলো তার, জাপানী খোদাইয়ের মাধুর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে গাছ—সরু সরু ভঙ্গুর পাতা তার, শরতের ছোঁয়ায় আধাসোনা, আধাসবুজ। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে তার কালো ডালগুলো আকাশের এক অদ্ভুত সৌন্দর্য নিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কোনো চিত্রকরের তুলিতে এই সৌন্দর্য অতিক্রম করা সম্ভব নয়—কিন্তু মার্গারেটের চোখে আর আজ এই আনন্দরস সিক্ত চিত্রপট কোনো নতুন বার্তা বয়ে আনতে পারছে না।

শিল্পীমন হারিয়ে গেছে তার, মরে গেছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তার হৃদয়টাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—আর্থারের সঙ্গে গতদিন সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে তার, মিথ্যের জাল বুনেছে মার্গারেট তার কাছে আবারও—এ' যন্ত্রণাও তাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। আর্থার তাকে ভার্সাই যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলো, অন্যান্য ছুটির দিনের মত এক সঙ্গে দিনটা কাটাবার জন্য। কিন্তু মার্গারেট সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি। এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাবে জানিয়েছিলো। আর্থার মেনে নিয়েছে তার অজুহাত। তার এই কপটতাকে সন্দেহ করলে মার্গারেটের কাছে এত অসহনীয় মনে হতো না, আর্থারের তিরস্কার তার বুকটাকে কঠিন করতো। কিন্তু তার অবিচল

বিশ্বাস···ওঃ, এসবই যদি মন থেকে দূর করে দিতে পারতো।

সেন্ট সালপিসের সান্ধ্যকালীন ঘন্টাধ্বনি চলেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো মার্গারেট গির্জার দিকে। ঐ সঙ্গীত তার মনে সান্ত্বনার আমেজ ছড়িয়ে দেবে, প্রার্থনায় মগ্ন হতে পারবে মার্গারেট। সে যেখানে বসে চারপাশ আঁধারে মিশে গেছে, খুসীর জোয়ার আনে মনে। শ্রান্ত মার্গারেট দেখছে, মানুষের আনাগোনা। ওর পেছনে এক বেদীতে যাজক বসে, যেখানে বসে পাপস্বীকারের কথা শোনে তারা গির্জায়। একটি ছোট্ট কৃষককন্যা, সম্ভবত পরিচারিকার কাজ নিয়ে রাজধানীতে এসেছে সে, ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। তার অনুচ্চকণ্ঠস্বর কানে আসছে মার্গারেটের। অনেক পরে পরে যাজকের গভীর গলা—মিনিট তিনেকের মধ্যেই তার পোশাক পরিবর্তন করে ফেললো মেয়েটা। সাদামাটা কালো পোশাকে তাকে দারুণ সতেজ দেখাচ্ছে,—সুস্বাস্থ্য আর নিষ্পাপ মুখটা। মার্গারেটের মনে দয়াবোধ হলো। স্বীকারোক্তির কিছুই নেই তেমন বালিকার, অপরিণত বয়সের কিছু দুর্বলতা, যা শুনে যাজকের ঠোঁটে ফেলেছে মৃদু হাসি। ওই সংযমী কানে যদি মার্গারেট তুলে দিতে পারতো তার যন্ত্রণার কাহিনী, হাঁটু মুড়ে তার সামনে নিজেকে মেলে দিতে পারতো যদি সে—কিন্তু ধর্মপ্রচারকের বিশ্বাস আর তারটা তো এক বিন্দুতে মেলেনি, তাদের দুজনের মনের কথা ভিন্ন খাতে বইছে, শুধু মুখের কথা নয়—অন্তরের গভীরে ছুঁয়েছে সে কথা। নাস্তিকের কথা শোনার সময় কই তার ?

শিক্ষাকেন্দ্র থেকে দলে দলে শিক্ষাবিদেরা বেরিয়ে আসছে, গির্জার লম্বা ছায়ায় ঘেরা শিক্ষায়তন থেকে। দু'য়ের সারে অগ্রসর হয়েছে, কালো-সাদা পোশাকে। প্রবীন আর নবীনেরা সে দলে। মার্গারেট তাদের চোখে তাকিয়েছে, তার বেদনার ভাগীদার কিনা তারা, জানবার উদ্দেশ্যে। না, ওদের দৃষ্টিতে নেই উত্তরণের ছোঁয়া। প্রধানেরা অগ্রগামী, পরিধানে তাদের উজ্জ্বল পোশাক।

সুন্দর বাজনা বেজে চলেছে। বিষণ্ণ, মর্যাদার ব্যঞ্জনা তাতে।

কিন্তু, মার্গারেটের মনকে [illegible] দিতে পারেনি। যাজকের মুখনিঃসৃত বাণীর মর্ম বুঝতে অক্ষম সে, তাদের হাবভাব তার কাছে কেমন বিচিত্র মনে হয়েছে। এই জমকালো ধর্মাচরণের কোনো মানে নেই, ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছে—পরভূমে একা সে। অশুভ ছায়া তাকে ঘিরে রেখেছে—এ'সব উৎসব তার মন ছুঁতে পারছে না।

এদের সামনে চোখের জল ফেলতে পারবে না মার্গারেট। মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলো সে। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে মার্গারেট। কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, অন্তহীন রাস্তা হেঁটে যেতে যেতে,—ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। ঈশ্বর আমাকে...

কান্নায় কথা ডুবে গেলো তার।

পরের দিন হ্যাডোর বাড়িতে উপস্থিত হলো মার্গারেট, চোখ-দুটো রক্তলাল—অনেক কেঁদেছে। হ্যাডো দরজা খুলে দিতে, নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো সে।

হ্যাডোও তার দিকে তাকিয়ে আছে, নিঃশব্দ।

—তুমি যখনই চাইবে, আমি বিয়ে করতে রাজী। মার্গারেট জানালো।

—আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। হ্যাডো শান্তস্বরে বললো।

—তুমি তোমার মায়ের কথা বলছিলে সেদিন, তাঁর কাছে নিয়ে চলো আমাকে, দেরী কোরো না।

ঠোঁটে হাসির ছায়া পড়লো হ্যাডোর.—যদি তাই চাও তুমি। সে জানালো কনসালের কাছে গিয়ে ওরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, বৃহস্পতিবার সকালেই। পরে ইংল্যাণ্ডের ট্রেন ধরবে।

মার্গারেট সবই তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে,—আমি ভীষণ অসুখী।

অলিভার হ্যাডো তার কাঁধে হাত রাখলো। ওর চোখে তাকালো সে,—বাড়ি যাও, আর অসুখী মনে হবে না তোমার। আমার নির্দেশ—সুখী হবে তুমি।

শুভ আর অশুভের লড়াই শেষ হলো। তিক্ত লড়াই। শুভ-বুদ্ধির জয় হয়েছে। হঠাৎ নিজেকে বড় উল্লসিত মনে হচ্ছে মার্গারেটের। তার বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে অসততার কোনো রেশ আর নেই তার মনে। কত সহজে তাদের প্রতারণা করা যায়—তিক্ত হাসি ফুটলো মার্গারেটের ঠোঁটে।

বৃহস্পতিবার আর্থারের জন্মদিন, মার্গারেটকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, একা। নদীর অন্যপারে এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় খানার ব্যবস্থা হয়েছে। সাতটার কিছু পরে মার্গারেটকে নিতে এলো আর্থার। খুব সেজেছে মার্গারেট। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর্থারের জন্যে অপেক্ষা করছে সে, আয়নায় দৃষ্টি। সুসির মনে হলো এত সুন্দর দেখেনি সে মার্গারেটকে।

—তোমাকে অনেক বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। ইদানীং তোমার কি হয়েছে জানি না। কিন্তু তোমার চোখে এক নতুন গভীরতা নেমেছে। এক রহস্যময় দৃষ্টি—তোমাকে আরও আকর্ষণীয়া করে তুলেছে তা।

আর্থারের প্রতি সুসির দুর্বলতার কথা মনে হলো তার, সুসির বুক ভেঙেছে কিনা বুঝতে চাইলো। আর্থার ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলো। মার্গারেট স্থির বসে। ওরা পরস্পরের দিকে চাইলো। আর্থারের হৃৎস্পন্দন বাড়ছে। নিজের ভাগ্যকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে, এই অমূল্য সম্পদের মুখোমুখী হয়ে। হাঁটু মুড়ে প্রার্থনারত হতেও প্রস্তুত সে, প্রাচীনকালের গ্রীক দেবীর ছবি যেন তার সামনে। মার্গারেটের চোখের ভাষাও বদলে গেছে, এক জ্বলন্ত কামনার ছাপ ছড়িয়ে তাতে। এ দৃষ্টি তাকে বিব্রত করেছে, সেই সঙ্গে মোহের সৃষ্টিও করেছে।

অনন্যা কিশোরী যেন আশ্চর্য সুন্দর এক নারীতে রূপান্তরিতা—ঠোঁটে তার এক প্রহেলিকার হাসি,—তুমি খুসী তো?

আর্থার এগিয়ে আসতে মার্গারেট তার হাতদুটো তার কাঁধে রাখলো,—সেন্ট মেখেছো? আর্থার বিস্মিত। মার্গারেট কখনো

সুগন্ধ ব্যবহার করে না। এক অস্পষ্ট বিচিত্র গন্ধ, প্রাচ্যে এ গন্ধ নাকে এসেছে তার—বহুদিন আগে। মার্গারেটকে এক নতুন মাধুর্য এনে দিয়েছে এ গন্ধ,—তার লাবণ্যভরা চেহারায় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে এ সুবাস। আর্থারের ঠোঁট দুটো কুঁচকে এলো, উত্তেজনায় চোখ-মুখ থেকে রং মিলিয়ে গেছে। যন্ত্রণার পর্যায়ে উন্নীত তার আবেগ। ধাঁধাঁ লেগেছে তার—কারণ মার্গারেটের চোখে এক নতুন অভিব্যক্তির স্বাক্ষর...

—আমাকে আদর কর। ফিসফিস গলা মার্গারেটের।

সুসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু তীব্র যন্ত্রণার এক প্রতিফলন তার চোখে ছড়িয়েছে, বুঝলো মার্গারেট। আর্থারকে তার দিকে টেনে নিলো সে, হাতদুটো কেঁপে উঠছে আর্থারের। উত্তেজনার প্রকাশ কখনোই করেনি সে, তাই মার্গারেটের ঠোঁটে তার ঠোঁট ছুলো, ভ্রাতৃত্বের ছোঁয়া যেন—ঠোঁটে ঠোঁট মিললো ওদের...ঘরের অন্য কারোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো আর্থার, এমন করে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি সে আগে কখনো। আগুনের ছোঁয়া যেন তার পেলব ঠোঁটে। আর্থার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, সব কিছু ভুলেছে সে। সে যেন ইচ্ছামৃত্যুতে বিলিয়ে দিতে পারে নিজেকে এই মুহূর্তে। সুসির কণ্ঠস্বর তাকে মর্তে ফিরিয়ে আনলো।

—এখানে ওইভাবে বোকার মতন না করে বাইরে ডিনারে বেরিয়ে পড়না। গলায় প্রগল্‌ভতার প্রলেপ মাখাতে চেয়েছে সুসি, কিন্তু যন্ত্রণার স্বাক্ষর পড়েছে। ছোট্ট করে হাসলো মার্গারেট, আর্থারের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে। সুসির দিকে তাকাতে তার হাসি মিলিয়ে যেতে দেখলো—কারণ ঘৃণার সুস্পষ্ট প্রকাশ মার্গারেটের হাসিতে। এত আকস্মিক যে, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে। কি করেছে সে? ভয় পেয়েছে সে, ভীষণ ভয়—মার্গারেট কি তার গোপন কথার হদিস পেয়েছে? আর্থার হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উত্তেজনায় থরথর।

—খুসি আমাদের চলে যেতে বলছে। মার্গারেট ঠোঁটে হাসি ফোটালো।

আর্থার কথা বলতে পারছে না। মামুলী বিনয়ভাবও রাখতে পারছে না। মুখটা সাদা হয়ে গেছে, যেন গভীর ঘুম থেকে উঠেছে. মার্গারেটের পাশাপাশি হেঁটে চললো সে। দরজাটা ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলেও খুখির ফোঁপানি কানে এলো মার্গারেটের, এক বিভৎস উল্লাসে ভরে গেলো মন।

বুলেভার দে ইতালিয়েঁস-এই সরাইখানাটা। প্যারিসের এই দিনটিতে রাস্তা জনবহুল, সরাইও। কিন্তু, ঘরের মাঝখানে আর্থারের একটা ঘর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলো। মার্গারেটের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে মানুষ তাকিয়ে দেখছে তাকে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ফুলের সমারোহ পেরিয়ে চলেছে। এককোণে হাঙ্গেরীয় বাদ্য বেজে চলেছে, কিন্তু উত্তেজনার কথাবার্তায় চাপা পড়ে গেছে বাজনার মূর্চ্ছনা। মেয়েদের কলকাকলিতেও সরগরম ঘর। যথেচ্ছ খরচ করার মন নিয়ে এসেছে মানুষ। চিন্তাভাবনা আর দুঃখকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

মার্গারেটের মন যেন আজ হাওয়ায় উড়ছে। অল্পে নেশা হয়েছে তার, আবোল-তাবোল বকে চলেছে। আর্থার রোমাঞ্চিত। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে তার। আনন্দে ভরে উঠেছে মন। বিয়ের পরে কি করবে তারা, তাই নিয়ে চলেছে জল্পনা। কোথায় যাবে তারা, বাড়িটা কিভাবে সাজিয়ে তুলবে—কি দিয়ে সাজাবে—মার্গারেটের আনন্দ যেন ধরে না। তার কথা শুনে চলেছে আর্থার, কৌতূহল জমেছে তার দৃষ্টিতে। সঙ্গে চলেছে সুখাদ্যের স্বাদু আহার, মদ্যও। ঝরণার মত ঝরে পড়ছে তার হাসি। জীবন যেন আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে—

আর্থার ভাবে—আমাদের সুখী জীবনের দিনগুলো কামনা

করে পান করি এসো।

গ্লাসে গ্লাসে ছোঁয়ালো ওরা। মার্গারেটের চোখ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না আর্থার,—তোমাকে ওয়াণ্ডারফুল দেখাচ্ছে কিন্তু। আমার সৌভাগ্যের কথা ভেবে আশঙ্কিত হয়ে পড়ছি।

—আশংকার কি আছে আবার?

—কিছু কম পেলেই যেন ভালো হতো, এত সুখ—সবই কেমন স্বচ্ছন্দ...

নরম গলায় হেসে উঠলো মার্গারেট, মৃদুস্বরে। টেবিলে হাত মেলে দিলো সে। কোনো ভাস্করও পারতো না এর চেয়ে বেশী রূপ দিতে এই সৌন্দর্যের। একটা আংটিই শুধু তার আঙুলে। বড় পান্নার তৈরী আংটি—আর্থারের দেওয়া। বাগদানের নিদর্শন। মার্গারেটের হাতটা টেনে নিলো সে—কোথাও যেতে চাও?

ডিনার শেষে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলো আর্থার।

—না। এখানেই থাকি। তাড়াতাড়ি শুতে যাবো, কালকে অনেক কাজ আছে।

—কি করবে কাল?

—তেমন কিছু না। মার্গারেট হাসলো।

ছোটছোট দলে ভাগ হয়ে লোক উঠে পড়লো। সুন্দর রাত। ঠাণ্ডা যদিও। রাস্তা জনাকীর্ণ। মার্গারেট মানুষগুলোকে দেখছে। খেলা খেলা দৃশ্য যেন। একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে চললো ভীড় ঠেলে ওরা মন্ত পারনাসের দিকে। নিঃশব্দ ওরা—মার্গারেট আর্থারের গা ঘেঁষে বসে। মার্গারেটের কোমরে হাত রেখেছে সে। বন্ধ গাড়ির মধ্যে আর্থার আবার সেই বিচিত্র সুবাসের ঘ্রাণ নিলো, ডিনারের আগে যে সুবাসে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো।—

—আমাকে বড় সুখী করেছো তুমি, মার্গারেট। ফিসফিস গলা আর্থারের,—যতদিন বাঁচবো, এর চেয়ে খুশীর দিন বোধহয় আসবে না আমার জীবনে।

—আমাকে খুব ভালোবাসো তুমি, না? হালকা গলা মার্গারেটের।

আর্থার একথার জবাব দিলো না। মার্গারেটের মুখটা টেনে নিয়ে তার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলো গালে।

মার্গারেটের বাড়িতে পৌঁছলো ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে মার্গারেট হাসলো, হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে আর্থারের দিকে,—গুড নাইট।

—তোমার সঙ্গে অনেকটা সময় দেখা হবে না ভেবে ভীষণ খারাপ লাগছে, কখন আসবো?

—সকালে নয় কিন্তু। ব্যস্ত থাকবো। বারোটায় এসো—

মার্গারেটের ট্রেনটা ঠিক ওই মুহূর্তে ছাড়বে মনে পড়লো তার। দরজা খুলে হাতটা একটু তুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

মার্গারেটের বিয়ের খবর বয়ে আনলো যে চিরকুট, তার দিকে বোধশক্তিহীন চোখে তাকিয়ে রইলো সুসি। গারে দ্যু নর্দ থেকে পাঠানো। লেখা আছে:

'এ' চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, আমি লণ্ডনের পথে। আজ সকালেই অলিভার হ্যাডোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার। ওর প্রতি আমার ভালবাসা আর্থারের প্রতি দুর্বলতার থেকে অনেক বেশী। এটা করার কারণ, আর্থারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে পর্যায়ে পৌঁচেছে আমার, তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব বলো। ওকে বলো তা।'

মার্গারেট

সুসির মন ভয়ে আচ্ছন্ন হলো। কি করবে সে বুঝতে পারে না। চিন্তাশক্তিও লোপ পেয়েছে। দরজায় টোকা পড়লো। আর্থার এসেছে বোধহয়, কারণ বেলাভেই আসার কথা তার। তার কাছে অবিলম্বে খবরটা ভাঙা সম্ভব নয়, ভাবলো সুসি। সমস্ত কিছু জানা দরকার, তাছাড়া অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। মনস্থির করে ফেললো। দরজা খুলে দিলো সে,—মার্গারেট এখানে নেই,

দুঃখিত। ওর এক বান্ধবী অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ডেকে পাঠিয়েছে হঠাৎ।

—ওঃ, কি দুঃসহ। মিসেস ব্লুমফিল্ড নিশ্চয়ই ?

—উনি অসুস্থ জানতে তুমি ?

—মার্গারেট গত কয়েক দিনইতো ওর সঙ্গে বিকেল কাটিয়েছে।

সুসি চুপ করে রইলো। এই প্রথম সে ব্লুমফিল্ডের অসুস্থতার কথা জানলো। আর মার্গারেট যে তার বাড়িতে যাতায়াত করতো তাও এই প্রথম জানা গেলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার প্রধান কাজ হলো আর্থারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া।

—তুমি পাঁচটার সময় একবার এসো না। বললো সে।

— তোমাতে-আমাতে লাঞ্চ খাই এসো না ?

—অত্যন্ত দুঃখিত আমি। একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি।

—ঠিক আছে। তাহলে পাঁচটার সময়ই ফিরবো।

মাথা হেলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো আর্থার। সুসি মার্গারেটের চিরকুটটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো—ব্যাপারটার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে মনে মনে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন ভীতিজনক মনে হচ্ছে। মার্গারেটের ঘরে ঢুকলো সুসি. সবই আছে সেখানে, যেখানে যা থাকার। ঘরের মালিক বাইরে গেছে মনেই হয় না। একদিকে দৃষ্টি পড়লো, কখানা চিঠি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ মনে পড়লো সুসির, মার্গারেট কিছু পোশাক কিনেছিলো হালে এবং সেগুলো বাড়িতে না রেখে পোশাকের দোকানেই পাঠিয়ে দিয়েছিলো। অজুহাত—বাড়িতে স্থানাভাব।

সুসি বেরিয়ে এলো। পারিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলো মার্গারেট কোথায় গেছে তার জানা আছে কিনা।

—ব্রিটিশ দূতবাসে যেতে বললো তো কোচম্যানকে মাদামোয়াজেল। বৃদ্ধা জানালো।

শেষসন্দেহের রেশটুকুও মুছে যাচ্ছে সুসির মন থেকে। পোশাকের বাক্স তাহলে লগেজের অফিসে পাঠানো হয়ে গেছে!

—টাকা না পেয়ে নিশ্চয়ই মাল ছেড়ে দাওনি তোমরা ? কৌতূহলের গলায় বললো সুসি।

পোশাকী মহিলা হেসে উঠলো,—সমস্ত টাকাই দু'তিন দিন আগে মিটিয়ে দিয়েছে মাদামোয়াজেল।

সুসির মনে রাগ জমলো, ঘৃণায় তিক্ত হলো—মার্গারেট শুধু আর্থারের পয়সায় কেনা বিয়ের পোশাকই নিয়ে যায়নি। তার টাকা দিয়ে বিলও মিটিয়েছে। মিসেস ব্রুমফিল্ডের বাড়ির দিকে এবার চললো সুসি। ব্রুমফিল্ড তার খোঁজ-খবর না নেওয়ার জন্যে কপট তিরস্কার জানাতে সুসি বলে উঠলো,—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম তাই খবর নেওয়া হয়নি, এজন্যে ক্ষমা চাইছি মার্গারেট তো দেখাশোনা করছিলো, তাই...

—গত তিন সপ্তাহ মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। অথর্ব বৃদ্ধা ক্ষোভের গলায় বললো।

—দেখাই হয়নি ? প্রায়ই আসতো জানতাম—

ব্যাপারটায় আদৌ গুরুত্বের নয় এমন গলায় কথা বলছে সুসি। এ'কদিন সন্ধ্যেগুলো কোথায় কাটিয়েছে মার্গারেট জানতে ইচ্ছে করে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তার আগমন নয় বোঝাতে কিছুক্ষণ বৃদ্ধার সঙ্গে কাটাতে হলো সুসির। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা দূতবাসে উঠলো গিয়ে সে। তার শেষ সন্দেহের রেশ মুছে গেলো। এখন শুধু বাড়ি ফিরে অপেক্ষা—আর্থারের। ডাক্তার পোরোয়ের কাছে গিয়ে একবার তার নির্দেশ প্রার্থনা করে ভাবলো সুসি, আর সে যদি তার সঙ্গে স্টুডিওতে ফিরে আসতেও চায়, তাতেও ফল হবে না কিছু। আর্থারের সঙ্গে একাই মুখোমুখী হতে হবে তাকে। মানুষটার যন্ত্রণার কথা ভেবে তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো...ওর প্রতি সুসির দুর্বলতা যে অনেক কালের—

স্টুডিওতে বসে রইলো সুসি, সময় গুণে চলেছে। তিক্ত ভাবনা মনে, আর্থার মার্গারেটের দেখা পাবে বলে অন্তত ঠিক সময়ে আসার চেষ্টা করবে।

সকাল থেকে একবারই কিছু খেয়েছে সে, ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। নিজে চা করে নেবে তাও পারছে না।

শেষে এলো সে। উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে তার মুখে,—মার্গারেট ফেরেনি এখনো?

নির্ভেজাল বিস্ময়ে ছড়িয়ে তার চোখে।

—বসবে না? বিচিত্র গলায় প্রশ্ন করলো সুসি। সে বৈচিত্র্য ধরা পড়েনি আর্থারের কাছে; তার চোখে যে সুসি তাকিয়ে নেই তাও নজরে পড়েনি তার।

—তুমি বড্ড অলস। চা-টা পর্যন্ত করে নিতে পারো নি?

—বারডন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে, এবং সেটা অবশ্যই তোমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক—

সুসির গলার কর্কশতা এবার কানে ধরা পড়লো আর্থারের। লাফিয়ে উঠে পড়লো সে—হাজারো কল্পনায় ছেয়ে গেছে তার মন; মার্গারেটের সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গিয়ে থাকবে। সে অসুস্থ ছিলো—আতঙ্কে কথা সরলো না মুখ দিয়ে আর্থারের।

অন্ধ মানুষের মত হাতদুটো বাড়িয়ে দিলো সে, সুসিকে কষ্ট করে কথা বলতে হচ্ছে। গলা ধরে গেছে তার—পারছে না সে। কান্না ঝরলো তার গলায়। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মত কেঁপে উঠলো তার সমস্ত শরীর।

সুসি তার দিকে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিলো।

—কি ব্যাপার? শূন্য দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলো আর্থার। সুসি জানালো সারাটা দিন কি করেছে সে—কোথায় কোথায় গেছে,—তুমি যখন ভেবে চলেছো মার্গারেট মিসেস ব্লুমফিল্ডের কাছে যাচ্ছে নিয়মিত সে ওই সময়টুকু ওই লোকটার সঙ্গে কাটিয়েছে। সযত্নে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করেছে। সুপরিকল্পিতভাবে—

আর্থার বসে পড়লো। মাথাটা হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে সুসির দিকে পেছন ফিরে বসেছে সে, তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না সুসি কিছুসময় কাটলো সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে। আর সহ্য করতে

পারছে না সুসি, চোখ দিয়ে জল ঝরে চললো ওর। এই মানুষটার মনোকষ্ট তীব্রতর হচ্ছে বুঝলো সে, তার মনকেও ছুঁয়েছে তার যন্ত্রণা, কারণ আর্থারকে তো সে ভালোবাসে—তবু, তার সাহায্যে নিজেকে লাগাতে পারছে না। রাগে তার শরীর খাক হয়ে যাচ্ছে মার্গারেটের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হচ্ছে তার···

—ওঃ, কি লজ্জা। তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে মেয়েটা, জঘন্য প্রতারণা—হৃদয়হীন, শয়তানী। নোংরামিতে ভরা—

আর্থার দ্রুত ঘুরে মুখোমুখি হলো সুসির, কঠোরস্বরে বলে উঠলো,—ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে নিষেধ করছি তোমাকে।

অস্ফুট আওয়াজ উঠলো সুসির গলা থেকে। আর্থার কোনো-দিনই এত রূঢ়গলায় কথা বলেনি তার সঙ্গে। তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলো সুসি,—ওকে এখনো ভালবাসতে পারো তুমি, এই জঘন্য প্রতারণার পরও? গত একটা মাস ধরে ওই লোকটা ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আমরা তার সম্পর্কে যা বলেছি সব শুনেছে শয়-তানীটা। হ্যাডোকে ঘৃণা করে -এই ভাব দেখিয়েছে সে সমস্ত সময়টুকু—তোমার সঙ্গে বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি ঠাণ্ডামাথায় সেরেছে—মিথ্যের বেসাতি করছে সে দিনের পর দিন, অথচ তুমি —তুমি তাকে বিশ্বাস করে গেছো, অবিচল থেকেছো তোমার ভালবাসায়। তোমার কাছে সে ঋণী—সব দিক থেকে। তোমার পয়সায় সে চারটি বছর কাটিয়েছে। এখানে আসতে পেরেছে তোমারই সাহায্যে, তার প্রতি প্রস্থ পোশাক তোমারই অর্থে কেনা—

—আমাকে সে যদি ভালবাসতে না পেরে থাকে, তাতে আমার কিছু করার ছিলো না—করুণ গলায় বলে উঠলো আর্থার।

—তবু, ভালবাসার অভিনয় করেছে সে দিনের পর দিন—লজ্জার সীমা নেই। কোনো ক্ষমা নেই তার—

বিষণ্ণ চোখে তাকালো আর্থার তার দিকে, আস্তে,—ওঃ, এত নিষ্ঠুর কি করে হতে পারো তুমি? দোহাই তোমার—আরও জটিল করে তুলো না সব, আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

অবর্ণনীয় জ্বালা আর্থারের গলায়। যন্ত্রণার শেষ পর্যায়ে যেন পৌঁচেছে সে, ভেঙ্গে পড়েছে। হাতদুটো দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো সে, ফুঁপিয়ে উঠলো। সুসির বিবেকে দংশন হানলো তার এই অবস্থা, —আমি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আর্থার। ওইসব ঘৃণ্য কথা বলতে চাইনি আমি—তোমার ওপর এত নির্দয় হতে চাইনি—আমার বোঝা উচিত ছিলো তুমি কি অপরিসীম ভালবাসার নিগড়ে বাঁধা—

আর্থার নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, সে প্রচেষ্টা প্রাণান্তকর। সুসিও যেন সে যন্ত্রণার অংশীদার। ইচ্ছে করছে তার আর্থারের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে সে,—আত্মসমর্পণ করে। তার হাতটা ধরে ছুঁইয়ে দেয় তার ঠোঁটে, কিন্তু জানে সে—আর্থারের কাছে তো তার পরিচয় একটাই; মার্গারেটের বান্ধবী সে···

আর্থার উঠে পড়লো এক সময়ে, পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরলো তাতে, নিঃশব্দে। তার ভয়ঙ্কর চেহারায় চোখ পড়তে সুসি ভয় পেয়ে গেলো। এই প্রথম—আর্থারের চোখে এইদৃষ্টি। পড়ছে সে। ওই কঠিন চোখের আড়ালে যে জ্বালার অবিশ্রাম প্রতিক্রিয়া চলেছে, তার ভাবনা সুসির মনকেও আচ্ছন্ন করেছে—কিন্তু এই অব্যক্ত বেদনার প্রতিফলন কল্পনাও করেনি সে। আরও ভয়াল হয়ে উঠলো আর্থারের মুখে—তাকিয়ে থাকা যায়না সে চোখে,—আমি বিশ্বাস করি না, করতে পারি না—

দরজায় আঘাত পড়লো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আর্থারের মুখ থেকে চকিত আওয়াজ বেরিয়ে গেলো,—ও হয়তো ফিরে এসেছে

দ্রুতপায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দিলো আর্থার, প্রত্যাশায় মুখটা উজ্জ্বল তার। ডাক্তার পোয়রোয়ে ঢুকলো,—কি খবর সব? ব্যাপার কি?

পোয়রোয়ে দুজনের চোখেই তাকালো, হতাশা ছড়িয়ে তাদের দৃষ্টিতে,—মিস মার্গারেট কোথায়? আমি তো ভাবলাম পার্টি দিচ্ছো তোমরা।

ওর কথার ধরণে এমন কিছু ছিলো যা সুসিকে তার কারণ

সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করেছে।

আজ সকালে এই টেলিগ্রামটা পেয়েছি হ্যাডোর কাছ থেকে—পকেট থেকে টেলিগ্রাম বের করে বাড়িয়ে দিলো সুসির দিকে। সুসি সেটা পড়ে আর্থারের দিকে বাড়িয়ে দিলো: পাঁচটায় স্টুডিওতে এসো। আনন্দের ব্যাপার আছে।

অলিভার হ্যাডো।

—হ্যাডোর সঙ্গে মার্গারেটের আজ সকালে বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা ইংল্যাণ্ডে চলে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। শান্তগলায় বললো আর্থার।

সুসি সংক্ষেপে সব জানিয়ে দিলো ডাক্তারকে। ডাক্তার বিস্মিত, ব্যথিতও,—কিন্তু এসবের ব্যাখ্যা কি?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিলো আর্থার, ক্লান্ত গলা তার,—আমার চাইতে হ্যাডোর প্রতিই তার দুর্বলতা ছিলো বেশী, বোধহয়। ফলে, বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে এ'ভাবে চলে যাওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। যন্ত্রণাদায়ক কিছুর হাত থেকে নিস্তার পেতেই হয়তো তাকে—

—শেষ কখন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে? ডাক্তার থামিয়ে দিলো তাকে।

—গতকাল বিকেলটা একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা।

—এরকম কোনো ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে তার কোনো ইঙ্গিতই দেয়নি সে?

আর্থার মাথা ঝাঁকালো।

—ঝগড়াঝাঁটি হয়নি কিছু?

—আমরা কখনো ঝগড়া করিনি। অত্যন্ত প্রাণবন্ত মনে হয়েছে তাকে। এত প্রফুল্ল কখনো দেখিনি ওকে। লণ্ডনে আমার বাড়িটা কেমন হবে, তাই নিয়ে কথা হয়েছে সারাক্ষণ। কোথায় বেড়াবো বিয়ের পর সে সম্বন্ধেও।

আর্থারের মুখটা আরও যন্ত্রণাহত হলো এসব বলতে গিয়ে।

মার্গারেটের ঠোঁটের উষ্ণ ছোঁয়ার রেশ এখনো তার ঠোঁটে লেগে। নিদ্রাহীন সুখস্বপ্নে বিভোর থেকেছে সে গতরাতটা, কারণ এই প্রথম অনুভব হয়েছে তার—মার্গারেটের কামনা তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।

—আমি নিশ্চিত ছিলাম সে আমাকে ভালবাসে।

সুসির চোখে কিন্তু হ্যাডোর সহানুভূতিহীন বার্তাটার ওপর মেলা, তার বিদ্রূপেভরা হাসিও কানে বাজছে ওর।

—মার্গারেট অলিভার হ্যাডোকে ঘৃণা করতো—অন্তহীন সে ঘৃণা। একধরণের প্রতিক্রিয়া—যা পশুদের ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। সেই অবস্থা থেকে গভীর প্রেমে রূপান্তর ঘটে কিভাবে, যার ফলে এমন প্রণয়ের বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম হতে পারে?

—ওর প্রতি অবিচার করা উচিত নয় আমাদের—হ্যাডোর কথা বলছি। যৌবনে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজের নজির রেখেছে সে, লোকটা নির্বোধ নয়। ওর অস্বাভাবিক কার্যকলাপ আমাদের মত সবাইকে হয়তো বিরক্তি উৎপাদন করেনি। সদ্বংশজাত, ধনীপুত্র—মার্গারেটের সঙ্গে বেমানান হবে না।

সর্বরকম চেষ্টা চালিয়েছে সে মার্গারেটের পক্ষে অজুহাত খুঁজে বের করতে। তবু, মেয়েটাকে ওই মানুষটার বাহুবন্ধনে কল্পনা করতে শিউরে উঠেছে সে।

—হয়তো এসবের কোনো ভিত্তি নেই। ফিরে আসবে হয়তো ও।

—ফিরে এলে ওকে গ্রহণ করবে তুমি? সুসি প্রশ্ন করলো।

—তোমার কি মনে হয় এমন কিছু করবে সে যাতে আমার তার প্রতি ভালবাসার ভাঙ্গন ধরাতে পারবে? এ সবকিছুরই কারণ আছে। গোড়া থেকেই এটা অনিবার্য মনে হয়েছে আমার।

ডাক্তার পোরোয়ে উঠে ঘর পেরিয়ে হেঁটে গেলো,—যদি কোনো স্ত্রীলোক আমার এ ধরণের ক্ষতি করতো, তার প্রতিহিংসায় আমি শুধু হ্যাডোর নিষ্ঠুর থাবার কথাই কামনা করতাম।

—আহা বেচারা, ও সুখী যদি ভাবতে পারতাম। ওর ভবিষ্যৎ

আমার কাছে এক ভীতিজনক চিত্র।

—হ্যাডো টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, মার্গারেট জানে কিনা কে জানে! সুসি যেন আপন মনে বলে উঠলো।

—তাতে কি এসে যায়?

আর্থারের দিকে ফিরলো সুসি, গম্ভীর,—সেদিনের কথা মনে পড়ে তোমার? হ্যাডো যেদিন মার্গারেটের কুকুরটাকে লাথি মেরেছিলো, আর তারপর তুমি তাকে মারলে? পরে, যখন সে ভাবছে কেউ তাকে দেখছে না, আমি তার মুখটা লক্ষ্য করেছিলাম। এমন বিদ্বেষভরা ঘৃণার ছাপ আমার চোখে পড়েনি কখনো। শয়তানের প্রতিমূর্তি যেন তা। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করলো যখন সে, তার চোখে এক নিষ্ঠুরতার ঝিলিক দেখেছি—বিভৎস সে দৃষ্টি। আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, জিঘাংসার প্রতিফলন দেখেছি আমি হ্যাডোর চোখে। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। পরে লোকটা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ক্রমে, ভুলেও গেছি তার কথা। কেন ডাক্তার পোরোয়েকে আজ পাঠালো এখানে, কে জানে! দুর্দশার কথা ডাক্তার শুনবে পরে, আর আজ এই বিজয়ের ক্ষণে সে উপস্থিত থাকবে—তাই চেয়েছে হয়তো সেই দিনই, সেই মুহূর্তে সে তার মনস্থির করে ফেলে—এই নারকীয় পরিকল্পনা তার মাথায় খেলে।

—এই জঘন্য ব্যাপারটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে কি করে ভাবলো সে? আবার প্রশ্ন করলো।

—মিস বয়েডের কথাই ঠিক হয়তো, ধরো—ও তোমার শারীরিক ক্ষতি আর করতে পারবে না যদি ভেবে থাকে, তাহলে একটাই রাস্তা খোলা ছিলো তার—তোমার মনের সুখ কেড়ে নেওয়া। মার্গারেটকে তোমার জীবনসঙ্গিনী করাই একমাত্র লক্ষ্য এটা জেনেছে সে। তাই তাকে শুধু সরিয়েই দেয়নি। নিজে বিয়ে করেছে তাকে। আর, এটা করতে মার্গারেটের মনকে বিষিয়ে তুলতে হয়েছে অলিভার হ্যাডোকে—মেয়েটার সমস্ত সত্বাই হয়তো দলিত, তার ব্যক্তিত্বকেও

হত্যা করা হয়েছে।

—বুঝতে পারছি। মার্গারেট নেই। শয়তান তার শরীরে ভর করেছে।

—ব্যাপারটা সত্যিই সম্ভব কি, ভাষায় অলঙ্কার তো দিচ্ছো।

আর্থার আর পোরোয়ে দুজনেই সুসির চোখে তাকালো, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তাদের।

—মার্গারেট যে এরকম কিছু করবে ভাবাই যায় না। সুসি বলে চললো। যতই ভাবছি ততই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এতদিন পরিচয় মেয়েটার সঙ্গে, প্রতারণা করতে পারে সে ধারণার বাইরে। সৎ, নম্রস্বভাবের মেয়েটা। প্রথমটায় আমার কাছেও এটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে। তবু, ওকে ক্ষমা করা যায়—ও স্বাভাবিক অবস্থায় এটা নিশ্চয়ই মেনে নেয়নি।

আর্থারের হাত দুটো মুঠো হয়ে এলো,—তাতে ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করে তুলছে কিনা জানি না। হ্যাডো যদি তাকে বিয়ে করে থাকে, তা একমাত্র আমাকে জব্দ করার জন্যে—তাকে ভালবেসে নয়। লোকটা কত নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন তা তো জানি আমরা।

—ডাক্তার পোরোয়ে অবশ্য সেটার পরিচয় আরও বেশী পেয়েছেন। হ্যাডো কি তবে মার্গারেটের মনটাকে তার ইচ্ছাধীন করেছে—তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ হরণ করে? সুসি প্রশ্ন করলো।

—কি করে বলবো? অসহায় ডাক্তার বলে উঠলো,—এ রকম সব ব্যাপার ঘটে বলে শুনেছি। পড়েওছি, তবে প্রমাণ পাইনি। সবটাই ধাঁধাঁ—আধার বিচিত্র সমস্ত ব্যাপারের অবতারণা করে। আর্থার বিজ্ঞানের মানুষ, কাজেই সম্মোহনের সীমা পরিসীমার ব্যাপার অজ্ঞাত নয় তার।

সুসি কিছু পরে বললো,—হ্যাডো কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারী, যা সবাইকার নেই। তার যে ভান দেখলাম সেদিন তার মূলে সত্যতা থাকতেও পারে।

আর্থার ক্লান্তহাতটা কপালে বুলিয়ে নিলো,—আমি বিভ্রান্ত, ভেঙে পড়ছি। কিছু ভাবতে পারছি না। এখন, মুহূর্তে মনে হচ্ছে সবই সম্ভব। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি সব কিছুর ওপর—

খানিক্ষণ নিস্তব্ধ কাটলো। মার্গারেট যেখানটায় বসতো সেই দিকে তাকিয়ে আছে আর্থার; ইজেলে এখনো অসমাপ্ত ছবির ক্যানভাস পড়ে।

ডাক্তার পোরোয়ে এবার কথা বললো,—মিস বয়েডের কথায় যদি কোনো সত্যতা আছে ধরে নিই—তাহলে তাতে তোমার কি কাজ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। করার কিছু নেই তোমার। আইনগত বা অন্য কোনো কিছুরই। মার্গারেট স্বাধীন মেয়ে—সে এই লোকটাকে বিয়ে করেছে। অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে একটা তরুণ চিকিৎসককে বিয়ে না করে নির্ভেজাল এক পুরুষকে বিয়ে করাটা অনেক বেশী লাভের। ওর চিঠিতে জবরদস্তির কোনো ছাপই নেই। স্বেচ্ছায় সে মানুষটাকে বিয়ে করেছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়না সে।

ডাক্তারের কথা অবিশ্বাস্য নয়, কাজেই কেউই সাড়াশব্দ করলো না।

আর্থার উঠে দাঁড়ালো,—সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

—কোথায় যাচ্ছো? সুসি বললো।

—প্যারিস থেকে দূরে কোথাও সরে যাবো ভাবছি। এখানে থাকলে পুরণো সব কথা মনে পড়বে। কাজে ফিরে যেতে চাই

নিজেকে ফিরে পেতে চায় সে। চোখমুখে বিষাদের ছাপ ছাড়া মোটামুটি শান্ত মনে হচ্ছে তাকে। সুসির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

—তুমি সব ভুলে যাবে, এটুকুই আশা আমার। সুসি কোনোরকমে জিজ্ঞেস করতে পারলো।

—ভুলতে তো চাই না। মাথাটা ঝাঁকালো আস্তে আর্থার।

—মার্গারেটের খবর হয়তো পাবে। এখানে যা ফেলে গেছে তার খোঁজ

করবে হয়তো সে। চিঠিও লিখবে তোমাকে হয়তো। একটা কথা তোমাকে বলতে বলবো তাকে, তার প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কখনো ভৎর্সনাও করবো না ওকে। তার জন্যে কোনোদিন কিছু করতে পারবো কিনা তাও জানি না, তবে, ও জানুক—আমি তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

—আমাকে চিঠি দিলে জানাতে চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই। সুসি গম্ভীর।

—বিদায় তাহলে।

—কিন্তু কালকের আগে তো লণ্ডন যাচ্ছো না তুমি, সকালে দেখা হবে নিশ্চয়ই?

—খুলেই বলি তোমাকে। এখানে আর ফিরবো না আমি। এসবে আমার বিস্তর অস্বস্তি হয়।

আর্থারের চোখে বিষণ্ণতা নামলো। সুসির মনে হলো এক অমানুষিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সে নিজেকে সংযত রাখতে। একমুহূর্ত ইতস্তত করলো সে,—তোমার সঙ্গে কি আর কোনোদিনই দেখা হবে না?

—আমারও খারাপ লাগছে। তোমার অন্তরে কত দয়া, কত ভালো তুমি—তা তো জেনেছি। মার্গারেটের বান্ধবী হিসেবেও ভুলতে পারবো না তোমাকে। লণ্ডনে গেলে খবর দিও।

আর্থার বেরিয়ে গেলো। ডাক্তার পায়চারী করে চলেছে, হাত-দুটো তার পেছনের দিকে ধরা। শেষে সুসির দিকে ফিরলো,—

—একটা ব্যাপারে ধাঁধাঁ লাগছে আমার—হ্যাডো ওকে বিয়ে করলো কেন?

—আর্থারের কথা তো শুনলে, তিক্তগলায় বলে উঠলো সুসি,—যাই ঘটুক না কেন, সে ওকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। আর ওই লোকটা ভেবেছে একমাত্র বিয়ের বাঁধনেই তাকে ধরা যাবে।

ডাক্তার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিলো শুধু। পরে সেও বেরিয়ে গেলো। সুসির চোখ বেয়ে অঝোরে জল নামলো, নিজের জন্যে নয়—

আর্থারের বেদনা স্পর্শ করেছে তাকে।

পরের দিনই লণ্ডনে ফিরে গেলো আর্থার। সুসিও নির্জন স্টুডিওতে বসে থাকতে পারছে না। ইতালী যাবার একটা আমন্ত্রণ পেলো সে, শীত কাটাবার আমন্ত্রণ। ডাক্তার প্যারিসে থেকে গেছে, সঙ্গে তার বই আর ইন্দ্রজাল।

সুসির যাত্রা চলেছে, টাসকানি, অস্ট্রিয়া হয়ে পরিক্রমা চলেছে তার। মার্গারেটের চিঠি পায়নি সে, তার জিনিষপত্র মার্গারেটের এক বান্ধবীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে সুসি। নিজে চিঠি লিখবে তাও ইচ্ছে হয়নি। আর্থারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তার উত্তরে জানিয়েছে আর্থার—তার হাতে এখন নাকি অনেক কাজ, সেন্ট লিউকসে একপ্রস্থ বক্তৃতামালার আয়োজন হয়েছে, নতুন করে দেবে বক্তৃতা সে। অন্য এক হাসপাতালে পরিদর্শক চিকিৎসক হিসেবে যোগও দিয়েছে। প্র্যাকটিসও বেড়েছে। মার্গারেটের কোনো উল্লেখ নেই। ছোট্ট চিঠি।

বারদশেক পড়লো চিঠিটা সুসি। কিন্তু কিছুই বুঝলো না। আর্থারের মনের হদিস মিললো না তাতে। সুসি আর তার সঙ্গী রোমে কিছুদিন কাটাবে ঠিক করলো। বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে; হ্যাডো ও তার ঘরণী মিললো সেখানে। সেখানে বেশ কিছুদিনই কাটিয়েছে তারা, মনে হলো। কারণ সেখানকার ছোট্ট ইংরেজগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে তাদের খামখেয়ালীপনা আলোচ্য হয়ে উঠেছে। প্রতি বিকেলেই তারা নাকি পিঁসিওতে বেড়াচ্ছে গাড়ি করে। হ্যাডোর পোশাকই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি, মার্গারেট তার সৌন্দর্যে। প্রতি রাতে মার্গারেটকে দেখা যায় অপেরাতে দামী আসনে বসে আছে। সারা গায়ে হীরের জেল্লা। হ্যাডোর ভাবে মানুষ বিরক্ত যদিও—ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধও—তবু তার বিত্তে মুগ্ধ। মাঝখানে আবার ওরা হয়েছে উধাও, কাউকে না জানিয়েই। সব জায়গায় টাকাও দেওয়া হয়নি—তবে, সুসি জেনেছে, পরে সেগুলো মেটানো হয়েছে।

শেষে মন্টি কার্লোতে আছে ওরা জানা গেলো।
—ওদের সুখী মনে হলো? সুশ্রি তার বাচাল সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করেছে, সব শুনে।
—মনে হলো। যাই হোক, মিসেস হ্যাডো যেন সব পেয়েছে—নারীর যা কিছু চাইবার; অর্থ, সৌন্দর্য; ভালো পোশাক, অলঙ্কার। সুখী না হলে তাকে অবিবেচক মানুষ বলতে হয়।

বসন্তের শেষসময়টুকু সুসি রিভিয়েরাতেই কাটিয়ে দেবে ঠিক করলো। কিন্তু, হ্যাডো সস্ত্রীক আছে সেখানে জেনে দ্বিধাগ্রস্ত হলো; ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ব্যাপারটা মনঃপূত নয় তার—তবু, কেমন চলছে তাদের—জানবার এক অদম্য আগ্রহ পেয়ে বসেছে তাকে। মনে শুরু হল দ্বন্দ্ব, কৌতূহল আর অনাগ্রহের। জয়ী হলো কৌতূহলই শেষ পর্যন্ত। সঙ্গীকে রাজী করালো—বিউলিউ—এর বদলে মন্টি কার্লোতে যাবার প্রস্তাবে।

গুজব জোর, তাই শুধু কান খোলা রাখা। ওই বিচিত্র জায়গায়, যেখানে শুধু বিত্তের আস্ফালন, শুধু অশুভর ইঙ্গিত চারপাশে; সব কিছুই মত্ত, ফ্যান্টাস্টিক—মর্বিড, হ্যাডোর উপযুক্তই হয়েছে জায়গা। টেবিলে তাদের আলোচনার জন্যে কুড়িয়েছে কুখ্যাতি, সেই সঙ্গে সৌভাগ্যও পরে সুসি আবিস্কার করেছে তাদের, অদৃশ্য যদিও সে তাদের কাছে। মার্গারেট খেলছে। হ্যাডো তার পেছনে দাঁড়িয়ে, নির্দেশ দিচ্ছে। গম্ভীর মনোযোগের ছাপ ছড়িয়ে, তাদের চোখমুখে।

সুসি কিন্তু কেবল মার্গারেটকেই দেখছে। চিনতে অসুবিধে হচ্ছে মেয়েটাকে, একদা সহচরী মার্গারেটকে আর এক নতুন জিনিষ চোখে পড়েছে তার মার্গারেটের চোখমুখের সঙ্গে অলিভার হ্যাডোর এক অদ্ভুত মিল—অভিব্যক্তির। তার অনবদ্য সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে এক পাপেভরা দৃষ্টি, যা হ্যাডোর চোখে পড়েছে সুসি। অনেক টাকা জিতেছে তারা সে সন্ধ্যায়। অনেক মানুষও দেখেছে সে খেলা। সবসময়েই যেন তারা এই ভাবেই খেলে, মনে হলো

স্যুসির—মার্গারেট বাজী ধরে চলেছে, হ্যাডোর' নির্দেশেই। কখন থামতে হবে তাকে তারও নির্দেশ আসছে হ্যাডোর কাছ থেকে। দুটি ফরাসী লোককে মার্গারেটের সম্পর্কে আলোচনা করতেও শুনলো স্যুসি। কান খাড়া করলো স্যুসি, ওদের মধ্যে একজনকে মার্গারেটের সম্পর্কে একটা অশালীন মন্তব্য করতে শুনে লজ্জা পেলো নিজেই সে। অন্য লোকটা হেসে উঠলো,—ধুর! অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

—আহা বলছি—এর প্রতিটি কথাই সত্যি। ছ'মাস হলো বিয়ে হয়েছে ওদের, ভদ্রমহিলা শুধু নামেই স্ত্রী ওর। লোকটা সৌভাগ্য বহনকারী হিসেবেই দেখে মহিলাকে।

দুজনেই ওরা হেসে উঠেছে। তাদের আলোচনা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে স্যুসির গাল পুড়েছে। কিন্তু যা শুনলো তাতে মার্গারেটকে আরও বেশী করে দেখছে সে। প্রাণোচ্ছল মার্গারেট। এক রহস্যময় গন্ধের স্বাদ মিলছে তার সৌন্দর্যে। দারুণভাবে সেজেছেও। বহুমূল্য হীরগুলো কেমন বেমানান এই পরিবেশে।

শেষে, হ্যাডো টাকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে মার্গারেটের কাঁধে হাত রাখলো। উঠে পড়লো মার্গারেট। তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলো একটি মহিলা, প্রসাধনে রাঙা, কুখ্যাতি আছে এমন একজন। স্যুসি বিস্মিত হলো—মার্গারেট মেয়েটার পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানালো তাকে।

স্যুসি আরও জেনেছে। অল্প ইংরেজকেই চিনে তারা, এবং এমন মানুষদেরই—যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ নয়। বিদেশী মানুষ, যাদের বিত্ত আর খামখেয়ালী পাল্লা দিয়েছে—তাদেরই যেন পছন্দ ওদের।

বহু মানুষের সঙ্গে দেখা গেছে পরে ওদের, কখনো রুশ গ্র্যাণ্ড ডিউকের অতিথি হতে, কখনো দক্ষিণ অ্যামেরিকার মহিলাদের আতিথ্যে, বহুমূল্য অলঙ্কার সজ্জিতা—খানদানী বাজী-ধরিয়ে সব। বাজারে কুখ্যাতি আছে এদের। গুজবও বেড়ে চলেছে। এই বিচিত্র সমাজেই চলাফেরা চলেছে মার্গারেটের উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরেদের

ভীড়ে। সুসি যে কথাগুলো শুনেছে মেয়েটার সম্পর্কে, তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখানে সেখানে। আর এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মন্টি কার্লোর আঁধারে ঘেরা বৈঠকখানায় বিচিত্র ভোজ-বাজীর প্রদর্শনী।

হ্যাডোর বিচিত্র মন থেকে বেরোচ্ছে খামখেয়ালীভরা কার্যকলাপের কৌশল। অনুষ্ঠান চলেছে সমানে। ছদ্মবেশের বৈচিত্র্যে ভরা পোশাক অনুষ্ঠানের পর্ব চলছে। পুরনো দিনের রহস্যময় অনুষ্ঠান···ভয়াবহ সমস্ত কার্যকলাপ চলতে থাকে সে বাড়িতে, জ্যোৎস্নাস্নাত চাঁদের আলোয়···প্রাচ্য পদ্ধতিতে। আশ্চর্য সব শক্তির অধিকারী নাকি হ্যাডো, কথিত। ইন্দ্রজালের বিচিত্রতর বিন্যাস ইতিবৃত্ত নাকি তার দখলে। জীবসৃষ্টির অলৌকিক শক্তিও নাকি তার নখদর্পণে বলে গুজব রটেছে।

হ্যাডো স্বনির্বাচিত নামে পরিচিতিও পেয়েছে; 'ছায়াভাই' (ব্রাদার অফ দ্য শ্যাডো)। যদিও বেশীর ভাগ মানুষই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার বর্ণনা করেছে। হ্যাডোর অহমিকায় তারা হয় ক্রুদ্ধ, না হয় মজা পেয়েছে, তবু তার সম্পর্কে আলোচনা করতে ছাড়েনি। পশুরাজ-শিকারী হিসেবে তার খ্যাতিও প্রসারিত দিকবিদিকে। অন্যান্য জীবজন্তুকুলের ওপর তার প্রভাবের কথাও সুবিদিত। অসুন্দর গল্পও ছড়িয়েছে তাকে ঘিরে। ভিয়েনার এক ক্লাব থেকে নাকি সে বহিষ্কৃত—তাস খেলায় অসদুপায়ের জন্যে। বিচিত্র সমস্ত ওষুধ গ্রহণের কুখ্যাতিও জড়িত। চারিত্রিক গুজব সোচ্চার। মার্গারেটের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটাও পরিস্কার নয় তাদের কাছে। এক এক সময় নাকি চরম নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটে তার। সুসি ভয় পেয়েছে এ'সব শুনে, কিন্তু মার্গারেটকে যে ক'বার দেখেছে সে, প্রতিবারই মেয়েটাকে খুসীর শীর্ষবিন্দুতে মনে হয়েছে তার। তবে, একটা কাহিনী তাকে বড় পীড়া দিয়েছে—রেস্তোরাঁতে খানাপিনা করার পর একটা মুদ্রার লেনদেন নিয়ে নাকি তীব্র বচসা হয় তার বেয়ারার সঙ্গে। মুদ্রাটি নাকি অচল। এবং পুলিস ডাকতে হয় মীমাংসার প্রয়োজনে। অভ্যাগতেরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

সুসির কাছে বিবৃত হয়েছে ঘটনা, আর ঝগড়া কালীন সময়টুকু মার্গারেট নির্বিকার ঔদাসীন্যে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত ছিলো।

একঘরে হয়ে গেলো হ্যাডো, সস্ত্রীক। আর পুলিসী ঘটনাও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বেশ কিছুটা। রোমে যা ঘটেছিলো, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো এখানেও, অদৃশ্য হয়ে গেলো ওরা আবারও।

বেশ কিছুদিন সুসি লণ্ডনের বাইরে ছিলো, বসন্তের সমাগমে তার বান্ধবীরা তাকে দেখে খুসী হবে ভেবে ফিরে যাওয়া ঠিক করলো। আর্থারের সঙ্গে দেখা করার জন্যেও মনটাও ব্যাকুল তার। তার জন্যে কোনো দুর্বলতা নেই লোকটার, তাও জানে সে। তবু আর্থারের সাহচর্য চায় সে। আরও সপ্তাহে তিনেক রইলো প্যারিসে সুসি—পোশাক কেনাকাটার প্রয়োজনে। লণ্ডনে ফিরে গেলো সুসি।

আর্থারকে চিঠি লিখলো সুসি, একটা রেস্তোরাঁতে আমন্ত্রণ জানিয়ে। বিরক্ত সে, বাড়িতে আরও বেশী ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলা যেতো। আর্থারের সঙ্গে মুখোমুখি হতে অবশ্য বুঝেছে সুসি, ইচ্ছে করেই এ' জায়গা বেছেছে আর্থার। চারপাশের মানুষ, আনন্দ-ঝরণা, বাদ্যের জোয়ার,—তাদের ঘনিষ্ঠ আলোচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। মামুলি কথাবার্তা চললো ওদের। আর্থারের পরিবর্তনে সুসি যথেষ্ট ভীত—বয়স অনেক বেড়ে গেছে যেন লোকটার, ওজন কমে গেছে; চুল সাদা হয়ে গেছে। সবচাইতে বেশী ভাবিয়েছে সুসিকে আর্থারের মুখচোখের পরিবর্তন—যন্ত্রণাজর্জর চোখের দৃষ্টি তার। চেহারা পাল্টে গেছে আর্থারের। তাকানো যায় না। অস্বস্তিবোধ শুরু হলো সুসির—বিচিত্র গলায় কথা বলছে আর্থার, অনেক দূর থেকে আসছে যেন সে গলা।

প্রথমটায় বুঝতে পারেনি সুসি। পরে উপলব্ধি করেছে, অনেক কষ্টে নিজে কি সংযত রাখার প্রয়াস চালিয়ে চলেছে

আর্থার। আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে—

তবু, আগের চেয়ে অনেক শান্ত আর্থার। সুসির সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুসী সে। তার বিদেশ ভ্রমণের খুঁটিনাটি খবর নিয়েছে। সুসি ক্রমে আর্থারকে তার কথায় ফিরে নেওয়ার চেষ্টা করলো। আর্থার বলে চললো, অনেক টাকা নাকি এখন রোজগার তার—পেশদারী বৃত্তিতেও হয়েছে প্রভূত উন্নতি। কঠোর পরিশ্রম করছে সে। ছুটো হাসপাতালের কাজ, পড়ানোর কাজ আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস; সব মিলিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত সে। শল্যচিকিৎসার ওপর একটা গবেষণার কাজও চালিয়েছে।

—এত কাজ করার সময় পাও কি করে তুমি? সুসি জানতে চেয়েছে।

—অল্পসময় ঘুমিয়ে কাজ সারতে পারি বলেই প্রায় ডবল সময় পাই। আর্থার অকপটে জানালো।

কথাশেষে মুখ নামিয়ে নিলো সে। নিজের যে কথা গোপন করতে চাইছে সে, তা বুঝি প্রকাশ হয়ে গেলো।

সুসিও তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে।

ওরা চুপ করে বসে রইলো, অনেকক্ষণ। চারপাশের মানুষ আনন্দমুখর, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তারা। এ' ধরণের জায়গা কেন নির্বাচন করতে গেলো আর্থার, বুঝে পায় না সুসি···

লাঞ্চ শেষে সাহস সঞ্চয় করে বলে উঠলো সুসি,—আধ ঘন্টার জন্যে আমার ফ্ল্যাটে আসবে? এখানে কথা বলা যাবে না।

অনিহার প্রতিফলন হলো আর্থারের চোখে, পালিয়ে যেতে চায় সে এ' সব থেকে যেন। তক্ষুনি কোনো উত্তর জোগালো না তার মুখে।

সুসি আবার বললো,—ঘন্টাখানিক। তোমার তো কিছুই করার নেই, আর—কথাও আছে আমার তোমার সঙ্গে।

—নিজেকে ঠিক রাখার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, কারোর দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ না করা। প্রায় ফিসফিস স্বরে বললো আর্থার।

লজ্জাও পেয়েছে যেন সে, এত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে বলে।

—তাহলে আসবে না ?

—না।

কি কথা ছিলো সুসির তার সঙ্গে তা আর বিশদ বলার দরকার নেই। আর্থার জানে, মার্গারেটের কথাই বলতে চায় সুসি। সুসি অনেক পরে কোনোরকমে বললো,—তোমার খবরটা মার্গারেটের কাছে পৌঁছনো যায়নি। আমাকে সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ ছিলো না তার।

এক অদ্ভুত পাশব দৃষ্টি এলো আর্থারের চোখে।

—মন্টি কার্লোতে অবশ্য তাকে দেখেছি আমি। ওর কথা শোনার আগ্রহ তোমার আছে, ভেবেছিলাম।

—তাতে কিছু লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার।

ব্যর্থ সুসি পরাজিত। কিছু পরে বললো,—তাহলে ওঠা যাক্ ?

—আমার ওপর রাগ করনি নিশ্চয়ই ?

তোমার ওপর রাগ কখনোই করবো না, মৃদু হাসলো সুসি।

আর্থার বিলের টাকা মিটিয়ে দিলো। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা এগোলো। দরজার কাছে পৌঁছে সুসি হাত বাড়িয়ে দিলো,—সবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে তুমি ভুল করছো। হাসি স্পষ্টতর হলো সুসির,—এতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে তুমি।

—না। তা কেন, বাইরেই তো থাকি বেশীর ভাগ সময়। কাজ থেকে সরে থাকি বেশ কিছু সময়। সপ্তাহে অন্তত দিন দু তিন অপেরায় যাই।

—বাজনার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো তোমার পছন্দ নয় বলেই তো জানতাম।

—তাই। তবে বিশ্রাম পাই তো।

পরিশ্রান্ত গলায় কথা বলছে যেন আর্থার। সুসির ভয় হলো এমন যন্ত্রণাজর্জর মানুষ তার নজরে পড়েনি সম্প্রতি।

—আমি তোমার সঙ্গে অপেরায় আসতে পারি না একদিন ? নাকি

আমার সঙ্গ বিরক্তিকর তোমার কাছে?

অত্যন্ত খুসী হবো, উজ্জ্বল হাসি ফোটালো আর্থার, ঠোঁটে,—ওয়াণ্ডার-ফুল তুমি—টনিকের মত। বিষ্যুধবার দিন ওরা 'ক্রিস্তান' দেখাচ্ছে, যাবে আমার সঙ্গে?

—স্বচ্ছন্দে। আর্থারের হাতটা একটুক্ষণ চেপে ধরে ছেড়ে দিলে সুসি, দ্রুতপায়ে উঠে পড়লো একটা ট্যাকসিতে।

—বেচারা! মনে মনে বলে উঠলো সুসি। বেচারা!

ওর জন্যে কি করতে পারি আমি!

মার্গারেটের মুখটা ভেসে উঠতে হাত দুটো আপনা থেকেই মুঠো হয়ে গেলো তার। এমন সরল একটা মানুষকে ঠকানোর জন্যে অভিশাপ দিলো সুসি তাকে—এজন্যে ওকে প্রতিফল পেতে হবে—বিড়বিড় করে বলে উঠলো সুসি, কণ্ঠস্বরে গরল তার—আর্থারের সমস্ত যন্ত্রণার অংশীদার হতে হবে তাকে!

কভেন্ট গার্ডেনের উপযোগী জামা-কাপড় পরেই বেরিয়েছে সুসি। সাজাই একমাত্র বিলাস তার। তাতে সিল্কের সবুজ তাকে আরও শ্রীমণ্ডিত করেছে। চুলে স্পেনীয় অলঙ্কার, গলায় হার আন্দালুনীর গীর্জার কোনো চিত্র স্মরন করিয়ে দেয়। বিষণ্ণ হাসলো সুসি—এসব কিছুই চোখে পড়বে না হয়তো আর্থারের।

স্কার্ট হাতে ধরে তরতরিয়ে নেমে ট্যাকসিতে উঠে বসলো সুসি, প্যারীসের উপযোগী হালচাল তার—ওরা চললো। কিছুক্ষণ স্পেনীয় পাখার হাওয়া খেয়ে—আয়নায় আড়চোখে দেখে নিলো নিজের মুখটা। লম্বা দস্তানা তার হাতে। আনকোরা দস্তানা। আর্থারের অমনোযোগ আর তার মাথাব্যথা নয় এখন।

অপেরায় পৌঁছবার পর তার মনটা প্রফুল্লতায় ভরে গেলো—বসন্তের নতুন ফোটা ফুলের মত বিকশিত মন তার। মহিলাদের দেখতে লাগলো সে দূরবীনের ভেতর দিয়ে গ্রাণ্ড টায়ারে ঢুকে আসন

গ্রহন করেছে তারা। কিছু লোকের নাম করলো আর্থার—পরিচিত সে সব নাম সুসির কাছে। আর্থার কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারছে না, এটা লক্ষ্য করছে সুসি। ক্লান্তি যেন তার চোখে মুখে আরও বেশী করে ছাপ ফেলেছে আজ।

বাদ্য শুরু হতে আর্থার যেন ভুলে গেলো কেউ তাকে লক্ষ্য করছে…টেনসান আর আবেগের দ্বন্দ্ব চলেছে, হাঁফাচ্ছে কখনো।

বিশ্রামের সময়টুকুও আর্থার রইলো তার আবেগের শিকার হয়ে। চুপচাপ বসে সে। সুসি বুঝলো—কেন সঙ্গীতের হাত-ছানিতে ভুলেছে আর্থার; যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে—

শেষ হয়ে এলো অপেরা—আইসোলডের কণ্ঠে শেষবারের মত তার অসুখের বিলাপ উচ্চারিত হতে আর্থারের অবস্থাও মন্দ হলো—এত ক্লান্তিবোধ হয়েছে তার, যে নড়তে পারছে না পর্যন্ত সে।

তবু, ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এসেছে তারা। গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে, ওদের এক যৌথ বান্ধব এগিয়ে এলো লোকটা আরবাথানট। চোখের ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ। রিভিয়েরাতে সুসির সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, এখন জানলো লোকটা সেন্ট লিউকসের হাসপাতালে আর্থারের সহকর্মীও। অবিবাহিত মানুষ আরবাথনাট। অর্থবান। সাদা চুলে আত্মতৃপ্ত মুখচোখ—লালছে আভায় সুখী মানুষ বলে বুঝতে কষ্ট হয় না তাকে।

ভালো প্র্যাকটিস লোকটার। খরচের হাতও আছে। মন্টি কার্লোতে থাকাকালীন দু'একবার সুসিকে লাঞ্চে আপ্যায়িত করেছে। নারীসঙ্গ ভাল লাগে আরবাথনাটের। সুন্দরীই হোক আর নষ্ট হোক সে মহিলা। সুসিকে মোটামুটি আকর্ষণের মনেও হয়েছে তার—আরবাথনাট দৌড়ে এগিয়ে এসেছে ওদের দেখে। হাতে হাত মিলিয়েছে। খুসী খুসী গলায় বলে উঠেছে,—আরে, যাদের দেখতে চাই—সেই মানুষই যে। আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন, নিষ্ঠুর মেয়ে? সুসির উদ্দেশে বললো সে শেষের কথাগুলো। তোমার চোখের অবস্থা নিশ্চয়ই সঙ্গীন—

—তোমার কি মনে হয়—তোমার মত দুঃসাহসী, দুষ্টু মানুষকে অপথালশো স্কোপ-এর মধ্যে দিয়ে আমার চোখে তাকিয়ে থাকতে দেবো আমি? সুসি হেসে বললো।

—শোনো, তোমাদের দুজনকেই আমার একটা উপকার করতে হবে। যথেষ্ট গুরুত্বের ব্যাপার—স্যাভয়তে একটা পার্টি দিয়েছি, কিন্তু দুজন অনুপস্থিত হয়েছে। আটজনের জন্যে নেওয়া টেবল, কাজেই—তোমাদের তাদের জায়গা নিতে হবে।

—আমাকে ফিরতে হচ্ছে।—কাজ আছে অনেক।

—ননসেন্স! বড্ড পরিশ্রম কর তুমি, একটু রিলাক্সেশনে উপকারই হবে তোমার! সুসির দিকে ফিরলো, এবার সে,—মানুষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তুমি আনন্দ পাও জানি। আমার পার্টিতে এমন একজন মানুষ আর ঘরণীকে পেয়েছি যারা তোমাদের যথেষ্ট থ্রিল জোগাবে —বিচিত্র মানুষ তারা। একটি সুন্দরী অভিনেত্রীকেও পাবে—সেই সঙ্গে দারুণ জীবন্ত, প্রাণে' ়ে মার্কিন মহিলাও একজন।

—নিশ্চয়ই আসবো। সি উত্তর দিলো, আর্থারের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টি তার,—সুন্দরী অভিনেত্রীদের চেয়ে আমার আকর্ষণ কম নয়, যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম—

আর্থার জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটালো। আমন্ত্রণ গ্রহন করলো সে। আরবাথনাট তার কাঁধে সশব্দে একটা চাপড় কষিয়ে দিলো। স্যাভয়তে দেখা হবার ব্যাপারে একমত হলো আর্থার।

—তুমি আসছো শুনে কি ভালো যে লাগছে। যেতে যেতে বললো সুসি,—জানো, ওখানে জীবনে যাইনি কখনো—উত্তেজনায় আমার হাঁপ ধরে গেছে!

—প্রত্যাখ্যান করাটা অন্যায় হয়েছিলো আর্থার, কেমন আত্মকেন্দ্রিক, পাশবিক হয়ে যাচ্ছি আমি। আর্থার ম্লানগলায় বললো।

সুসি পোশাক পাল্টে যখন বেরোলো, বাইরের ঘরে আর্থার বসে। দারুণ খুসি মেজাজে আজ সুসি,—আমার এই জামা তোমার ভাল লাগছে মানতেই হবে তোমাকে—কারণ, ছ' ছজন মহিলা ঈর্ষায়

কালচে মেরে গেছে এটা দেখে। আমি ফরাসীদেশের মানুষ বলে ধরে নিয়েছে ওরা, আর, ভদ্রঘরের নই তাও ভেবেছে নিশ্চয়ই।
—নিঃসন্দেহেই ভারী কম্প্লিমেন্টস। আর্থার কিছু না ভেবেই বলে বসলো।

আরবাথনাটও হাজির, ওদের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো—চলো, চলো। সবাই অপেক্ষা করছে। পরিচয় করিয়ে দেবো সবার সঙ্গে, পরে খানা।

ওরা বেরিয়ে পড়লো!

অলিভার হ্যাডো আর মার্গারেটের মুখোমুখি পড়লো ওরা।
—আর্থার বারডন, মিসেস হ্যাডো। বারডন সেন্ট লিউকসে আমার সহকর্মী। অ্যাপেণ্ডেকিসর হাত দারুণ ওর।

আরবাথনাট বলে চলেছে। আর্থারের মুখের দিকে দৃষ্টি নেই তার। ফ্যাকাসে মেরে গেছে আর্থার। ভয়ে সাদা মার্গারেটের মুখটাও। হ্যাডো কিন্তু তার ভারী চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলো, ঠোঁটে হাসি তার। ব্যাপারটা তার কাছে উপভোগ্য যেন,—বারডন আমাদের পূর্ব পরিচিত, পুরণো বন্ধু। সত্যি বলতে কি, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় ওরই সূত্রে। আর, মিস সুসি বয়েডের সঙ্গে শিল্পচর্চাও হয়েছে আমার, আত্মার অবিনশ্বরতা নিয়েও হয়েছে গভীর আলোচনা।

হ্যাডো তার মাংসল হাতটা বাড়িয়ে দিলো সুসির দিকে। সুসি ধরলো হাত। যথেষ্ট বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ক'দিনে, আর আজকের এই সাক্ষাৎকার যদিও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, স্বাভাবিকভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করলো সে।

মার্গারেটের সঙ্গেও হাত মেলালো সে।
—ওঃ! কি ডিসাপয়েন্টিং ব্যাপার রে বাবা। আরবাথনাট আক্ষেপের গলায় বলে উঠলো।—মিস বয়েডকে নতুন কিছুর সঙ্গে পরিচিত করবো ভেবেছিলাম, যাদুকরেরা যেভাবে করে—আর, দ্যাখো লোকটার সম্পর্কে সবই জেনে বসে আছে মেয়েটা!
—জেনে থাকলেও, আমার সঙ্গে কথা বলবে মনে হয় না। অলি-

ভারের ঠোঁটে একফালি বিদ্রূপমাখা হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

খানার ঘরে ঢুকলো ওরা।

—বসে পড়ি তাহলে আমরা? আরবাথনাট টেবিলের দিকে নজর বুলিয়ে প্রস্তাব দিলো।

অলিভার এবার আর্থারের দিকে ফিরলো, চোখ মটকে বললো, —আমার স্ত্রীর সঙ্গে বসতে দেওয়া দরকার বারডন সাহেবকে। ওরা পরস্পরকে অনেকদিন দেখেনি। অনেক কথা জমে আছে নিশ্চয়ই ওদের। হিহি করে উঠলো হ্যাডো,—আর, মিস বয়েডের সঙ্গে বসবো আমি, অনেক গালাগাল খেতে হবে তো।

আরবাথনাটের কাছে এই ব্যবস্থা আদর্শ মনে হলো, কারণ—সুদর্শনা অভিনেত্রীটি এবং অনন্যা মার্কিন মহিলাকে তার দুদিকে বসাবার সুযোগ মিলে গেলো। আনন্দে হাত দুটো ঘষে নিলো সে, —খানাপিনার ব্যাপারটা আজ দারুণ জমবে মনে হচ্ছে।

অট্টহাসি উঠলো হ্যাডোর গলায়। আর, স্বাভাবিকভাবেই পুরো আলোচনার ব্যাপারটাই তার কুক্ষিগত করে ফেললো। সুসিকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, হ্যাডোর মেজাজ আজ তুঙ্গে।

অনর্গল বকে চলেছে হ্যাডো। প্রচণ্ড উৎসাহে খানাপিনাও চালিয়েছে। সুসি নিজেকে সংযত রেখেছে। আর্থার কিন্তু নিশ্চুপ বসে। সুসি হাসিমুখে কথা বলছে, হ্যাডোর সঙ্গে তার পরিচিতি যেন বহুকালের। হাসছে সেও। তার মধ্যেই লক্ষ্য গেছে তার, দেখেছে হ্যাডোর পোশাকের পরিপাটি। কিন্তু তার ব্রোচ, ভেলভেট কলারওলা জামা, সাটিন ওয়েস্টকোটে ফরাসী কমিকচরিত্র মনে হচ্ছে তাকে।

এখন আরও কাছ থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছে সুসি। চুল অনেক কমে গেছে হ্যাডোর, চুলহীন টাকের ফ্যাকাসে রং কেমন বেমানান তার লাল মুখের সঙ্গে। আরও মোটাও হয়েছে। থুৎনির নীচে মাংস জমেছে। মেদবৃদ্ধিও হয়েছে শরীরে,—কেমন বেচপ মনে হচ্ছে তার চলাফেরা।

সারা শরীর জুড়ে চলেছে তার পরিবর্তন, আশ্চর্যভাবে। চোখে কিন্তু তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যুক্ত হয়েছে তাতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতি। মার্গারেটকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তার পোশাকেও হ্যাডোর প্রভাব প্রতিফলিত—আজব পোশাক। পরণের গাউনটা যেন বড় বেশী জমকালো। তার রুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যের সাথে কেমন বেমানান পোশাক।

সুসি কেঁপে উঠলো, মার্গারেটকে বারাঙ্গণা মনে হচ্ছে তার…

মার্গারেটও অনেক কথা বলছে; হাসছেও। সুসি বুঝছে না; এটা জোর করে আনছে সে, নাকি নির্বিকার ঔদাসীন্যে ঘটছে। কণ্ঠস্বরে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, তবু এত হাল্কা হওয়ার কথা নয় তার। হয়তো—হয়তো সে সুখী, দেখাতে চায় মার্গারেট।

খানাপিনা চলতে লাগলো, আলোকময় পরিবেশটা আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। সবাই স্ফূর্তিতে রয়েছে। গৃহস্বামীও মেজাজে। মজার গল্পও এক আধটা বলে হাসালো সবাইকে। অলিভার হ্যাডোর ঝাঁপি থেকেও বেরোলো কিছু। একটু বৈচিত্র্য ছিলো অবশ্য তার কাহিনীতে, আর—সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেও আর্থার যোগ দেয়নি তাতে।

মার্গারেট কিন্তু পানীয় খেয়ে চলেছে, গ্লাসের পর গ্লাস। হ্যাডোর কাহিনী শেষ না হতেই সেও যুক্ত করেছে একটা। ফারাক শুধু—হ্যাডোর কাহিনী সরসতায় সজীব—মার্গারেটের কাহিনী বিবৃত হয়েছে সরল ভাষায়।

অন্যেরা, বিশেষ করে মহিলারা বুঝতে পারেনি তার উদ্দেশ্য কি, পরে নিজেদের খাবারের পাত্রগুলো দেখে বুঝেছে। আরবাথনাট, হ্যাডো সবাই প্রাণপণে হাসছে। হেসেছে তৃতীয় জনও। আর্থার কিন্তু লজ্জারাঙা হয়েছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি তার। মার্গারেটের চোখে তাকাতে পারছে না সে। তার মত মেয়ের মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

মার্গারেট কিন্তু বিকারহীন। হাসিঠাট্টা আর গালগল্প চলেছে তার, অবিরাম।

ক্রমে বাতি নিভলো, আর্থারের যন্ত্রণার শেষ হলো। ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছে সে, মুখ ঢেকে। মার্গারেটকে ভুলতে চায় সে, তার উচ্ছৃঙ্খলতা চায় বিস্মৃত হতে। সর্বোপরি, এ সন্ধ্যেটাই চায় ভুলতে সে। মার্গরেট তার সঙ্গে হাত মেলালো, হালকা হাতে,—একদিন এসো কিন্তু আমাদের দেখতে, কার্লটনে ঘর নিয়েছি আমরা।

আর্থার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিলো, মুখে কথা নেই। সুসি গেছে পোশাকের ঘরে, ক্লোকটা আনতে।

মার্গারেট বেরিয়ে আসতে দেখলো দরজায় দাঁড়িয়ে সে।

—তোমাকে কোথাও নামিয়ে দিতে পারি আমাদের গাড়িতে। অবসর সময়ে আসতে পারো তো আমাদের বাড়িতে। মার্গারেট সুসিকে আমন্ত্রণ জানালো।

সুসি শুধু মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিলো। অসহ্য মনে হচ্ছে সব কিছু তার। আর্থার তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে, মাটিতে চোখ তার, অন্যমনস্ক।

—ওকে দেখছো! ওর এই হাল করেছো তুমি! প্রচণ্ড ঘৃণা ঝরেছে তার কথার সঙ্গে।

আর্থার সেই মুহূর্তে চোখ তুলে চাইলো ওদের দিকে, কোটরগত, দুঃখী দৃষ্টি তার। সে চোখে শুধুই হতাশা।

—তোমার জন্যেই লোকটা তিল তিল করে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে, জানো? রাতে ঘুমোতে পারে না ও। প্রচণ্ড যন্ত্রণা ওর মনে। তুমিও রেহাই পাবে না—

—আমাকে কেন দোষারোপ করছো বুঝি না। কৃতজ্ঞবোধ করা উচিত তোমার।

—কেন?

—যেদিন প্রথম দেখা তোমাদের, সেদিন থেকেই ওকে তুমি

ভীষণভাবে ভালবাসোনি কি? প্যারিসে ওর জন্তে তোমার দুর্বলতার ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েনি ভাবছো? এখনো ওর জন্তে তোমার মন কাঁদে।

সুসির হঠাৎ খুব খারাপ লাগলো। তার গুপ্তকথা এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

তিক্ত হাসি ফুটলো মার্গারেটের ঠোঁটে। আস্তে বেরিয়ে গেলো সে সুসির পাশ দিয়ে।

প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটলো আর্থারের, পরের দু' তিনটে দিন। ক্রমে নিজেকে ফিরে পেলো সে। কর্লটনে চলে গেলো সে একদিন মার্গারেটের খোঁজে। হ্যাভো বেরিয়ে গেছে জানলো সে দারোয়ানের কাছ থেকে। মার্গারেটকে একাই পাবে সে, ভাবলো।

মার্গারেটের ঘরে ঢুকলো যখন সে, বসে মার্গারেট।

—আমাকে আসতে বলেছিলে।

মার্গারেট নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ।

—বসতে পারি? আর্থার প্রশ্ন করলো।

মাথা হেলিয়ে দিলো মার্গারেট। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ওরা পরস্পরের দিকে। নিঃশব্দ! আর্থারের সবকিছু গুলিয়ে গেলো।

ওর আগমন অসহ্য মনে হচ্ছে মার্গারেটের কাছে।

—কেন এসেছো? কর্কশস্বরে শুধালো মার্গারেট।

সামাজিক সৌজন্য প্রদর্শনের ব্যাপারটা দুজনের কাছেই নিরর্থক। এ অবস্থায় সেসবের অবতারণাও নিষ্প্রয়োজন।

—ভাবলাম, হয়তো তোমার কোনো সাহায্যে আসতে পারবো। গভীর স্বরে জানালো আর্থার।

—আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। সুখী আমি! তোমাকে বলার কিছুই নেই আমার।

দ্রুতস্বরে কথা বলে চলেছে মার্গারেট। সামান্য নার্ভাসও। দরজার দিকেই দৃষ্টি তার, উদ্বেগভরা—কারুর আগমন সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন।

—আমাদের পরস্পরকে বলার অনেক কথা আছে। এখানে কথা বলার যদি অসুবিধে থাকে কিছু, আমার ওখানে যাবে কি?

—ও জানতে পারবে—কথাগুলো যেন জোর করেই বের করে দেওয়া ওর গলা থেকে।—ওর কাছ থেকে কিছুই লুকোনো যাবেনা।

আর্থার তাকালো ওর চোখে, সোজা। মার্গারেটের চোখে ত্রাস, সে নিজেও ভয় পেয়ে গেলো। অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মার্গারেটের মুখচোখ, ভীরু দৃষ্টি তার। আর্থার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, —তোমাকে জানানো দরকার ছিলো, যে তুমি যা করেছো সে জন্যে তোমাকে দোষ দিই না। যাই করে থাকো না কেন তুমি, তাতে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার ছেদ পড়বে না।

—তুমি—তুমি কেন এলে এখানে? এসব কথা বলে কেন আমার যন্ত্রণা বাড়াচ্ছো?

কান্নায় ভেঙে পড়লো মার্গারেট। ঘরময় পায়চারী করে চললো, উত্তেজনায় পায়ে—তুমি যদি চাও তোমাকে যে ব্যথা দিয়েছি তার জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত আমার, তাহলে তুমি জিতেছো। তোমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছি তার সবটুকুই প্রাপ্য আমার, সুসিও তাই চেয়েছে। কিন্তু, সে যদি সব জানতো!

হিস্টিরিয়ার হাসি দিলো মার্গারেট। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো সে, আর্থারের হাতদুটো তার হাতে নিয়ে,—আমি দেখিনি ভাবছে সে? তোমার ওই পরাজিত চেহারা দেখে অনেক রক্ত ঝরেছে আমার বুকে। তুমি অনেক বদলে গেছো। এত কম সময়ে কোনো মানুষের পরিবর্তন হতে পারে—বিশ্বাস করা যায় না। আর, এর জন্যে দায়ী আমিই। আর্থার—আমাকে ক্ষমা করো তুমি, করুণা করো আমাকে!

—ক্ষমা করার তো কিছু নেই, সোনা।

স্থিরচোখে তাকালো আর্থারের দিকে মার্গারেট, চোখদুটো তার জলছে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায়,—তুমি বলছো বটে। তবে এটা তোমার মনের কথা নয়। শান্তগলায় কথা বলতে চাইছে মার্গারেট।

—তার মানে?

—ও আমাকে কখনো ভালবাসেনি। আমার কথা কখনো মনেও আনতো না সে—যদি তোমাকে ব্যথা দিতে না চাইতো। তোমার সবচেয়ে আদরের যে তাকে সেই জন্যেই ছিনিয়ে নিয়েছে সে। তোমাকে ঘৃণা করতো—তাই তোমার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। আমি—আমি কিন্তু এ'সব করিনি, করেছে শয়তান—আমার মধ্যেকার শয়তান। আমি কিন্তু মিথ্যাচারণ করিনি তোমার সঙ্গে, তোমাকে ছেড়ে গিয়ে।

মার্গারেট ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার।

—সেদিন ভেবেছিলাম লোকটা মরতে বসেছে, সাহায্য করেছি। স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে জল দিয়েছি। পরে ও আমার ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে—আমাকে হাতের পুতুল করেছে তার। আপনার নিজস্ব সত্ত্বা নেই—আর, ওর কথামতই চলতে হবে আমাকে, যদি বাধা দেবার চেষ্টা করি—যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেলো মার্গারেটের সুন্দর মুখটা।

—সেই থেকে সবই জানতে পেরেছি আমি। মুমূর্ষ মানুষের ব্যাপারটা তার ভান ছিলো সেদিন। সুসিকে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে একটা ভুয়ো তারবার্তা পাঠিয়ে। একটা ছবিতে নামটা পেয়েছিলো ও মেয়েটার। এসব নিয়ে পরে কথা হয়েছে, মজা করেছেও...

থেমে গেলো হঠাৎ মার্গারেট, চোখমুখে ভয়ার্ত দুঃখের ছাপ পড়লো তার,—আর, এই মুহূর্তে যা বলছি তোমার কাছে, হয়তো তাই নির্দেশে বলছি—যাতে আরও দুঃখ পাও তুমি। যাতে মনে কর তুমি সে আমার জন্যে কখনোই ভাবেনি। আমার জীবনটা নরকের

সামিল হয়ে গেলো, আর্থার। ওর জিঘাংসার পাত্র পূর্ণ।

—কিসের জিঘাংসা ?

—মনে পড়ে না তোমার—ওকে মেরেছিলে তুমি, একদিন নির্দয়ভাবে লাথি দিয়েছো। ওকে চিনেছি আমি—তোমাকে সে মেরে ফেলতে পারতো সেদিন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ঘৃণা জমেছে তার মনে—তাই এই রাস্তা বেছে নিয়েছে ও। তিলে তিলে দগ্ধ করে যাবে তোমাকে, আমাকেও…

উত্তেজনা বেড়ে চলেছে মার্গারেটের। এই প্রথম সে মন খুলে বলতে পারলো সবকিছু…জলের তোড়ের মত বেরিয়ে এসেছে জমা সব কিছু—

আর্থার সান্ত্বনার ভাষা খুঁজেছে,—তুমি অসুস্থ, ক্লান্তও। নিজেকে সংযত কর। অলিভার হ্যাডো, আর যাই হোক—আমাদেরই মত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ।

—ওর আজগুবী কাহিনী শুনে হেসেছো তুমি। সেসব কাহিনীর গুরুত্ব দাওনি কখনো। আমি কিন্তু জানি, তবে—সেসবের ব্যাখ্যা করতে পারবো না। সাধারণ জ্ঞানে তার ব্যাখ্যা চলে না। এমন সব জিনিষ দেখেছি আমি যা নিজের চোখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। তোমাকে বলছি, ওর এমন সব ক্ষমতা আছে যার ব্যাখ্যা হয় না। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে পরিচয় হয় সেদিন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। দুঃস্বপ্ন মনে হয়েছে সেসব। বিষের মত গাঁথা হয়ে গেছে তা আমার মনে। স্ট্যাফোর্ডশায়ারে তার বাড়িতে যেদিন গেলাম, ওই দৃশ্যগুলো বাস্তবে দেখা দিলো। সেই শুকনো পাথরের স্তূপ, গাছপালা; জলাভূমি… সেই ভয়ঙ্কর বিকেলের অনেক আগেই গেছি যেন সেখানে। বিশ্বাস করো—আর্থার—এক একসময়—মনে হয় এই সব দেখেশুনে পাগল হয়ে যাবো আমি।

আর্থার কোনো কথা বললো না। মার্গারেটের কথাগুলো তার মনে এক বিকট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কোনো অশুভ প্রভাবে

মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি।

মার্গারেট মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো।

অনেক পরে আর্থার বললো, ধীরস্বরে,—শোনো, এখান থেকে চলে যেতে হবে তোমাকে। ওর সঙ্গে থাকা চলতে পারে না তোমার। স্কেন-এ ফিরে যাওয়া চলবে না তোমার—

—ওকে ছাড়তে পারবো না আমি। আমাদের সম্পর্ক—অবিচ্ছেদ্য!

—কিন্তু এসব তো দানবীয় ব্যাপার! ওর সঙ্গে থাকা কোনো ক্রমেই চলবে না তোমার। সুসির কাছে ফিরে চলো। সে তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, তোমার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে।

—কোনো ফল হবে না। আমার জন্যে কিছুই করতে পারবে না তুমি—

—কেন?

—কারণ, ওকে—আমি ভালবাসি—সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

—মার্গারেট!

—ওকে ঘৃণাও করি আমি, প্রচণ্ডভাবে বিতৃষ্ণ আমি ওর প্রতি। তবুও, কেন জানি না—কি মন্ত্র আছে তার—কাছে টানার। আমার সমস্ত শরীর, সমস্ত অঙ্গ কাঁদে ওর জন্যে।

অপ্রতিভ আর্থার চোখ ফিরিয়ে নিলো। সরে যাবার ভঙ্গিও লুকোতে পারলো না সে।

—তোমাকে কি বিরক্ত করছি আমি? মার্গারেট ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

তার গলার স্বরে এমন অস্বাভাবিকতা ছিলো, আর্থার চমকে চোখ তুলে তাকালো। মার্গারেটের গালদুটো লাল হয়ে গেছে, জ্বলছে যেন। বুকটা ওঠানামা করছে উত্তেজনায়। কান্নায় বুঝি বা আবারও ভেঙ্গে পড়ে,—দোহাই তোমার। আমার দিকে তাকিয়ো না, অমন করে।

মুখ ঘুরিয়ে নিলো মার্গারেট, লজ্জাতে অস্বাভাবিক গলা তার। মন্টি কার্লোতে যদি গিয়ে থাকো তুমি, শুনেছো লোকে কি বলেছে—

তাসের ভাগ্য নাকি আমারই আর, ও আমার সারা আত্মা ডুবিয়ে দিয়েছে পাপে। আমার মধ্যে আর পবিত্রতার চিহ্নমাত্র নেই। পাপী আমি, নিজেকে ঘৃণা করি আমি। নিজেকে সবসময়ে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করি—

ঠাণ্ডা মেরে গেলো আর্থার, ঘাম জমছে। আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখচোখ। এমন এক রহস্যের সম্মুখীন সে এখন, যার হদিস জানা নেই তার।

মার্গারেট কিন্তু কাঁপাস্বরে বলে চলেছে,—সেরাতে যে গল্পটা বলেছিলাম, মনে পড়ছে—শুনতে শুনতে তুমি শিউরে উঠেছো। ওটা কিন্তু আমি বলিনি—ওর কাছ থেকেই এসেছে তার তাড়না। জানতাম, তা দুষ্ট-উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তবু, বলে গেছি—সানন্দে। বলার মধ্যে পেয়েছি প্রেরণা—তোমার বেদনার কথা মনে করে আত্মহারা হয়েছি। মেয়েদের চমকে দিয়েছি। আমার মধ্যে, জানো—দুটো সত্তা আছে। আগেরটা—যেটা তোমার ভালবাসার ধন ছিলো। দিনে দিনে দুর্বল হয়ে চলেছে তা। অচিরাৎ মরে যাবে সে সত্তা। কুমারী দেহে শুধুই পড়ে থাকবে লম্পট আত্মা।

আর্থারের বুদ্ধি লোপ পেতে চলেছে। স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করলো সে,—কিন্তু, দোহাই তোমার---ওকে ছেড়ে দাও তুমি। আমাকে যা বললে তুমি, ডিভোর্সের পক্ষে যথেষ্ট তা। নাটকীয় কাণ্ডকারখানা সব। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ—ওকে পাগলাগারদে ভরে দেওয়া দরকার।

—আমার জন্যে কিছুই করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

—কিন্তু ওযদি তোমাকে ভাল নাই বাসে, তাহলে তোমাকে দরকার কি তার?

—জানি না, তবে সন্দেহ হচ্ছে আমার।

আর্থারের দিকে স্থিরচোখে তাকালো সে। অনেক সংযত মার্গারেট এখন,— তার ওই ইন্দ্রজালের প্রয়োজনে আমাকে ব্যবহার

করতে চায়। লোকটা পাগল কিনা জানি না, তবে ভয়াবহ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় সে, আর—তা সার্থক করতে আমাকে দরকার তার। ওইটাই আমার নিরাপত্তার রাস্তা, একমাত্র।

—তোমার নিরাপত্তা?

—হ্যাঁ। ওই জন্যেই আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না সে। হয়তো—এইভাবেই আমার মুক্তি আসবে।

তার নির্বিকার বাচনভঙ্গি আর্থারকে বিস্মিত করলো। মার্গারেটের দিকে এগিয়ে গেলো সে, কাঁধে হাত রাখলো তার।

—মার্গরেট, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। এটা কোনো কাজের কথা নয়। সাবধান যদি না হও তো মনটা মরে যাবে তোমার। এখুনি চলে এসো আমার সঙ্গে। ওর হাত থেকে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে, তোমার মনটা শান্ত হবে। আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে। আর, ভয় যদি পাও—তাহলে তোমাকে লুকিয়ে রাখা হবে ওর কাছ থেকে। আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেবো সেক্ষেত্রে।

—পারবো না—সাহস নেই আমার।

—কিন্তু আমি আশ্বাস দিচ্ছি তোমাকে, মাথাটা একটু খাটাও। কোনো ক্ষতি হবে না তোমার। আমরা এখন লণ্ডনে, চারদিকে মানুষ। জনবহুল রাস্তা দিয়ে চলার সময় ছুঁতেও পারবে না সে তোমাকে। সোজা সুসির কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। ক'দিনের মধ্যেই এইসব মনে করে হাসি পাবে তোমার।

—এখন, এই মুহূর্তে যে সে এই ঘরে নেই তাই বা কি করে বলতে পারছো তুমি,—আমাদের কথা যে সে শুনছে না—

প্রশ্নটা এতই আচমকা এলো যে—আর্থার চমকে উঠলো। দ্রুত ঘুরে তাকালো সে ঘরের চারদিকে,—তুমি পাগল হয়ে গেছো। ঘর তো খালি।

—আবারও বলছি ওর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। পুরনো সেই ছেলেভুলানো কথাগুলো মনে পড়ে না তোমার, নার্সরা যা শোনাতো আমাদের—মানুষ কেমন করে নেকড়ে বনে যেতো—

রাতের গভীরে ঘুরতো ?

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো মার্গারেট,—এক একসময় যখন স্কেন-এ আসতো ও, সকালেও রক্তচক্ষু...ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, আশ্চর্যরকমের গম্ভীর। মনে হয়, সেও...

থেমে গিয়ে মাথাটা তার পেছনে হেলিয়ে দিলো মার্গারেট,—ঠিকই বলছো তুমি, আর্থার। মনে হয় পাগলই হয়ে যাবো আমি।

অসহায় আর্থার তাকিয়ে আছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মার্গারেট কিন্তু বলে চলেছে, দুঃখভরা গলায়,—আমাদের বিয়ের সময়ে ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম,—ওর মায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। তাঁর কথা কখনো বলে না ও, তবে আমার মনে হলো তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার। পরে, একদিন হঠাৎ বলে বসলো সে—বেরোতে হবে।

অনেক পথ পেরিয়ে গেলাম, সেজায়গা চিনিও না আমি। মফস্বলের রাস্তা...মাইলের পর মাইল চলেছি। একটা বাড়ির সামনে পৌঁছলাম—বিরাট বাড়ি—উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। জানলাগুলোর মোটা গরাদ। একটা বড় ঘরে ঢুকলাম, শূন্যঘর। রেলের প্রতীক্ষা-ঘরের মতই ঠাণ্ডা, নিরানন্দ।

একটা লোক ঢুকলো ঘরে, লম্বা মত—ফ্রককোট পরণে। সোনার চশমা চোখে। ডাক্তার টেলার বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো আমার সঙ্গে লোকটার। আর ঠিক তখুনি—সব বুঝতে পারলাম...

হেঁচকি উঠছে মার্গারেটের, কথার সঙ্গে। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে তার—যেন সেদৃশ্য এখনো তার চোখে ভাসছে সেই ভয়াবহতা নিয়ে।

—জানলাম সেটা একটা উন্মাদাগার। আর, অলিভার এ' সম্পর্কে কিছু বলেওনি। চওড়া সিঁড়ির কাছে নিয়ে আমাকে—একটা বড় অনেক শয্যার ঘর (Dormitory)।

—ওঃ। কি দেখলাম আমি সেখানে—যদি জানতে তুমি। এত ভয় পেয়েছি—এমন জায়গায় কখনো যাইনি—একটা সেল। দেয়াল'

আর মেঝেতে পটি দেওয়া।

কপালে হাত রাখলো মার্গারেট—মন থেকে দৃশ্যটাকে সরিয়ে দিতে চাইছে ও। —এখনো দেখতে পাচ্ছি—কখনো ভোলা যায় না সে দৃশ্য।

এক অসুস্থ রোমন্থন চলেছে তার মনে—ঘরটার কোণে একটা কি পড়ে ছিলো। ওরা ঢুকতে সামান্য নড়েও উঠলো সেটা—মানুষের দেহ। একটা নারীদেহ...বাদামী ফ্লানেলে মোড়া তার শরীর, বিধ্বস্ত। বিরাট শরীর, মেদবহুল। নির্বিকার চোখে তাকালো সে আমাদের দিকে। রেখাহীন মসৃণ মুখে কেমন ছেলেমানুষীর ছাপ। উস্কোখুস্কো চুলে পাক ধরেছে। অস্পষ্ট।

মার্গারেটের ভয়ের কারণ কিন্তু অন্যখানে, হ্যাভোর সঙ্গে এক আশ্চর্য মিল মহিলার।

—ও বললো মহিলা নাকি তার মা, আর এখানেই কেটেছে তাঁর পঁচিশটা বছর।

মার্গারেটের চোখে যে ভয়ের প্রতিফলন দেখেছে আর্থার, তা অসহনীয়। কি বলবে তাকে, ভেবে পেলো না সে। কিছু পরেই আবার কথা শুরু করলো মার্গারেট। অনুচ্চগলায়, কিন্তু দ্রুত বলছে। হাতদুটো কচলাচ্ছে—কি সহ্য করেছি আমি জানো না তুমি। এক সঙ্গে বহুদিন বাইরে বাইরে থাকতো। একা আমি—স্কেন-এ। দিন কাটে, কাটে রাত। এক একটা সময়ে সে দিনের পর দিন কাটিয়েছে, নোংরা শুড়িখানায় মদ খেয়ে। নোংরা মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা সে সময়ে। আফিং খেতো। নিজেকে নামিয়ে নেওয়ার সে কি প্রচেষ্টা —নোংরা মেয়েমানুষদের সঙ্গে। একধরণের নোংরা আনন্দ পেতো সেসবে।

আর্থারের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করবে ঠিক করলো সে, টেবিলে সাজানো হুইসকি বোতল আর গ্লাসের দিকে দৃষ্টি গেলো তার। মার্গারেটকে ঢেলে দিলো পানীয়—এটা খেয়ে নাও।

—কি ওটা ?

—তা জানার দরকার নেই, এখুনি খেয়ে নাও।

ঠোঁটে তুললো মার্গারেট বাধ্য মেয়ের মত। আর্থার দাঁড়িয়ে পাশে। মুখে রং লাগলো ক্রমে তার।

—এবার এসো আমার সঙ্গে। মার্গারেটের হাত ধরে নিয়ে দ্রুত-পায়ে নেমে চললো সে। বাড়ির বাইরে বেরিয়েই গাড়ি পেয়ে গেলো ওরা। মাথা খালি, চায়ের আসরে গোপনে একটা মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখে দু'একজন পথচারী তাকালো।

সুসির বাড়ির ঠিকানা দিলো আর্থার। মার্গারেটের দিকে ঘুরতেই দেখলো সে জ্ঞান হারিয়েছে।

পৌঁছে মাগারেটকে কোলে তুলে ঘরের সোফায় ছেড়ে দিলো তাকে। সুসিকে সব বললো সে, কি চায় তাও।

মার্গারেট অসুস্থ এটুকু ছাড়া সবই ভুলে গেলো সুসি, আর্থারের কথামত চলবে কথা দিলো।

একটা সপ্তাহ মার্গারেট নড়াচড়া করতেই পারলো না। আইল অফ ওয়াইট-এর উল্টো দিকে হ্যাম্পশায়ারে একটা ছোট্ট কুটির ভাড়া করেছিলো আর্থার। ইংল্যাণ্ডের অমন প্রশান্তির মাঝে হয়তো মার্গারেট তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে এবং তা সম্ভব হওয়া-মাত্র সুসি তাকে নিয়ে গেলো সেখানে। কিন্তু মার্গারেটের সেই খুসীভাব চলে গেছে। আত্মবিশ্বাসও। তার অসুখ যদিও দীর্ঘস্থায়ী নয়, গুরুতর নয়—তবু সে শ্রান্ত, শরীর আর মন দুদিক থেকেই যেন বহুকাল ধরেই মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছে। পরিবেশের কোনোকিছুতেই নেই তার আগ্রহ—ফলেফুলে গাছগাছালি ভরা উদ্যানের মাঝ দিয়ে গাড়ি করে বেড়ানোর ব্যাপারেও উদাসীন। সুন্দরের আকর্ষণ চলে গেছে তার মন থেকে—পাখীর কূজন আর ফুলের সৌরভ তার কাছে নিরর্থক আজ। তাকে যা বলা হচ্ছে তাতেই সায় দেয় সে—অলিভার হ্যাডোর কবল থেকে মুক্ত থাকার সম্ভাব্য সব কিছুই মেনে নিয়েছে সে। হ্যাডো কিন্তু মার্গারেটের খোঁজ-

করার কোনো প্রচেষ্টা চালায়নি, তার পাত্তাও মেলেনি। মার্গারেট কোথায় আছে তাও জানা নেই তার—তবে অন্তর্ধানের মূলে যে আর্থার এটা অনুমান করা শক্ত নয় তার পক্ষে। আর তাকে খুঁজে বের করাটা তেমন আয়াসসাধ্যও নয়। তার নিরুদ্দেশাবস্থা অবশ্য অস্বস্তিকর মনে হয়েছে সুসির। আর্থার লণ্ডনে তার কাজে জড়িয়ে না পড়ুক, এই কামনা করেছে সে।

ডিভোর্সের মামলা এলো অবশেষে।

এর দিনদুয়েক পরে আর্থার যখন তার পরামর্শকক্ষে বসে, হ্যাডের কার্ড পৌঁছলো তার হাতে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো তার,—ডাকো ভদ্রলোককে। নির্দেশ দিলো সে।

হ্যাডো যখন ঢুকছে, সে আগুনকুণ্ডের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে। ইশারায় বসতে বললো হ্যাডোকে,—কি করতে পারি তোমার জন্যে? বরফ ঢালা গলায় প্রশ্ন করলো।

—তোমার ডাক্তারী দক্ষতার প্রমাণ নেবার জন্যে আসিনি আমি, বারডন সাহেব। হ্যাডো হাসলো, আর্মচেয়ারে তার বিরাট বপু নামিয়ে দিয়ে।

—আমারও তাই মনে হয়েছে! আর্থার গম্ভীর।

—তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারছি না। গতকাল আদালতের যে শমন ধরিয়েছে আমাকে, তার মূলে তুমিই বলে ধারণা আমার।

—তোমাকে আমার ঘরে আসার অনুমতি দিয়েছি শুধু একটা কারণে, সেটা হচ্ছে তোমাকে জানিয়ে দেওয়া, ভবিষ্যতে আমার আইনজ্ঞদের মারফৎ ছাড়া তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই না সেটা জানাতে।

—আহা-হা, এমন অভিনয় দেখাচ্ছো কেন আমাকে বন্ধু? আমার প্রিয় ঘরণীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছো, সত্যি—তবে আমাদের বিবাহিত জীবনের সামান্যতম মর্যাদাও তো আশা করতে পারি?

—আমার ধৈর্য ঠিক আগের মত, নেই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এর আগে তোমার সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই এক অসুখকর অধ্যায় ঘটে গেছে, যার ফল—

—ও ব্যাপারটায় তোমার অনুতাপ হয়েছে বলেই ধারণা করেছিলাম, ব্যারন। হ্যাডো তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, সপ্রতিভ গলায়।

—আমার সময় কিন্তু খুবই কম। আর্থার আবার জানালো।

—তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসা যাক, আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা প্রতি-আবেদন করছি আদালতে, এটা জানতে নিশ্চয়ই আগ্রহ হওয়া উচিত তোমার। আর, সেই সঙ্গে তোমাকে সহ-বিবাদীও করছি।

—তুমি –কুখ্যাত, নোংরা লোক কোথাকার! তিক্ত গলায় বলে উঠলো আর্থার,—তুমি ভালই করে জানো, আমিও যেমন জানি, যে তোমার স্ত্রী সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

—জানি যা—তা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার স্ত্রী বেরিয়ে এসেছে. এবং তোমার আশ্রয়েই আছে সে।

প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠলো আর্থার। লোকটাকে মার দেওয়ার এক দুর্নিবার ইচ্ছা দমন করলো সে কোনোরকমে। জোট্ট করে হাসলো হ্যাডো,—তোমার যা খুশী করতে পারো—আমি ভয় পাই না—সরল মানুষেরা বড় অসাবধানী হয়। তোমার পেশাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পক্ষে মোটামুটি একটা কাহিনী আমি ফাঁদতে পারি, ফল হবে—হাসপাতালগুলো থেকে অবসর নিতে বাধ্য হবে তুমি।

—তুমি ভুলে যাচ্ছো কেসটার শুনানী খোলা আদালতে হচ্ছে না।

হ্যাডো স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলো কয়েকমুহূর্ত, উত্তর জোগাচ্ছে না তার,—ঠিক বলেছো। ভুলেই গিয়েছিলাম ওটা। মৃদু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে।

—তাহলে, আর তোমাকে দেরী করবো না।

অলিভার হ্যাডো উঠে দাঁড়ালো। আর্থার লক্ষ্য করছে তাকে, তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে তার চোখে। বেল বাজিয়ে দিতে পরিচারক এলো।

—ভদ্রলোককে সদরে পৌঁছে দাও।

অবিচলিত হ্যাডো হেলেদুলে এগোলো দরজার দিকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো আর্থার, হ্যাডো আর এগোবে না বলেই ধারণা তার। কারণ, তার আইনবিদ আগেই জানিয়েছে তাকে, হ্যাডো প্রতিবাদ করবে না মামলার।

মার্গারেটের যেন আগ্রহ বাড়ছে, মামলার খবর শোনার পর। মুক্তির আনন্দে আনন্দিত সে। কোর্টে দাঁড়াবার জন্যে মন তৈরী করেছে সে। হ্যাডোর সম্পর্কে কথাও বলেছে, স্থৈর্য নিয়ে।

পরিচিতেরা আনন্দিত, মার্গারেট তার পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে। প্যারিস স্টুডিওর দিনগুলোতে তার উজ্জ্বল হাসি যেমন ছড়িয়ে পড়েছে একদিন, ছোট্ট বাড়িটাতেও অনুরণিত সে হাসি। জুলাইয়ের শেষে কোনো একসময়ে মামলার দিন ঠিক হয়েছে। সুসি মার্গারেটকে নিয়ে বাইরে চলে যাবে ঠিক করেছে, মামলার পর।

কিন্তু অঘটন ঘটলো তার আগেই। মামলার দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, মার্গারেটের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে; উত্তেজিতও। উচ্ছলতা চলে গেলো তার—নীরব হয়ে গেলো ক্রমে। এর ব্যাখ্যা, সুসির মনে হলো,—প্রকাশ্যে তার বিবাহিত জীবনের খুঁটিনাটির আলোচনা তার দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্নায়বিক পীড়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছলো, সুসি সেটাকে অস্বাভাবিক বলে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছে। আর্থারকে লিখে জানাবে ঠিক করলো সে, সমস্ত কিছু—

প্রিয় আর্থার,

মার্গারেটকে নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না। তুমি এসে একবার দেখে গেলে ভালো হতো। খুসী মেজাজের চিহ্ন ক্রমে বিলুপ্ত, বিচিত্র এক ধরণের বিরক্তিবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এত অস্থির হয়ে পড়েছে, যে মুহূর্তের জন্যেও এক জায়গায় বসছে না। বসে থাকলেও সারা শরীর তার কাঁপে, কেমন এক ধরণের খেচুনি চলতে থাকে। কোনো নার্ভাস রোগের শিকার সে

বলে ধারণা আমার। ভয় পাচ্ছি আমি। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি, সিঁড়ি ওঠানামা করে—কখনো বাগানে বেরিয়ে যায়।

হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেছে মেয়েটা, তার চোখে নেমেছে সেই দৃষ্টি, যেদৃষ্টি লক্ষ্য করেছি প্রথম দিকে। ওর সমস্যা কি জিজ্ঞেস করেছি, বলেছে; আমার ভয় হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

কি বলতে চায় জানতে চেয়ে সদুত্তর পাইনি। গত কয়েক সপ্তাহ দারুণ দুশ্চিন্তায় কেটেছে আমার, কতটুকু তার সত্যি কতটুকুই বা মনগড়া, জানি না তাও।

তুমি এলে একটু সাহস পাই। এ' সমস্ত কিছুতে আমার অস্বস্তি বাড়ছে, নানান অস্পষ্ট আতঙ্কে মনটা ভরে গেছে আমার। এ' ভয়ের সঙ্গে হ্যাডোর কি সম্পর্ক থাকতে পারে জানি না। তার কথাও সবসময়েই আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। তার ভয় সেই ভয়াবহ চোখদুটো. ইন্দ্রিয় সক্ত হাসিটুকুও ভেসে ওঠে চোখে।

রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আমার, বুকে ঝড় ওঠে—যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলো!

মামলাটা চুকে গেলে বাঁচতাম। জার্মানীতে চলে যেতে পারতাম—খুশীর দিনে ফিরে যেতে।

একান্ত তোমার

সুসান বয়েড

নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল সুসি, কিন্তু বর্তমান অবস্থার জন্যে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। দুশ্চিন্তায় ভরেছে মন, অসুখী সে। মার্গারেটকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বেগ পেতে হয়েছে তাকে। সুসি রক্তমাংসের মানুষ—এবং যদিও সে তার সময়ের অনেক বেশীই করতে চেয়েছে, করেছেও—তবু, আর্থার এতো সহজে মার্গারেটের ওপর তার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়াতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ সে। অন্য ভাবনার অবকাশ নেই তার। মার্গারেটের দেখভালে সময়টুকু কাটিয়ে দেবে সুসি, এটাই কাম্য তার।

চিঠিটা ডাকে দিয়ে ফিরে এলো নিজের ঘরে সুসি। সুন্দর রাতটা। তারায়,তারায় ভর্তি আকাশ। ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ্য ওষধির কাজ করেছে। জানলার পাশে অনেকক্ষণ বসে রইলো সে, শেষে শান্ত হলো সুসি, শুতে গেলো। অনেকদিন এমন সুনিদ্রা হয়নি তার। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সুসি। যখন জাগলো, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার ঘরে; আনন্দের শ্বাস পড়লো। বিছানায় বসে গাছ-পালায় নজর চলেছে, নীল আকাশও। পৃথিবীটা হঠাৎ তার চোখে সুন্দর হয়ে উঠেছে, যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যে কোনো অশুভের মোকাবিলা করতে, হাসিমুখে।

উঠে পড়লো সুসি, ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মার্গারেটের ঘরে ঢুকলো।

ঘর খালি। রাতে কেউ ঘুমোয়নি বিছানায়। বালিশের ওপরে পড়ে একটা চিরকুট।

'কিছু করার নেই। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। ওর কাছেই ফিরে গেলাম। আমার সম্বন্ধে চিন্তা করো না। আশা নেই'।

'ম'

মুখ দিয়ে অস্ফুটে একটা শব্দ বেরোলো সুসির। প্রথমেই আর্থারের কথা মনে পড়লো তার। লোকটার জন্যে দুঃখবোধ হলো তার। আরও একবার তাকে এক অশুভ খবর পরিবেশন করতে হবে।

তাড়াহুড়ো করে প্রাতরাশ সেরে নিলো সুসি। কাপড় বদলে নিলো। এগারোটার আগে ট্রেন নেই। কাজেই ধৈর্য ধরতেই হবে। শেষে, বেরোবার সময় হতে দস্তানা পরে নিলো সুসি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আর্থার দরজা ঠেলে ঢুকলো।

—আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, জড়ানো গলায় বলে উঠলো সুসি.—কি করে জানলে তুমি? আর্তস্বর তার।

—আজ সকালেই অলিভার হ্যাণ্ডো একবাক্স চকলেট পাঠিয়েছে, কার্ডে লেখা :—'অদ্ভুত কৌশলটা বোধহয় আমিই দেখালাম'।

এই ধরণের নির্মম প্রতিশোধ, ছেলেমানুষীতে ভরা—চরিত্রগত লোকটার।

সুসি মার্গারেটের চিরকুটটা এগিয়ে দিলো। আর্থার সেটা পড়লো, গভীর চিন্তা তার মনে—ও ঠিকই করেছে, মনে হয়। অনেক পরে বললো আর্থার,—করার কিছুই নেই।
মার্গারেটের ওপর লোকটার এমন একটা প্রভাব আছে, যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

সুসির ভাবনা শুরু হলো,—আর্থারের নাস্তিকতা বুঝি বিলীন। মার্গারেটের ওপর অলিভার হ্যাডোর এক অশুভ প্রভাব আছে এ' বিষয়ে সুনিশ্চিত সে। দূর থেকে মার্গারেটের ওপর প্রভাব বিস্তার করাটা তার পক্ষে আদৌ শক্ত নয় মনে হয়েছে তার। আর, এই কারণেই গত কয়েক দিন মার্গারেট অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কোনো অস্বাভাবিক কিছু কাজ করে চলেছে, মার্গারেটের অজ্ঞাতসারে। শেষে, তার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে মার্গারেট। চুম্বকের মতই আকর্ষণ এর।
—সে যা করেছে তার জন্যে ওকে দায়ী করতে পারি না আমি, মনে হচ্ছে সে এক দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার—যে পরিস্থিতির হাত থেকে নিস্তার নেই তার। হ্যাডো ওর ওপর এক অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, স্বীকার করতেই হবে তা, আর—সেইজন্যেই ঘটেছে এ'সব। ওর দুর্ভাগ্যে সমবেদনা জানানো ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।
—হ্যাডোর কাছে ফিরে যাবার পর ওর ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে পারছো? আর্থার বলে উঠলো,—লোকটা কিরকম প্রতিহিংসা-পরায়ণ তা জানো, কি নির্মম। তার অত্যাচারের কথা মনে হতে আমার বুকে ফেটে যাচ্ছে—শারীরিক অত্যাচারের কথা ভেবে।

পায়চারী করে চললো সে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে—কারুর কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে। পুলিসে যাবার উপায় নেই। বলতে পারবো না তাদের, একটা মানুষ তার নিজের স্ত্রীর ওপর ইন্দ্রজালের

প্রভাব বিস্তার করেছে।

—তাহলে, তুমিও বিশ্বাস করছো এ'সব ?

—এখন, এই মুহূর্তে কি বিশ্বাস করছি, জানি না। সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে আমাদের করার কিছু নেই। সে নিজেই নিজের প্রভু। হাতদুটো রগড়ে নিলো আর্থার,—আর, আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি, লণ্ডনে। একটা দিনের জন্যেও ছেড়ে যেতে পারছি না। এখানে থাকার দরকার নেই আমার আর, ইণ্টার্ন্যুরের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। কিছুই করার নেই। তবু, জানি—মার্গারেটের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেলো।

সুসি ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। তার মনে যা আছে, তা কি আর্থারকে বিশ্বাস করাতে পারবে সে ?

—জানে। সাধারণ প্রক্রিয়ায় কাজ হবে না। ওর সঙ্গে লড়তে হবে—ওর অস্ত্রেই লড়াই চালাতে হবে। আমি যদি প্যারিসে গিয়ে ডাক্তার পোরোয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি, আপত্তি আছে ? সে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, জানো—হয়তো সাহায্য করতে পারবে।

আর্থার সোজা হয়ে দাঁড়ালো,—অ্যাবসার্ড ব্যাপার। কুসংস্কারের কাছে নত হলে চলবে না আমাদের। হ্যাডো স্কাউণ্ড্রেল একটা, ভণ্ড। মার্গারেট বেচারার মনের ওপর যেমন কাজ করেছে সে, আমাদের স্নায়ুর ওপরও চাপিয়েছে পীড়ন। সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী কিছু শক্তি ধরে সে, একথা ভাবার কোনো কারণ নেই।

—তোমার নিজের চোখে এ'সব দেখার পরও ?

—আমার চোখ যদি দেখিয়ে দেয়, আমার এতদিনের অনুশীলন কাজে লাগাতে পারছি না—তাহলে বলবো আমার চোখ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

—আমি তাহলে প্যারিসে রওনা হচ্ছি।

কয়েক সপ্তাহে পরের ঘটনা। ডাক্তার পোরোয়ে শান্ত, তার নিচু ঘরে বসে, সেইন নদীর মুখোমুখি।

—ব্রিটানিতে জন্মানোটা ভাগ্যের ব্যাপার। স্মিতহাসি ফুটলো ডাক্তারের ঠোঁটে।

সুসি ঢুকলো। ডাক্তার উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালো, হাসি তখনো ঠোঁটে তার।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে সুসি এসেছে প্যারিসে। ওদের দেখা সাক্ষাৎও হয়েছে একাধিকবার। আর্থারের প্রতি সুসির দুর্বলতার কথা স্মরণ করে মুগ্ধ হয়েছে ডাক্তার। একই সঙ্গে অবস্থান করেছে ওরা ক্লানির উল্টোদিকে এক শান্ত বাড়িতে, লা রেইনে ব্লাসে নাম তার। অনেক কথা হয়েছে ওদের মধ্যে ওই-খানে বসে, এক সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দুজনের।

—এখানে এত ঘন ঘন আসতে লজ্জা করে আমার। সুসি বলতে বলতে ঢুকছে, মাতিলদে তো সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে দিয়েছে আমাকে।

ডাক্তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো তার, হাসি অটুট,—একটা বুড়ো মানুষের সাহচর্য দিচ্ছো তুমি, এর তুলনা নেই। তবে আজ বিকেলে এখানে আসার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলে হতাশ হতাম আমি, কারণ অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

—এখনি বলো শুনি, সুসি বসলো।

—আর্সেনাল লাইব্রেরীতে একটা নতুন আবিষ্কার করেছি। বিজয়গর্বে বলে উঠলো কথাটা, যেন জাতীয়গুরুত্ব পর্যায়ের আবিষ্কার। তার সহজ অনাড়ম্বর খেয়ালীর প্রতি দুর্বলতা আছে সুসির—এবং তার বক্তব্য নিঃসন্দেহেই ঐন্দ্রজালিক কিছু, আন্দাজ করে সম্বর্ধনা জানালো তাকে।

—প্যারাসেলসাস-এর একটা বইয়ের মূল থেকে নেওয়া। পড়িনি এখনো—কারণ লেখা উদ্ধার করা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার, তবে পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটা ব্যাপার নজরে পড়েছে। ভয়ঙ্কর খবরটা

হচ্ছে প্যারাসেলসাস 'হোমানকালি'-কে নররক্তে আখ্যায়িত করেছে—কি করে করেছে কে জানে।

স্ুসি চমকে উঠলো। ডাক্তারের নজর এড়ালোনা তা,—তোমার কি হলো আবার?

—কিছু না। তাড়াতাড়ি জবাব দিলো সুসি।

এক মুহূর্তে তাকিয়ে রইলো ডাক্তার, পরে তার কাহিনী বলে চললো, যে কাহিনী তাকে আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত করেছে,—আর্সেনাল-এর পাঠাগারে একদিন নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ইন্দ্রজালের ওপর এত বই দুনিয়ায় আর কোথাও আছে বলে জানি না। আর, ওই আর্সেনাল এই ট্রাইবিউনাল বসেছিলো জানো নিশ্চয়ই—'শেম্বার আরদেন্তে' নামে, ব্যঞ্জনার নাম। ম্যাজিক আর ভোজবাজীর কেস নিয়েই কারবার ওদের।

—জানতাম না। সুসির ঠোঁটে মৃদু হাসি।

—সবসময়েই মনে হয় আমার—ওই পুরণো পাণ্ডুলিপি আর বিচিত্র প্রাচীন বইগুলো অনেক মামলার স্বাক্ষর। পাঠাগারের গর্ব, নিরীহ চেহারার বইগুলো কিন্তু অনেক দুর্ভাগা মানুষকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়েছে। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্ব কালে এরকম কত খানদানী মানুষ যে এই শয়তানীর শিকার হয়েছে, তার হিসেব নেই—

সুসি নিশ্চুপ। অনাগ্রহ নিয়ে আর শোনে না সে। এ'সব বিচিত্র সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, যার কোনো মানবিক ব্যাখ্যা নেই। ডাক্তার বিবৃত করেছে সেসব তার উজ্জল স্মৃতিভাণ্ডার থেকে। বই দিয়েছে তাকে পড়তে, ইন্দ্রজালের রসে রসায়িত হয়েছে সুসি সেসব পড়ে। এক একসময়ে অধৈর্য হয়েছে সুসি। ছুড়ে ফেলে দিয়েছে সেগুলো—আবার, পরক্ষণেই—বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, সবই সম্ভব—ইন্দ্রজালের দুনিয়ায়।

—সেসব যাদুকরেরা বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে, যাদের ভালবাসতো তাদের কাছে হয়েছে প্রিয়, যাদের ঘৃণার চোখে দেখেছে তাদের ওপর

চালিয়েছে প্রতিশোধমূলক অত্যাচার। একটা ব্যাপারে তারা একতাবদ্ধ, সাধারণ মানুষের চেয়ে ক্ষমতাবান তারা প্রমান করার চেষ্টা চালিয়েছে—দৈবশক্তিকে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছে নিজেদের অনুকূলে। তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কোনো কিছুকেই বাধা বলে মানেনি তারা। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছে; বৃথাই জ্বেলেছে অগ্নি-চুল্লী—বৃথাই পড়েছে দুর্বোধ্য সব বই—মৃতকে জাগিয়েছে বৃথাই—ভয়ঙ্কর আত্মার সঙ্গে বৃথাই চালিয়ে মিতালী। ফল দাঁড়িয়েছে—নৈরাশ্য। দুর্ভাগ্য নেমেছে তাদের জীবনে, দারিদ্র্য এসেছে, অত্যাচার, কয়েদ আর লজ্জাকর মৃত্যু নেমেছে জীবনে তাদের। আর, সর্বশেষে—একথা বলা যায়—সত্যের কিছু হয়তো নিহিত সেসব গহন স্থানগুলোতে।

—'হয়তো'-র বাইরে তুমি কখনো যাও না, নির্দিষ্ট মতামত দাও না তো দেখি তুমি। সুসি অনুযোগ করলো।

—এ'সব ব্যাপারে নির্দিষ্ট মতামত না দেওয়াই শ্রেয়।

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়েছে, ঠোঁটে হাসিটুকু বজায় রেখে। —কোনো বিবেচক মানুষ যদি ইন্দ্রজাল বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী হয়, সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়াটা শোভন নয় তার। ধীরে—ধৈর্য নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব বিভ্রমের গহ্বরে যা লুকোনো, তার সন্ধান করতে হবে।

কথার শেষে মার্গিল্ডে ঢুকলো। সঙ্গে অভ্যাগত একজন—আর্থার বারডন।

সুসির গলা দিয়ে বিস্ময়ের অস্ফুটস্বর বেরোলো—কারণ দিন দুয়েক আগেই আর্থারের একটা চিঠি পেয়েছে সে—আগমনের কোনো ইঙ্গিত বহন করেনি সে বার্তা।

—তোমাদের দুজনকেই এখানে দেখে খুসী হলাম। হাতে হাত মিলিয়ে বললো ওদের উদ্দেশ্যে।

—কিছু ঘটেছে কি? সুসি প্রশ্ন করলো।

আর্থারকে ভীষণভাবে দুঃস্থ দেখাচ্ছে, চালচলনে যথেষ্ট স্নায়বিক

অস্বাভাবিকতা।

—মার্গারেটের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে।

—তারপর ?

আর্থার যেন কথা বলছে কষ্টে, তবু গুরুত্বের কিছু বলতে হয়—জানানো দরকার ওদের। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ ওদের চোখে।

—এখানেই সোজা চলে এসেছি। দিশেহারা গলায় বলে উঠলো আর্থার বারডন,—তোমার হোটেলে গিয়েছিলাম, সুসি—তোমার দেখা পাবো আশা করে। ওরা যখন জানালো তুমি নেই, ভাবলাম এখানেই দেখা মিলবে।

—তুমি বড় ক্লান্ত বন্ধু, ডাক্তার সান্ত্বনার গলায় বলে উঠলো,—মাতিল্‌দেকে বলি কফি করে দিতে ?

—কিছু একটা হলে ভালো হয়। ক্লান্তির গলা আর্থারের।

—বসো একটু সুস্থির হয়ে। তারপর শুনবো তোমার কথা।

ডাক্তার পোরোয়ের সঙ্গে আর্থারের দেখা বহুকাল পরে। আর্থার কফিতে চুমুক দিয়ে চলেছে যখন, সে উদ্বেগের চোখে তাকে দেখে যাচ্ছিলো। অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে মানুষটার মধ্যে। চোখ চলে গেছে গর্তে। কিন্তু ডাক্তারকে সব চেয়ে বেশী যা আতঙ্কিত করেছে তা আর্থারের ব্যক্তিত্ব। স্পষ্টবিলুপ্ত তা। এ' ন'টা মাসের উদ্বেগ তাকে কাঙাল করেছে—তার নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস, যা ছিলো তার চরিত্রের অন্যতম গুণ। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে আর্থার—স্নায়বিক রোগের শিকার মানুষটা।

আর্থার চুপ করে আছে। মাটিতে স্থির তার চোখদুটো। কিভাবে শুরু করবে তার কাহিনী ভাবছে। তার অন্তরতম চিন্তাগুলোকে মনেই রাখতে চাইছে সে, কিন্তু ধৈর্যের শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে, ডাক্তারের পরামর্শ চাই তার। দুঃস্বপ্নের শিকার হয়ে থাকলে চলবে না, ডাক্তারের পরামর্শ দরকার তার।

...মার্গারেটের প্রস্থানের পর লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আর্থার কাজে

ডুব দিয়েছিলো। একমাত্র সান্ত্বনা। কাজে মন বসেনি তবুও যান্ত্রিকভাবে চালাতে হয়েছে তাকে সব। দুঃখকে ভুলতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র অনুভব হতে শুরু করেছে তার— অশুভ অনুভূতি, যার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে আর্থারকে।··· ক্রমে, বদ্ধসংস্কারের চাপ নিয়েছে সে অনুভূতি। মুক্তি নেই আর্থারের। মার্গারেটের শিয়রে অচিরাৎ নেমে আসছে বিপর্যয়— এ' ধারণা তাকে পেয়ে বসছে। কি তা বলতে পারবে না সে। পারবে না জানাতে কেন ভয় চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত তার মাথায়? কিন্তু ধারণা থেকে গেছে, অহরহ তাকে তাড়া করে ফিরছে সে আতঙ্ক··উদ্বেগ বেড়েছে। অনুতাপ। জ্বালাও। নিশ্চিত হতে চলেছে, মর্গারেটের বিপদ বেড়েছে···তবু, তাকে তার হাত থেকে মুক্ত করার কোনো পথ খুঁজে পায়নি সে।

হ্যাডো তাকে স্কেন-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, এটা অনুমান করেছে। আর্থার যদি সেখানে যায়ও—মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা থাকছে না। আরও বেশী চিন্তিত হয়েছে আর্থার, সেন্ট লিউকাস তার ওপরওলা বাইরে গেছেন। লণ্ডনে তাকে থেকে যেতে হচ্ছে, হঠাৎ কোনো অস্ত্রোপাচারের কারণে।

কিন্তু অন্য কোনো ভাবনা তার মাথায় নেই। মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করা দরকার তার, অবিলম্বে। রাতের পর রাত তাই স্বপ্ন দেখেছে আর্থার—মার্গরেট মৃত্যুর শিকার...আর্থারের হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ, সাহায্যের হাত বাড়াতে পারছে না—

শেষে, আর পারেনি সে সহ্য করতে। এক সহযোগী চিকিৎসককে জানিয়েছে সে—বেসরকারী কাজে তাকে লণ্ডনের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে, তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে।

কোনো পরিকল্পনা নেই তার মাথায়, শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে ভেনিং-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। স্কেন-এর মাইল তিনেক দূরে যে গ্রাম...

ছোট্ট জায়গা। একটা মাত্র সরাইখানা—আসা-যাওয়া মানুষের

সেবায় নিযুক্ত। আর্থারের নিজের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছে সেখানে। স্টেশনে খামার ভাড়া দেওয়া হবে বিজ্ঞাপন দেখে অত্যুৎসাহী বাড়িওয়ালীকে জানিয়েছে সেটা দেখতেই আসা তার। রাত হয়ে গেছে পৌঁছতে। তাই হ্যাডোদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া কাজ ছিলো না তখনকার মত।

অলিভার হ্যাডো প্রভাবশালী মানুষ বলে পরিচিত সেখানে, কাজেই তার খামখেয়ালীপনা ছাড়াও তাকে ঘিরে অনেক কথাই আলোচিত। বাড়িওলী অবশ্য তাকে অপ্রকৃতিস্থ আখ্যায় ভূষিত করেছে। জানিয়েছে লোকটা এমনই পাগল যে বাড়িতে চাকর পর্যন্ত শোয় না রাতে। রাতের খাবার পর সবাইকে চলে যেতে হয় পার্কের আশে-পাশের বিভিন্ন কুটিরে। একা হ্যাডো আর তার ঘরণী বাড়িতে।

মার্গারেট একা, ওই বদ্ধউন্মাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করছে—এ' ভাবনা, যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। কিন্তু এর বেশী কিছু জানা যায়নি।

আর্থার, তার যতটুকু জানার জেনেছে। তাকে বিস্মিত করে আবার সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তার মনে, ওই নির্জন পরিবেশে। বাচাল বৃদ্ধাটি বলে গেছে হ্যাডোর জিঘাংসার আরও কাহিনী, কৃষকেরা কেমন করে হয়েছে তার কোপের শিকার, হয়েছে শস্য-ভাণ্ডারও। সরকারী পেয়াদার সঙ্গে বাদানুবাদের ফল দাঁড়িয়েছে—এক বছরের মধ্যে লোকটা বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। প্রতিবেশী এক জমির মালিক জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করায় তার খামারের প্রতিটি জীব দুরারোগ্য রোগের শিকার হয়েছে—খামার বিধ্বস্ত হয়েছে তার...

বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গের প্রলেপ থাকলেও বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে কিন্তু ত্রাসের স্বাক্ষর পরিস্ফুট।

তাই, হ্যাডো যে জমি চেয়েছে, পেয়েছে—কারণ নিলামে কেউ দাঁড়াতে সাহস করেনি তার বিরুদ্ধে। জলের দরে কিনেছে সে

জমি।

প্রথম সুযোগেই তাই মার্গারেটের সন্ধান করেছে আর্থার। বৃদ্ধা কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়েছে—কেউ-ই জানে না তার কথা। বাড়ির বাইরে আসেনি সে কখনো।

তবে, ভেতরে একা একা তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হ্যাডোর সদ্ভাব বহুদিনই বিনষ্ট, তবু, মার্গারেট প্রথম এখানে আসতে, প্রতিবেশী এক জমিদারের বৃদ্ধা মা দেখা করতে গিয়েছে। কিন্তু তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। মহিলা আর যাননি।
—বেচারা, কোনো কাজেই আসবেনা মেয়েটা। তবে, লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী নাকি সে।

আর্থার তার ঘরে চলে গেছে এরপর। রাত শেষ হবে কখন চিন্তায় বিভোর হয়েছে। মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করার সোজা কোনো রাস্তা নেই তাহলে। কারণ ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ফেরী-ওলারা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না সেখানে। তবে, একটা কথা তো জানা হয়েছে; মার্গারেট সকাল বিকেল একা একাই বেড়ায়। ওই-সময়ে দেখা মিলতে পারে তার।

আর্থার পার্কে অপেক্ষা করাই স্থির করলো। সবার অগোচরে।

পরের দিন—গতসপ্তাহের গ্রীষ্ম প্রায় নেই,—বিষণ্ণ আকাশ ছেয়ে যখন চলেছে মেঘের আনাগোনা, আর্থার স্কেন-এর নিশানা জানতে পথে নামলো। তিন মাইল হেঁটে চললো সে। শুকনো মাটির রাস্তা, এখানে সেখানে গাছের ছাড়াছাড়ি। প্রাগৈতিহাসিক কালে টাইটানদের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের স্বাক্ষর হিসেবে থেকে গেছে পাথরের স্তূপ—চারাগাছের আবর্জনা। তবে সোজা দাঁড়িয়ে নেই কোনোটাই। গাছগুলোর একটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—বাজ পড়ে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে সেটা, পাতাহীন। বিকৃত ডালপালা নিয়ে গাছ মানুষের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে···যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে।

বিচিত্র শব্দে বইছে বাতাস। আর্থারের মনটা দমে গেলো, পথ চলতে চলতে। এমন নির্জন প্রান্তর চোখে পড়েনি তার আগে কখনো...

পার্কের গেটের কাছটায় পৌঁছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো আর্থার। রাস্তার শেষে, গাছের ফাঁকে এক জমকালো বাড়ি নজরে পড়ছে। পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে চললো সে—হঠাৎ একটা জায়গায় পৌঁছলো, যেখানে একটা কাঠের পাটাতন ভেঙে পড়ে রয়েছে। রাস্তাটা পুরো দেখে নিলো সে—না, কেউ নেই। আস্তে এগিয়ে গেলো—বেড়ার একটা অংশ ভেঙে ঢুকে পড়লো।

গভীর বন তার চারপাশে এখন। পথ নেই। সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে আর্থার। গাছপালা এত ঘন আর উঁচু, তাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কাছ থেকেও। অতীতে কোনো-সময়ে হয়তো এগুলোর যত্ন ছিলো, কিন্তু অবহেলায় এখন বন গভীর। এমনই এলোমেলো বেড়ে গেছে সেসব, অতীতের সুবিন্যস্তভাব বিলুপ্ত—পথচলা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

পায়ে চলা একটা পথের সন্ধান মিললো শেষটায়, ঘাসের ফাঁকে সে পথ। ধীরপায়ে এগোলো সে পথে।

অলিভার হ্যাডোর মুখোমুখি হলে কি করবে, ভাবনা তার। তবে, সরাইখানার বৃদ্ধা জানিয়েছে লোকটা কচিৎ বেরোয় বাড়ি থেকে। বাড়িতেই থাকে সে বন্দী, সারাদিন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনগুলোতেও নাকি ধোঁয়া দেখা যায় বাড়িটা থেকে বেরোতে, উদ্ভট গল্পও প্রচলিত—সেখানকার শয়তানের আসর সম্পর্কিত।

হঠাৎ হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে আর্থারের, কারণ মার্গারেটকে দেখতে পেয়েছে সে,—এত নিঃশব্দে, যে তার আগমন কানে শোনে নি সে।

পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েছে মার্গারেট... কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়লো আর্থার, আওয়াজে চমকিয়ে দিতে

চায় না মার্গারেটকে সে। কেমন করে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করবে, ভেবে চলেছে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা উপায় ঠিক করতে হবে, আর চিৎকার করে উঠবে না মেয়েটা।

—মার্গারেট। আস্তে ডাকলো আর্থার।

মার্গারেট অনড়। আরও একটু জোরে পুনরুচ্চারণ করলো আর্থার নামটা। তবুও কোনো সাড়া এলো না।

মার্গারেটের সামনাসামনি দাঁড়ালো গিয়ে আর্থার,—মার্গারেট—

মার্গারেট চোখ তুলে চাইলো, শান্ত চোখ। আর্থারকে যেন কোনোকালেই দেখেনি, এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। একটা মানুষ শুধু তার সামনে দাঁড়িয়ে, এটুকুই বাস্তব।

—মার্গারেট, আমাকে চিনতে পারছো না?

—কি চাও তুমি? অবিচল গলা মার্গারেটের।

আর্থার হঠাৎ হতবুদ্ধি। কি বলবে ভেবে পায়না সে। মার্গারেট দেখে চলেছে তাকে, স্থির চাহনি তার। তার শান্তভাব চলে গেলো হঠাৎই এবার,—তুমি, সত্যিই তুমি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে মার্গারেট।

—আমি তো ভেবেছিলাম অশরীরী কেউ—

দাঁড়িয়ে পড়েছে মার্গারেট।

—কি বলছো তুমি, মার্গারেট? কি হয়েছে কি, তোমার? মার্গারেট আস্তে হাত বাড়িয়ে ছুঁলো আর্থারকে।

—আমি রক্তমাংসের মানুষ, ঠিকই। আর্থার ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলো।

মার্গারেট চোখ বুজে ফেললো, নিজেকে ফিরে পেতে চেষ্টা করছে,—এমনসব বিভ্রান্তিকর জিনিষ দেখি আজকাল, ভাবলাম এটাও বোধহয় ওর কোনো চাল।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো মার্গারেট,—কিন্তু, এখানে কি করছো তুমি? চলে যাও। এলে কি করে? আমাকে—একা থাকতে দিচ্ছো না কেন।

—তোমার সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এই দুর্ভাবনা পেয়ে বসেছে আমাকে। তাই আসতে হলো।

—দোহাই তোমার, চলে যাও তুমি। আমার ভালো করতে পারবে না তুমি। তোমাকে যদি এখানে দেখতে পায় ও—

থেমে গেলো মার্গারেট, চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে তার।

আর্থার তার হাত ধরে ফেললো,—মার্গারেট, আমাকে যেতে বলো না।—ঈশ্বরের দোহাই—আমাকে বলো—কি হয়েছে তোমার বলো। আমি—বড্ড ভয় পাচ্ছি—

আর্থার মার্গারেটের পরিবর্তনে আতঙ্কিত, দু' মাসে তার সব গেছে,—গায়ের রং গেছে—মৃতের ধূসরতা নেমেছে চোখ দুটোয়। মার্গারেটের যৌবন যেন হঠাৎ উধাও—কোনো মানসিক রোগের শিকার।

—তোমার কি হয়েছে? আর্থার মার্গারেটের চোখে চোখ রেখে বললো।

—কিছুই না। মার্গারেট তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলো, যদিও উদ্বেগমাখা তার দৃষ্টি।—তুমি চলে যাচ্ছো না কেন—এত নির্দয় হতে পারো কি করে তুমি?

—তোমার জন্যে আমার কিছু করা দরকার। আর্থার নাছোড়বান্দা।

মাথাটা ঝাঁকালো মার্গারেট,—বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কিছুই আমার কাজে আসবে না, এখন।

কথাগুলো যেন শবের মুখ থেকে উচ্চারিত—আমাকে নিয়ে ও কি করতে চায়, জেনেছি অবশেষে। তার গবেষণার জন্যে দরকার আমাকে—সময় কমে আসছে ক্রমে…

—তোমাকে 'চায়' বলতে কি বোঝাতে চাইছো?

—ও আমার—আমার জীবন চায়…

আর্তস্বর বেরিয়ে এলো আর্থারের গলা থেকে একটা। মার্গারেট হাত তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো,—এখন আর বাধা দেবার

কোনো অর্থ হয়না। কোনো কাজ হবে না তাতে—আমার মনে হয় সেই মুহূর্ত আমার জীবনে এলে আমি খুশীই হবো। অন্তত যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই মিলবে।

—কিন্তু, তুমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছো—

—জানি না। তবে ও যে হয়েছে এটা জেনেছি।

—কিন্তু তোমার জীবন বিপন্ন—চলো এখান থেকে চলে যাই। তুমি তো মুক্ত—ও তোমাকে বাধা দিতে পারে না।

—একই ফল হবে। আবার ফিরে আসতে হবে, আগেরবার যেমন হয়েছিলো। মার্গারেট করুণস্বরে বলে চললো,—আমি মুক্ত ভেবেছিলাম তখন—কিন্তু পরে জেনেছি ও ডাকছে আমাকে। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছি, পারিনি। চলে আসতে হয়েছিলো।

—কিন্তু একটা বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে তুমি একা রয়েছো এটা যে ভাবা যায় না।

—আজকের জন্যে আমি নিরাপদ। কারণ গবেষণার ব্যাপারটা গ্রীষ্ম ছাড়া হবে না. প্রচণ্ড গ্রীষ্ম দরকার। এ' বছর যদি তেমন গরম না পড়ে, পরের বছর পর্যন্ত বাঁচবো।

—ওঃ মার্গারেট, অমন করে কথা বলো না। আমি—তোমাকে ভালবাসি—সবসময়ে তোমাকে আমার কাছে রাখতে চাই। আমার সঙ্গে যাবে না? তোমার চিকিৎসার ভার নিতে চাই আমি। আমি কথা দিচ্ছি—তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

—তুমি আর আমাকে ভালবাসো না—আমার জন্যে পড়ে আছে শুধু করুণা—

—এ' কথা সত্যি নয়।

—ঠিকই বলছি। দেশে থাকতে তা লক্ষ্য করেছি আমি। তোমাকে সেজন্যে দোষ দিতে পারি না। তুমি যাকে ভালবাসতে, আমি সে মেয়ে নই—অন্য কেউ। তুমি যে মার্গারেটকে চিনতে, আমি সে নই।

—আমি আর কারুর জন্যে ভাবি না, তুমি ছাড়া।

মার্গারেট তার হাতটা রাখলো আর্থারের কাঁধে,—বদি

কোনোদিন আমাকে ভালবেসে থাকো—তাহলে তোমাকে চলে যেতে বলবো। আমার কি অবস্থা করেছো তুমি বুঝতে পারছো না। শোনো—আমি মরে গেলে সুসিকে বিয়ে কোরো—ও তোমাকে ভালবাসে, সারা অন্তর দিয়ে। তোমার ভালবাসার যোগ্য মেয়ে সে।

—মার্গারেট, যেও না। আমার সঙ্গে এসো—

—শোনো। মার্গারেট ভীতস্বরে বললো,—সাবধানে থেকো। তুমি যা' করেছো তার সেজন্যে ও তোমাকে ক্ষমা করবে না, পারলে—খুন করবে—

কোনো আওয়াজ যেন তার কানে এসেছে, শুনে ছুটে চললো মার্গারেট। আকস্মিক ভয়ে তার সারা মুখ বিকৃত,—যাও—দোহাই তোমার—যাও—যাও···

মার্গারেট সরে গেলো তার কাছ থেকে, আর আর্থার তাকে ধরবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ফিরে চললো আর্থার, বুক ফেটে গেছে তার···

আর্থার থামলো। ডাক্তার পোর্হোয়েত্‌র দিকে চোখ তার। ডাক্তারের চোখেও ভাবনা, বুকশেলফের দিকে এগিয়ে গেলো সে,—আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও, এখন?

—লোকটা পাগল হয়ে গেছে মনে হয় আমার। ওর মা কেন পাগলাগারদে ছিলেন তাও জেনেছি। ভাগ্যক্রমে লণ্ডন হয়ে যাবার পথে দেখাও করেছি সেখানকার অধ্যক্ষের সঙ্গে। হ্যাডোর প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কেও তার যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গেছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় তাও জানিয়েছে সে। আমি সোজা এখানে চলে এসেছি, কারণ তোমার উপদেশ দরকার আমার। লোকটা সুস্থ নয় যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে কি মানুষের জীবন নিয়ে কোনো গবেষণা করার সম্ভাবনা থাকছে তার?

—থাকেই। পোয়েরো গম্ভীর।

সুসি শিউরে উঠলো। মর্কি কর্লোতে যে গুজবের কথা তার কানে এসেছে··

—ওরা বলেছিলো হ্যাডো নাকি জীবিত প্রাণী সৃষ্টির কাজে মেতেছে, ম্যাজিকে। ডাক্তারের দিকে তাকালো ও, আর্থারের উদ্দেশেই বললো কথাগুলো —তুমি আসার কিছু আগেই ডাক্তার প্যারাসেলসাসের সেই বইটার কথা বলছিলেন, মানুষের রক্তে দানবদের আপ্যায়িত করার কাহিনী।

আর্থারের গলায় আর্তনাদ উঠলো।

—মার্গারেট সম্পর্কে যা' জানা গেলো সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়. যাদুবিত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এ' সবই 'নারীঘটিত'।

—কিন্তু করার কি আছে? আর্থার ব্যাকুল।—একটা বদ্ধ উন্মাদের হাতে ওকে ছেড়ে রাখা যায় না—এতক্ষণে হয়তো মারাই গেছে মার্গারেট।

—'গিলে দে রাই'য়ের নাম শুনেছো? মানবিক আত্মত্যাগের ওইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কোন দেশের মানুষ ছিলো সে, আমি জানি। আজও সন্ধ্যের পর সে অঞ্চলে মানুষ চলতে চায় না—সেই প্রাসাদের ত্রিসীমানায়, সেখানে ওই ভয়ঙ্কর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

—কিন্তু মার্গারেটের ওই বিপদ জানার পরও কিছু করার থাকছে না ভাবতে আমার মনটা—

—অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, পোয়েরো তার কথার মধ্যেই বলে উঠলো।

—অপেক্ষার কাল যদি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হবে আমাদের।

—ভাগ্যি আমরা সভ্য জগতের মানুষ। হ্যাডোরও প্রাণের ভয় আছে। আমাদের ভীতি অমূলক বলেই মনে হয় আমার।

আর্থারের মনটাকে প্রসঙ্গান্তরে নেওয়া দরকার ভেবে সুসি এবার বললো,—ভাবছি দিনদুয়েকের জন্যে শার্টার্স-এ যাবো। মিসেস

র্ ফিল্ডকেও সঙ্গে নেবো। আমার সঙ্গে যাবে? দুনিয়ার সেরা গির্জাটা, বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গাও। এখানে বা লণ্ডনে থেকে কোনো কাজ হচ্ছে না যখন তোমার, প্র্যাকটিকাল কিছু ভাববার সুযোগ পাবে।

ডাক্তার পোরোয়েও বুঝলো ব্যাপারটা, সেও গলা মেলালো সুসির সঙ্গে। আর্থার তর্ক করার ভাষাও হারিয়েছে যেন, অবসাদে সারা মন তার বিপর্যস্ত—সায় দিলো অনিচ্ছায়।

পরের দিনই শার্টার্শে পৌঁছলো ওরা। অনেক সময় কাটালো তারা সেই জমকালো গির্জার চত্বরে। পরে ঘুরতে বেরোলো। আর্থার স্বীকার করতে বাধ্য পরিবর্তনটা ভালোই মনে হচ্ছে তার। সুসি তাকে রাজী করালো—ব্রিটানীতে আরও কয়েক সপ্তাহ কাটা-বার জন্যে ডাক্তার পোরোয়ের সঙ্গে সময়টা মন্দ কাটবে না, কারণ বাল্যের দিনগুলো কেটেছে ডাক্তারের এইখানেই।

প্যারিসে ফিরলো ওরা। স্টেশানে সুসিকে ছেড়ে দিলো আর্থার, ঘণ্টাখানেক পরে রেস্তোরাঁয় খানার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। ধন্যবাদও দিলো তাকে, তার মানসিক উন্নতির সহায়তা করার জন্যেও—আমার অবস্থা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছিলো, হিস্টি-রিয়ার অবস্থা—তুমি অনেক করেছো, দেবদূত প্রেরিত যেন; জানতাম, করার কিছুই থাকছে না, তবুও কিছু করার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেছি। এখন সমস্ত কিছু পরিস্কার—ম্যাজিকের বুজরুকিতে ভুলে ছিলাম এতোকাল। হ্যাডো মার্গারেটের কোনো ক্ষতি করতে পারবে, এটা অসম্ভবই মনে হচ্ছে আমার এখন। লণ্ডনে ফিরে গিয়েই আমার আইনজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করবো। কিছু একটা করতে পারবোই। যদি লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে—ঠেকাতে হবে তাকে। মার্গারেটের বিপদ কেটে যাবে। আর, তোমার কথাও ভুলবো না, যা করলে তুমি—

সুসি কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিলো, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি তার। সে জানে, মার্গারেট যদি ফিরে আসে, আর্থার তার কথা ভুলে যাবে। তবে, সে তিক্ত স্মৃতি মনে আনার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করলো। আর্থারকে ভালবাসে সে, তার জন্যে কিছু করতে পেরে খুসী সে।

হোটেলে ফিরে গেলো সুসি। পোশাক পাল্টে নিয়ে সিয়ে নয়ারের দিকে হেঁটে গেলো। প্যারিসে ফিরে আসার আনন্দ সবসময়েই তার মনকে স্পর্শ করে। খুসীভরা চোখে তাকালো সে গাছপালাগুলোর দিকে। হলদে ট্রামগুলোর শ্লথগতি লক্ষ্য করছে—অগুনতি মানুষের যাতায়াতও।

ডাক্তার পোরোয়ে তার অপেক্ষায় ছিলো। ওকে দেখে সেও খুসীর ভাব ফোটালো চোখে। আর্থারের প্রসঙ্গে আলোচনা করলো ওরা। লোকটা দেরী করছে কেন?

আর্থার এলো শেষটায়। ওরা দুজনেই চোখ তুলে তাকালো—সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে...

—তোমরা আছো এখানে! আর্থার উন্মাদের গলায় বলে উঠলো। মুখচোখ অস্থির তার, এত ভেঙ্গে পড়তে কখনো দেখেনি তাকে ওরা।

—হোটেলে গিয়েছিলাম, অল্পের জন্যে পাইনি তোমাকে, সুসির দিকে ফিরলো আর্থার।—ওঃ। আমাকে চলে যেতে বাধ্য করলে কেন বলতো?

—কেন। কি হয়েছে কি? সুসির গলা কাঁপছে।

—মার্গারেটের সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।

সুসি উঠে দাঁড়ালো, আর্তনাদ বেরিয়ে গেলো তার গলা চিরে, —কি করে জানলে?

একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আর্থার তার দিকে, লজ্জা পাচ্ছে যেন। তবু, তাকিয়েই আছে সে, তার বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াসে,—আমার—মনে হচ্ছে—কর্কশ, কঠোর গলা

আর্থারের।

—কি বলেছো কি?

—হ্যাঁ। হঠাৎই মনে হলো আমার। কেন, বলতে পারবো না। কিছু একটা ঘটেছে, বলতে পারি শুধু।

পায়চারী শুরু করে দিলো আর্থার। উত্তেজনার শিকার সে—যারপরনাই। সুসি আর ডাক্তার দেখে চলেছে তাকে। অসহায়। ওকে সান্ত্বনার কিছু বলতে চায় তারা, কিন্তু কি বলা যায়।

—কোনো কিছু ঘটে থাকলে, নিশ্চয়ই জানতে পারতাম আমরা।

সুসির কথায় তার দিকে ফিরলো আর্থার, চোখদুটো জ্বলছে তার,

—কি করে চলেছো তুমি জানতে পারতাম?

মার্গারেট অসহায়। ইঁদুরের ফাঁদে পড়েছে মেয়েটা।

—কিন্তু বন্ধু, এভাবে ব্যাপারটা নিজের মত করে বললে চলবে কেন? ডাক্তার কথা বললো এবার,—তোমার কাছে কোনো রুগী এসে এভাবে কথা বললে কি করতে তুমি?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিলো আর্থার অধৈর্যভঙ্গিতে, বলতাম—বলতাম—সে নিতান্তই বেসামাল—

—তাহলে?

—তবু, ভুলতে পারছি না যেন, অনুভূতি থেকেই যাচ্ছে। সারারাত ধরে তর্ক করেও আমার মাথা থেকে তা বের করে দিতে পারবে না তোমরা। মার্গারেট আমার সামনে মরে পড়ে আছে দেখলেও অবিশ্বাস করবো না।

—তা, আমাদের কি করতে বলো? সুসি সাগ্রহগলায় বললো।

—আমার সঙ্গে তোমাদের দুজনকেই ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। এখুনি বেরিয়ে পড়লে বিকেলের ট্রেনটা ধরা যায়।

সুসি উঠে পড়লো। নিশ্চুপ সে। ডাক্তারের কাঁধে হাতটা রাখলো সে,—এসো। ফিসফিস গলা তার।

মাথা হেলিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার।

—বাইরে ট্যাকসি রেখেই এসেছি। আর্থার দরজার দিকে এগোলো।

—সুসির জামাকাপড়ের কি হবে? ডাক্তার প্রশ্ন রাখলো।

—সেজন্যে অপেক্ষা করতে পারবো না। ঈশ্বরের দোহাই—তাড়াতাড়ি এসো—

সুসি জানে ট্রেন ধরার সময় যা আছে হাতে, তাতে কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আর্থারের মুখ চেয়ে তা থেকে নিবৃত্ত হলো সে।

—ঠিক আছে। ইংল্যাণ্ডেই পাবো যা দরকার।

স্টেশানে যাবার নির্দেশ দিলো আর্থার চালককে।

—একটু স্থির হওতো। সুসি অনুনয়ের গলায় বললো,—এই অবস্থায় কারোর কোনো কাজেই আসছো না তুমি!

—আমার মনে হচ্ছে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে—

—ননসেন্স! মার্গারেট সুস্থ আছে। নিরাপদও।

আর্থারের কাছ থেকে এর কোনো জবাব এলো না। স্টেশানের চত্বরে ট্যাকসিটা ঢুকতে তার স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো।

ইংল্যাণ্ডের সেই ভয়ঙ্কর যাত্রার কথা বিস্মৃত হতে পারেনি সুসি কোনোদিন। খুব সকালেই পৌঁছেছিলো ওরা, এবং না থেমেই ইস্টনের দিকে রওনা হয়ে গেলো। গত তিনচার দিন অস্বাভাবিক গরম পড়েছে। এবং দিনের প্রারম্ভেই—রাস্তাঘাট বাতাসহীন, গুমোট। ট্রেনও ঠাসা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সুসির মাথা ধরেছে কিন্তু আর্থারের উদ্বেগ বাড়তে না দেওয়ার জন্যে নিজেকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করছে সে। ডাক্তার পোরোয়ে তার সামনে বসে। নিদ্রাহীন রাতগুলোর পর চোখ ভারী হয়ে এসেছে তার, বসে গেছে চোখমুখ তার। শ্রান্তও। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছেছে তার ভেনিং-এ। উত্তরের ওই অঞ্চলে আরও ঠাণ্ডা

আশা করেছিলো সুসি। কিন্তু আশা বিফল হলো। ছোট্ট স্টেশানটা থেকে সরাইখানার দিকে যেতে অনেক কষ্টের পথ পেরোতে হলো ওদের।

আর্থার তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলো পূর্বাহ্নেই, বাড়ীওলী তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আর্থারকে চিনলেনও। আর্থার সাগ্রহে প্রশ্ন রাখতে গেলো সে চলে যাবার পর কোনো কিছু ঘটেছে কিনা, কিন্তু কি ভেবে নীরব রইলো। পরে সানন্দস্বরে সম্ভাষণ জানালো,
—কি খবর, মিসেস স্মাইদার্স, আমি চলে যাবার পর কিছু ঘটেছে?
—নিশ্চয়ই সেসব আপনার কানে যায়নি, স্যর? বৃদ্ধা গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন।

আর্থারের কাঁপুনি শুরু হলো, এক অতিমানবীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে।
—লোকটা কি গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি? আর্থার হালকা হতে চাইলো।
—না, স্যর। বেচারা—মহিলাটি মারা গেছে।

আর্থারের মুখে কথা নেই। পাথর বনে গেছে সে। সন্ত্রস্ত চোখে শুধু তাকিয়ে আছে সে।
—বেচারা!—হঠাৎই গেলো নাকি? সুসি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো।

বৃদ্ধা এবার সুসির দিকে ঘুরলো, কারুর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ব্যস্ত সে। আর্থারের দুঃখ তার মন স্পর্শ করেনি যদিও।
—হ্যাঁ। কেউই ধারণাও করতে পারেনি। হঠাৎই গেলো। আজ সকালেই কবর দেওয়া হয়েছে তাকে।
—কি হয়েছিলো? সুসির চোখ কিন্তু আর্থারের মুখে ধরা। ভাবনা হলো তার—আর্থার চৈতন্য হারাতে পারে। ওকে এসবের বাইরে নিয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু কিভাবে সেটাই বুঝতে পারছে না।

—হার্টের ব্যায়রাম বলছে লোকে। বেচারা! মরে বেঁচেছে

—একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি, মিসেস স্নাইদার্স। বড্ড ক্লান্ত লাগছে—

—হ্যাঁ, মিস। এখুনি করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা হুড়মুড়িয়ে বেরোলো। সুসি দরজার খিল তুলে দিলো। আর্থারের হাত ধরলো,—আর্থার,—আর্থার—

ভেবেছিলো ভেঙ্গে পড়বে আর্থার। ডাক্তারের দিকে তাকালো সে এবার। ডাক্তার অসহায়, দাঁড়িয়ে.

—তুমি এখানে থাকলেও কিছু করতে পারতে না। শুনলেই তো বৃদ্ধা কি বলবেন। মার্গারেট যদি হার্টে-র অসুখে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তোমার সন্দেহ অমূলক।

হাত ছাড়িয়ে নিলো আর্থার—প্রায় ছিনিয়েই।

—দোহাই, কথা বলো—আর্থার। সুসি অনুনয় জানালো।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সুসির উদ্বেগ বাড়ছে। এর চেয়ে যদি লোকটা একটু চোখের জলও ফেলতো। ডাক্তার ধীরপায়ে এগিয়ে গেলো আর্থারের কাছে,—বেশী সাহস দেখাবার চেষ্টা না করাই ভাল, বন্ধু—একটু দুর্বলতা দেখালে দুঃখের লাঘবই হবে।

ওরা পিছিয়ে গেলো। নিঃশব্দে তাকিয়ে ওর পানে। বাড়ী-ওলীর পায়ের শব্দ পেলো, চা নিয়ে আসছেন। দরজা খুলে দিলো সুসি। বৃদ্ধা চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে চলে যাচ্ছেন, এমন সময়ে আর্থার হঠাৎ বলে উঠলো,—মিসেস হ্যাডো হার্টের অসুখে মারা গেছে জানলেন কি করে? কঠোর গলায় প্রশ্ন তার। বিচিত্র গলায় কথাগুলো বের করে দিলো আর্থার, বৃদ্ধা মুহূর্তের জন্যে চমকে তাকালেন,—ডাক্তার রিচার্ডসন তো তাই বললেন আমাকে।

—তিনিই কি দেখছিলেন ওকে?

—হ্যাঁ। হ্যাডো তাকেই ডেকেছেন স্ত্রীর চিকিৎসায়, একাধিকবার।

—কোথায় থাকেন উনি?

—স্টেশানের কাছে সাদা বাড়িটাতে থাকেন।

আর্থার কেন এ'সব প্রশ্ন করছে বুঝে উঠতে পারেন না বৃদ্ধা।

—হ্যাডো কি অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যর। এমন ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি আমি কাউকে আগে।

—ঠিক আছে। যেতে পারেন আপনি।

সুসি চা ঢেলে আর্থারের দিকে বাড়িয়ে দিলো। আর্থার চা খেলো। রুটি মাখনও। সুসি কিছুটা আশ্চর্য—আর্থারকে বুঝে উঠতে পারে না সে। তার চোখমুখ অনেকটা সংযত এখন, অস্থিরতার ভাব চলে গেছে—শ্রান্তির চিহ্নও। দৃঢ়আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। শেষে কথা বললো আর্থার,—আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মার্গারেটের হার্টের কোনো দোষ ছিলো না।

—কি করবে?

—করবো?

এক আশ্চর্য কাঠিন্য তার চোখে, যখন সুসির মুখোমুখি হলো আর্থার,—ওই লোকটার গলায় একটা দড়ি ঝোলাবো আমি। আর, আইন যদি আমার পক্ষ না নেয়,—ওকে আমি—খুন করবো।

লাফিয়ে উঠলো পোরোয়ে,—মাই, মন আমি, ভাউ এন্তে ফাউ!

আর্থার তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো, সক্রোধে। থামিয়ে দেবার জন্যে। মুখভাব নৃশংস,—আমাকে ছেড়ে দাও। চোখের জল আর অনুতাপের দিন চলে গেছে। এ' কমাস আমার ওপর দিয়ে যা গেছে, মার্গারেটের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলবার অবকাশ নেই। সব শুকিয়ে গেছে। তবে—আমি নিশ্চিত, ওর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আর, ওই লোকটা যতদিন বেঁচে থাকবে আমার বিশ্রাম নেই—

চোয়াল শক্ত হয়ে এলো তার, বাহু প্রসারিত। হ্যাডোর গলা মটকাবার সুযোগ খুঁজেছে সে অনেক দিন থেকে...

—এই ডাক্তার হাঁদার খোঁজে চললাম আমি। পরে স্কেন-এ।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। খুসি প্রস্তাব দিলো।
—ভয়ের কোনো কারণ নেই। নিজের হাতে আইন নেবো না আমি, তারা তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করা পর্যন্ত।
—আমি যাবো তোমার সঙ্গে।
—তোমার ইচ্ছে।

হেঁটে চললো ওরা ডাক্তার রিচার্ডসনের বাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রবীন মানুষ রিচার্ডসন, উত্তর-পঞ্চাশের। দাড়ি সাদা হয়ে এসেছে। নীল চোখদুটো উজ্জ্বল। স্ট্যাফোর্ডশায়ারের টান কথায়। চেহারায় কিছুটা কৃষকের, কিছুটা বা ব্যবসাদারের প্রতিচ্ছবি—প্রথম দর্শনে মানুষটাকে বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয় না।

আর্থার আর তার সঙ্গীদের কনসাল্টিং-রুমে বসানো হলো। কিছু পরেই ডাক্তার ঢুকলো। ফ্ল্যানেল আর পুরনো-ফ্যাসানের একটা র‍্যাকেট হাতে,—আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। মিসেস রিচার্ডসনের ক'জন বান্ধাবী চায়ের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, খবর পেয়ে তারই মধ্যে উঠে এসেছি।

রিচার্ডসনের উচ্ছ্বাস কেমন বেসুরো ঠেকলো আর্থারের কানে, —মিসেস হ্যাভোর মৃত্যুসংবাদ এইমাত্র পেলাম আমি। আপনার কাছে এলাম সে সম্পর্কে কিছু জানতে।

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো রিচার্ডসনের চোখ, অবশ্যই বোকাভাব ছড়ানো তাতে,—সেজন্যে আমার কাছে না এসে ওঁর স্বামীর কাছে গেলেন না কেন? তাঁর কাছ থেকেই তো সব জানতে পারতেন।
—একই পেশার মানুষ আমিও, তাই দেখা করতে এলাম। সেন্ট লিউক্স হাসপাতালে আছি আমি। রিচার্ডসনের হাতে ধরা তার কার্ডটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলো আর্থার—আর ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার পোরোয়ে। মালটা ফিভারের ওপর তার লেখার ব্যাপারে নিশ্চয়ই নামটা অপরিচিত নয়।

—ব্রিটিশ মেডিকাল জার্নালে একটা লেখা পড়েছি বোধহয়।

রিচার্ডসনের হাবভাবে বিন্দুমাত্র মিত্রতার ছোঁয়া নেই। লণ্ডনের বিশেষজ্ঞদের জন্যে নেই তার সহানুভূতিও। এবং তারই প্রকাশ ঘটছে। ওদের সর্বদর্শী মনোভাবকে ব্যঙ্গ করতে পারায় খুশী সে,—এখন কি করতে পারি আপনার জন্যে, মিস্টার বারডন?

—মিসেস হ্যাডো ঠিক কিভাবে মারা গেলেন জানালে আনন্দিত হবো।

—এণ্ডোকার্ডাইটিস। সরল কেস।

—মৃত্যুর কতক্ষণ আগে আপনাকে ডাকা হয়েছে বলবেন?

ডাক্তার ইতস্তত করলো, লাল্চে মেরে গেলো,—এ' ধরণের সওয়াল-জবাবের ব্যাপার আমার ঠিক পছন্দ নয়। ফেটে পড়লো সে—চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি কার্ডিয়াক রোগ সম্পর্কে আপনার জ্ঞানগম্যি তেমন প্রচুর নয়। রোগটা তেমন কঠিন ছিলো না। আর---সম্ভাব্য সব কিছুই করা হয়েছে। আর কিছু জানা-বার আছে বলে মনে হয় না।

আর্থার কিন্তু তার উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দিলো না,---কতবার দেখেছেন তাকে?

—আপনার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এ'ধরণের প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে বলে মনে করি না।

—পোস্টমর্টেম করেছেন কি?

—মোটেই না। প্রথমত, প্রয়োজন ছিলো না। যেহেতু মৃত্যুর কারণ পরিস্কার, দ্বিতীয়ত; আপনার জানা উচিত—যে, পরিজনেরা এ'সব জিনিষ চানও না। আপনারা—হার্লে স্ট্রীটের সাহেবরা ঠিক প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ব্যাপার-স্যাপারগুলো জানেন না। ফালতু পোস্টমর্টেমের সময়ও ছিলো না।

একমুহূর্ত নিঃশব্দ রইলো আর্থার। লোকটা মার্গারেটের মৃত্যুর ব্যাপারে তেমন সন্দিগ্ধ নয়, তবে—তার বোকামি ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়েছে এটা পরিস্কার। আর্থারের প্রতিবন্ধকতার সম্ভাব্য সমস্ত

উপায়ের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর সে। আর, সেগুলোর অন্যতম হবে—সে মৃত্যুকালীন যে সার্টিফিকেট দিয়েছে তা অসাবধানতা প্রসূত তা যদি জানাজানি হয়ে যায়। স্ক্যাণ্ডাল এড়াতে তাই সবই করতে প্রস্তুত সে।

আর্থার তবু কথা বললো,—আপনাকে খুলে বলতে আপত্তি নেই আমার—আমি কিন্তু আদৌ সন্তুষ্ট নই, ডাক্তার রিচার্ডসন। ভদ্রমহিলার মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে মেনে নিতে পারছি না।

—ননসেন্স! চিৎকার করে উঠলো, রিচার্ডসন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি। আর—আর আমার পেশাগত সুনাম বাজি রাখতে পারি সেক্ষেত্রে।

—আপনি ভুল করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।

—মৃত্যুর কারণটা তাহলে আপনার মতে কি জানতে পারি? শ্লেষ ঝরলো রিচার্ডসনের কথায়।

—এখুনি বলতে পারছি না।

—দিব্যি করে বলতে পারি—আপনার মাথার ঠিক নেই। ছেলে-মানুষী শুরু করেছেন। আপনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলে দাবী করছেন...

—সেরকম কোনো কিছুই তো বলিনি।

—যাইহোক, অনেক গবেষণামূলক কাগজপত্র তো পড়েছেন বিদগ্ধ সমাজে। ছেপেছেনও সেগুলো। আর স্ট্যাফোর্ড শয়ারের এক অজ্ঞ চাষার মত কাহিনী নিয়ে এসেছেন,—পেটের রোগ হয়েছে যেখানে কেউ নাকি তাকে বিষ খাওয়াতে চায়। পেশাগত-ভাবে নামী চিকিৎসক বলে খ্যাতি থাকতে পারে আপনার, তবে যে রুগী আমি নিজে দেখেছি তার সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশী জানি বলেই দাবী করবো, যে সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না।

—মৃতদেহ কবর থেকে তোলার নির্দেশ চাইবো ভাবছি। কাজেই, আমার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করলে-ভাল করবেন।

—না। করবো না। আপনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যসূচক কথাবার্তা

বলছেন,। কবর থেকে শব টেনে তোলার কোনো দরকার হচ্ছে না। আর, বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে বলতে পারি—আমার মতামতের দাম কিন্তু হার্লে স্ট্রীটের যে কোনো বিশেষজ্ঞের চেয়ে মূল্যবান বলে গ্রাহ্য হবে।

দরজার দিকে এগিয়ে সেটা খুলে ধরলো রিচার্ডসন। সুসি আর পোরোয়েই প্রথমে বেরোলো। আর্থার তাদের অনুসরণ করলো—চিন্তার ভারে জর্জরিত সে।

সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো রিচার্ডসন ওদের পেছনে।

ডাক্তার পোরোয়ে আর্থারের কাঁধে হাত রাখলো,—বিচারবোধ হারালে চলবে না, আর্থার। তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বলবো রিচার্ডসনের পক্ষেই সবকিছু। তোমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো হাতিয়ার নেই তোমার। এটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, যে সামান্য সন্দেহের বশে কবর খোঁড়ার নির্দেশ মিলবে।

আর্থার নিরুত্তর।

—হ্যাভোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন? ডাক্তার জানতে চায়—রিচার্ডসনের কাছে যা শুনলে তার বেশী কিছু আশা করা বাতুলতা।

—ওর সঙ্গে দেখা করবো মনস্থির করেছি। সংক্ষেপে জবাব দিলো আর্থার,—তোমাদের অবশ্য আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই।

—তুমি গেলে আমরা সঙ্গে থাকবো। দৃঢ় গলায় বলে উঠলো সুসি।

আর্থার গাড়িতে উঠে বসলো, কথা নেই মুখে। সুসিও তার পাশে উঠে বসলো। ডাক্তার পোরোয়েও উঠলো পেছনে। আর্থার চাবুক কষালো ঘোড়ার পিঠে। টাট্টু চলতে শুরু করলো জোর কদমে।

ভেনিং আর স্কেন-এর মাঝামাঝি গন্তব্যে পৌঁছলো তারা।

পার্কের গেটে ভাগ্যক্রমে তদারককারিনীকে পাওয়া গেলো, তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে ভেতরে নেবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রাস্তায় খেলা করছে বাচ্চাটা, ঢোকার কোনো আগ্রহই দেখা

যাচ্ছে না তার।

আর্থার লাফিয়ে নেমে এলো,—মিস্টার হ্যাডোর সঙ্গে দেখা করবো।

—তিনি বাড়িতে নেই। কর্কশগলায় উত্তর এলো। গেট বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করতে আর্থার তাড়াতাড়ি পা ঢুকিয়ে দিলো—

—জরুরী ব্যাপারে দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

—হ্যাডো সাহেবের নির্দেশ আছে, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া চলবে না!

—উপায় নেই। ভেতরে আসতেই হচ্ছে আমাকে।

সুসি আর ডাক্তার পোরোয়েও এগিয়ে এসেছে। ছেলেটাকে কটা পয়সা দিলো সে ঘোড়াটাকে ধরবার জন্যে।

—এখান থেকে বেরোন তো। ভেতরে আসতে পারছেন না, আপনারা যাই বলুন।

দরজা টেনে দিতে গিয়েও পারলো না সে, আর্থার পা ঢুকিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে। মহিলার প্রতিবাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে ঢুকলো সে। গাড়ির পথ দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো সে। মহিলাও সঙ্গে চলেছে, কণ্ঠে তিরস্কার ঝরছে। গেটে কেউ রইলো না, ফলে অন্যরাও অনুসরণ করলো।

—দরজার কাছাকাছি হয়তো পৌঁছবেন আপনি, কিন্তু মিস্টার হ্যাডোর সঙ্গে দেখা হবে না। তারস্বরে বলে চলেছে প্রৌঢ়া,—আপনাকে ঢুকতে দেওয়ার জন্যে আমার চাকরিটা যাবে!

সুসি বাড়িটা দেখছে। পুরণো কায়দায় তৈরী বাড়ি। এলিজাবেথীয় যুগের অনুকরণে। মেরামতির প্রয়োজন। বহুদিন বসবাসের অভাব ছড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে। বাগান বেড়ে গেছে এলোমেলো ভাবে—পথচলতি রাস্তায় গম্বুজের বিস্তার। এখানে সেখানে কাটাগাছ পড়ে, সরাবার মাথাব্যাথা নেই কারো। গৃহস্বামীর উদাসীন্যও প্রকট।

আর্থার দরজার বেল বাজিয়ে দিলো। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে

পড়লো সে শব্দ যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

দরজায় কেউ এলো এবার, এবং খোলামাত্র আর্থার সেটা বন্ধ হয়ে যাবে ভয়ে পা বাড়িয়ে দিলো। কলহপ্রিয় ঘরণীর মতই লাল হয়ে গেলো লোকটার মুখ—ওদের পার্কের ঢোকা নিয়ে সোচ্চার উষ্মাও প্রকাশ করলো,—সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। চলে যান। উনি ছাদে, কাছে কাউকেই যেতে দিচ্ছেন না। আর্থারকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে উঠলো ও,—সরে পড়, নাহলে পুলিস ডাকবো।

—বোকার মত কথা বলো না। হ্যাডো সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার আমাদের।

গৃহে তদারককারী সস্ত্রীক গালের ফোয়ারা, ছোটালো। আর্থার নিঃশব্দে শুনছে। সুসি আর পোরোয়ে পাশে দাঁড়িয়ে, উদ্বেগাকুল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওদের পাশে গলার আওয়াজ পেতে চমকে উঠলো। পরিচারক-পরিচারিকার গলায় নিস্তব্ধতা নামলো।

—কি করতে পারি তোমাদের জন্যে ?

ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে অলিভার হ্যাডো। নিশ্চল। সুসি ভয় পেয়ে গেলো, কারণ লোকটা শব্দহীন এসে হাজির হয়েছে। ডাক্তার পোরোয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, লোকটার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। তার মেদের বাহুল্য যেন এখন যথার্থ রোগের স্বাক্ষর। বিরাট বেচারা হয়েছে হ্যাডোর।

ভারী থাকে ভরে গেছে দেয়ালের নিম্নাংশ। চোখ পর্যন্ত মেদে ভরেছে গাল বেয়ে। ক্ষুদে মনে হয় চোখদুটো তাই। ভারী চোখের পাতার ভেতর দিয়ে মিশেছে দৃষ্টি তার। এক ভয়ঙ্কর চেহারা হ্যাডোর। কানদুটোও ফুলে উঠেছে। লতিও। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার কারণ মুখটা খোলা রেখেছে—চকচকে ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে···চুল উঠে গেছে আরও, শুধু এক গোছা চুল এক-কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বিস্তৃত।

টাকটা কেমন ভয়াবহ দেখাচ্ছে। পেটটা বিরাট হ্যাডোর,

দীর্ঘকায় মানুষ সে—তাই পিপের মত ঠেলে বেরিয়ে থাকে শরীরের মাঝের অংশ। হাতদুটোও কদাকার—লালচে মেরে গেছে, নরম—ঘামে চপচপে। প্রচণ্ডভাবে ঘেমে চলেছে হ্যাডো—কপালে ঘামের বিন্দু কামানো গালেও।

পরস্পরকে দেখলো ওরা কিছুক্ষণ, হ্যাডো তার পরিচারকদের দিকে ফিরলো,—যাও তোমারা!

সন্ত্রস্ত মানুষগুলো দৌড়ে বেরোলো, কে কার আগে যাবে। হ্যাডো সেদিকে তাকিয়ে রইলো—ঠোঁটে তার অমানবীয় একফালি হাসি।

এবার অতিথিদের দিকে এক পা এগিয়ে এলো হ্যাডো। সেই দুর্বিনীত ভঙ্গি—এবার বলো তো বন্ধুগণ, কি কাজে লাগতে পারি আমি তোমাদের?

—মার্গারেটের মৃত্যু সম্পর্কে জানতে এসেছি। আর্থার শান্তগলায় বললো।

চরিত্রানুগ, হ্যাডো তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো না। আর্থারের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো পোরোয়ের দিকে, পরে সুসির দিকে। ওর টুপিটার ওপর দৃষ্টিটা থেমে গেলো—সুসি অস্বস্তি বোধ করছে। কি বা পরিহাসের ব্যাপার মাথায় খেলছে লোকটার।

—আমার দুঃখে সমবেদনা জানাবার এটা প্রকৃষ্ট সময় বলে মনে হয় না আমার। শোকবার্তা যদি জানাবার থাকেই কিছু তাহলে ডাকে পাঠালে বাধিত হবো।

আর্থারের কপালে রেখা পড়লো, মার্গারেট অসুস্থ আমাকে জানাও নি কেন? প্রশ্ন করলো সে।

—তোমার কাছে আশ্চর্যের মনে হলেও, গুণীবন্ধু আমার—আমার কখনোই মনে হয়নি আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমাকে কিছু জানানো দরকার, অর্থাৎ তোমার কোনো এক্তিয়ার আছে—

হ্যাডোর ঠোঁটে মৃদু হাসির প্রলেপ পড়লেও, চোখদুটোতে এখনো সেই বিচিত্র কাঠিন্যের ছোঁয়া...অলৌকিক...

আর্থার তাকিয়ে আছে,—আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে—তুমি তাকে খুন করেছো।

হ্যাডোর চোখে কোনো ভাবান্তর নেই, মুহূর্তের জন্যেও না,—তা তোমার সন্দেহের ব্যাপারটা পুলিসকে জানিয়েছো?

—জানানোর ইচ্ছে আছে।

—কিসের ভিত্তিতে, জানতে পারি কি?

—সপ্তাহ তিনেক আগে মার্গারেটের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়—ও মৃত্যুভয়ের কথা বলেছিলো।

—বেচারা! রোমান্টিক মেজাজটা বরাবরই ছিলো মেয়েটার। সম্ভবত সেই কারণেই আমরা পরস্পরে কাছকাছি হয়েছি একদা।

—ড্যাম, স্কাউণ্ড্রেল!

—বন্ধু। ভাষাটা একটু সংযত করো। এটা নিশ্চয়ই অযথা গালিগালাজের উপযুক্ত পরিবেশ নয়। মিস বয়েডের প্রবণতাকে আঘাত করছো। সুসির দিকে ফিরে তার মাংসল হাতটা বাড়িয়ে দিলো,—স্কেন-এ আতিথেয়তা না দেবার জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে। কারণ যে ক্ষতি হলো আমার ব্যক্তিগত জীবনে—

মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে দিলো হ্যাডো। শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে। আর্থারের দিকে ফিরলো এবার,—আমাকে যদি আর প্রয়োজন না থাকে তোমাদের, তাহলে আমাকে আমার ভাবনা নিয়ে থাকতে দাও। গ্রামের সিপাইয়ের সঠিক ঠিকানাটা, আমার বাড়ি তদারক করে যে লোকটা—তার কাছ থেকে পেয়ে যাবে।

আর্থার এবারও নিরুত্তর। শূন্যে চোখ মেলে আছে সে, কি ভাবছে। পরে হঠাৎ ঘুরে গেটের দিকে চলতে শুরু করলো সে। সুসি আর পোরোয়ে হতবুদ্ধি। হ্যাডোর চোখদুটো তাদের ওপর ধরা,—তোমাদের বন্ধুটির চিরকালই অদ্ভুত মন্দ সমস্ত আচার আচরণ দেখে আসছি।

সুসি হাস্যাস্পদ। লজ্জারাঙা হলো। অপ্রতিভ পোরোয়ে শুধু টুপিটা তুলে অভিবাদন জানালো। চলতে শুরু করতে ওরা

বুঝলো—হ্যাডোর বিদ্রূপেভরা চাহনি ওদের ওপর ধরা। দ্রুত-পায়ে এগিয়ে চললো তারা।

আর্থার ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো,—ক্ষমা চাইছি, আমি একা নই, ভুলে গিয়েছিলাম।

সরাইখানায় ফিরে গেলো ওরা।

—কি করবে এখন? সুসি জিজ্ঞেস করলো।

অনেকক্ষণ কথা বললো না আর্থার। সুসির মনে হলো যেন শুনতেই পায়নি তার কথা আর্থার। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো সে,—সোজাপথে কিছু করা যাবে না দেখছি। প্রকাশ্য সোরগোলে কোনো কাজ হবে না। মার্গারেটের মৃত্যু স্বাভাবিক নয় অন্য কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত হবে।

—হয়তো সত্যিই হার্টের অসুখে মারা গেছে ও।

দীর্ঘমুহূর্ত তাকালো সুসির দিকে আর্থার, তার কথাগুলোর মানে খুঁজছে,—ওটা প্রমাণ করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। নিজের মনেই যেন কথাগুলো বললো সে।

—কি সেগুলো?

আর্থারের কাছ থেকে উত্তর এলো না। সরাইখানায় পৌঁছে থামলো সে।

—তোমরা কি ভেতর যাবে? একটু বেড়িয়ে নেবো ভাবছি, একা।

সুসির চোখে উদ্বেগ ফুটলো,—তেমন কিছু করে বসবে না তো? —মার্গারেটকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, না জানা পর্যন্ত কিছুই না।

আর্থার ঘুরে চলতে শুরু করলো। দেরী হয়ে গেছে অনেক। বসার ঘরে সামান্য আহার্য্যের ব্যবস্থা করা ছিলো। আর্থার ফেরা-পর্যন্ত অপেক্ষার দরকার নেই।

ওরা খেয়ে চললো নিঃশব্দে।

ডাক্তার পোরোয়ে সিগারেট ধরালো, খাওয়া-দাওয়ার পর। সুসি ভাবছে মার্গারেটের কথা, আকাশের তারা দেখতে দেখতে

মনে পড়ছে তার কথা। তার সুন্দর মুখখানা, সরলতা—তার শেষ।

ফুঁপিয়ে উঠলো সুসি। মার্গারেটের কোনো দোষ ছিলো না, তবু মরতে হলো তাকে। সবই ভাগ্য। মাইনসের কন্যা ফেদ্রিার মতই অসহায় হয়ে পড়েছিলো মেয়েটা। মীরার অবস্থা···

সময় বয়ে চললো। আর্থারের দেখা নেই। উদ্বেগ বেড়ে চলেছে সুসির।

আর্থার ফিরলো। অনেক রাত তখন। টুপি নামিয়ে দিয়ে বসলো সে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো সে পোয়োরের দিকে।

—কি ব্যাপারটা, বন্ধু? ডাক্তার শুধালো।

—আলেকজান্দ্রিয়ার এক এক্সপেরিমেন্টের কথা একবার গল্প করে-ছিলে মনে পড়ে তোমার? ইতস্তত করে বললো আর্থার। বিচিত্র গলা তার।—বলেছিলে একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ছিলে ও, যাদু আয়নায় অনেক কিছু দেখেছিলো সে—অজানা সব···বস্তু?

—খুব মনে আছে।

—তখন হেসেছিলাম মনে মনে। ভেবে ছিলাম ছোকরা তোমাকে ঠকিয়েছে ওইসব বলে।

—হুঁ?

—ইদানীং প্রায়ই ভেবেছি ওই নিয়ে। স্মৃতির গুপ্ত দরজা খুলে গেছে আমার—অনেক বিচিত্র সব ব্যাপার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। তবে কি আমিই সে ছোকরা?

—হ্যাঁ। পোয়োরে শান্তস্বরে জানালো।

প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা নামলো ঘরে। পোয়োরে আর সুসি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। ওর ভাবনা পড়তে চেষ্টা করছে।

—আমার চরিত্রের এই দিকটার সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত জানতাম না। প্রথম যেদিন বুঝলাম, লড়াই করেছি—বাস্তববাদী মানুষের এর শিকার হওয়া উচিত নয় ভেবেছি। হেরে গেছি। হয়তো প্রাচ্যের

সেই দেশ, যেখানে জন্মেছি আমি—প্রভাব বিস্তার করেছে আমার অবচেতন মনের ওপর।

অস্পষ্ট সব কথা মনে পড়ছে, বিচিত্র সেসব। আমার অজ্ঞাতসারে কোনোদিন ছিলো সেগুলো জানতে পারি নি। একদিন মনে হলো—আমার জীবনের এত নতুন দিক খুলে গেলো—তুমি যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলে, তা স্পষ্ট দেখলাম। এখুনি মনে হলো এটা আমারই জীবনের এক অভিজ্ঞতার অংশ। দেখলাম আমার হাতটা ধরে ···কালি ঢেলে দিচ্ছো তুমি···আমাকে দেখতে বলছো···সেই বিচিত্র আলোর ব্যাপারটায় এক তীব্র থ্রিল হলো আমার। অবর্ণনীয় সব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম...যা' একটু আগেও ছিলো না সেখানে। এমন সব মানুষকে দেখলাম, যাদের কোনোদিন দেখি-নি, তাদের নানানরকম সব ক্রিয়াকলাপ দেখলাম।...শেষে, সবকিছুই ফ্যাকাসে মেরে গেছে...কথা বলেছি কার নির্দেশে জানি না।

অবসাদে ভেঙ্গে পড়েছি, যেন সারাদিন অভুক্ত আমি···

জানলার কাছে উঠে গিয়ে বাইরে তাকালো আর্থার। ওরা দুজনে নিঃশব্দ। কঠোর হয়ে উঠেছে তার চোখমুখ···বাতির আলোয়...অস্বাভাবিক এক প্রচণ্ডতার সঙ্গে যেন চলেছে তার লড়াই···দ্রুতনিশ্বাস পড়ছে—ঘুরলো আর্থার ওদের দিকে মুখ করে। দ্রুত কথা বলে চললো—কর্কশস্বরে,—মার্গারেটকে আবার দেখতে চাই।

—আর্থার, তুমি পাগল হয়ে গেছো। সুসি ভয় পেলো। পোরোয়ের দিকে হেঁটে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো আর্থার, স্থিরদৃষ্টি ডাক্তারের চোখে তার,—তুমি এই বিদ্যা অধ্যয়ন করছো। ওর মধ্যেকার সবকিছুই জানা তোমার। মার্গারেটকে দেখাও আমাকে—

অস্ফুট এক আর্তনাদ উঠলো পোরোয়ের গলা থেকে, ভীত সেও, —কিন্তু কি করে, ভাই? অনেক বই হয়তো পড়েছি আমি; কিন্তু সেসবের অনুশীলন তো করিনি কখনো। শুধু মজা পাবার

লোভেই পড়েছি—

—করা সম্ভব, তা বিশ্বাস করো ?

—তুমি কি চাইছো বুঝতে পারছি না—

—আমি চাই মার্গারেটকে আমার কাছে নিয়ে আসবে তুমি, কথা বলবো তার সঙ্গে আমি—সত্যটুকু জানতে চাই।

—তুমি কি ভাবো আমি অন্তর্যামী যে, কবর থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি ?

উঠতে গেলো পোরোয়ে, কিন্তু আর্থার বসিয়ে দিলো তাকে। নখগুলো তার বসিয়ে প্রবীন মানুষটার কাঁধে। বেদনাহত পোরোয়ে।

—এলিফাস লেভাই একবার আত্মা এনেছিলো বলেছিলে তুমি। সেটা সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলে তো ?

—জানি না। মন খোলা রেখেছি শুধু, দুপক্ষেরই বলার ছিলো অনেক কিছুই।

—তাহলে, 'এখন' বিশ্বাস করছো নিশ্চয়ই ? সে 'যা' করছে তোমাকেও তা করতে হবে।

—তুমি—তুমি পাগল হয়ে গেছো, আর্থার।

—শেষ যেখানে মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হয় আমার, সেখানে যেতে হবে তোমাকে। কোথাও যদি তার আত্মাকে আনা যায়, তাহলে ওইখানেই মার্গারেট ওখানে বসে কেঁদেছিলো। যা যা করা দরকার, সবই জানা তোমার।

সুসি কখন এসে তার কাঁধে হাত রেখেছে। আর্থার তার দিকে তাকালো, ভ্রুকুটি করে।

—আর্থার, তুমি ভালো করেই জানো এতে কিছুই পাবে না, শুধু দুঃখই বাড়বে। আর, কবর থেকে তুলতেও যদি পারো তাকে, তার আত্মাকে কষ্ট দিতে চাও কেন ?

—যদি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে থাকে তার, আমাদের কোনো শক্তিই কাজ দেবে না। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার আত্মা মুক্তি পায়নি। আমি নিশ্চিত হতে চাই। একবার দেখতে চাই তাকে

পরে কি করা দরকার, বুঝবো।

—পারবো না—আমি—পারবো না—ডাক্তার নীরসগলায় জানালো।

—তাহলে বইগুলো দাও আমাকে, নিজেই করে নেবো।

—এখানে নেই সেগুলো, জানো তুমি।

—তাহলে সাহায্য করো আমাকে। আর, মনে করা উচিত নয় তোমার কিছু—কোনো অস্ত্রোপচার করার পর কিছু না ঘটলে আমাদের অবস্থার তো কোনো পরিবর্তন হয় না। আর, সাফল্য লাভ করলে···দোহাই ডাক্তার—আমাকে সাহায্য করো। আমাকে সুখী দেখতে চাও যদি, এটুকু অন্তত করো আমার জন্যে—

পিছিয়ে গিয়ে ডাক্তারের ওপর দৃষ্টি মেলে দিলো সে। ডাক্তার কিন্তু তাকিয়ে মাটির দিকে—পাগলামীর ব্যাপার। বিড়বিড় করলো সে।

আর্থারের আবেদন তার অন্তর ছুঁয়েছে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিলো পোরোয়ে,—যাক্, যদি এটা শুধু মাত্র ভাঁড়ামো হয় তাহলে অবশ্য ক্ষতি নেই—

—করবে সাহায্য আমাকে? আর্থার ব্যাকুল।

—যদি তোমার মন শান্ত হয়, সন্তুষ্ট হয়—যতটুকু সম্ভব করবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিই, প্রচণ্ডভাবে নিরাশ হবে।

আর্থার চায় অচিরাৎ ঘটুক আধারকর্ম। কিন্তু পোরোয়ের মতে তা অসম্ভব। দীর্ঘযাত্রার পর শ্রান্ত ওরা, তাছাড়া কয়েকটা জিনিষও দরকার। মনে মনে ভেবেছে পোরোয়ে, একরাতের বিশ্রামে আর্থার হয়তো আগের মানুষ হয়ে যাবে। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাবে সে, বাতিল করে দিতে চাইবে তার পূর্বপরিকল্পনা। কিন্তু আর্থার অন্য কথা ভাবছে—আগামী দিনটা ধরলে মার্গারেটের মৃত্যুর সাতদিন কেটে যাবে—ফলে দিনটার

একটা আলাদা তাৎপর্য পাওয়া যাবে। হয়তো ওদের কাজে আরও সুবিধেও হতে পারে।

সকালবেলা ওরা নেমে এলো, পরস্পরকে অভিনন্দন জানালো। একটা জিনিষ পরিস্কার, ওরা কেউই রাতে ঘুমোয়নি।

—তোমার মত বদলালো নাকি? পোয়রোয়ে আশান্বিত গলায় প্রশ্ন করলো।

—না।

ডাক্তার ইতস্তত করলো, নার্ভাস সে,—নিয়মানুযায়ী তোমাকে কিন্তু সারা দিন উপবাস করতে হবে—এই কাজের প্রয়োজনে।

—যে কোনো কাজ করতে রাজী আমি। আমার কাছে ওটা আর সমস্যা হবে না, চেষ্টা করলেও গলা দিয়ে কিছু নামবে না। হিস্টিরিয়া হাসি দিলো সে।

—সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন বোকামি মনে হচ্ছে।

—তুমি কিন্তু প্রতিশ্রুত; চেষ্টা করবে।

দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনটা ক্রমে বয়ে চলেছে। সারা আকাশ জুড়ে এক তীব্রতা—পোয়রোয়েকে ইজিপ্টের দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। মাটিতে যেন আগুন ধরে গেছে···

আর্থার কিন্তু অস্থির, ঘরে বসে থাকতে পারছে না। অন্যদের তাদের কাজে ছেড়ে গেছে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। বিশ্রামহীন। রোদের তাপ ছুঁতে পারছে না তাকে।

সুসি ঘরে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে, তাই সামান্যতম আওয়াজে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে তার।

সূর্য উঠছে, তার ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ছে সোনালী রোদ। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। কিন্তু গুমোট কাটলো না।

পোয়রোয়ে ছোট্ট বৈঠকখানায় বসে, হাতছুটোর ফাঁকে খুঁজে বসে সে—স্মৃতি রোমন্থন চলছে, মনে করার চেষ্টা করছে সব।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে তার।

ক্রমে রাত বেড়েছে, একে একে তারাগুলো বেরিয়েছে আকাশে। বাতাস নেই। পরিবেশ ভারী হয়ে আসছে।

সুসি নেমে এলো। পোয়োরের সঙ্গে কথা বলে হালকা হতে চায় সে। নিচুগলাতেই কথা বলছে ওরা, ভয়, কারোর কানে কথা না যায়। প্রচণ্ড ক্ষিদেও পেয়েছে।

সময় কিন্তু বয়ে চলেছে, ঘড়ির প্রতিটি সরব ঘোষণা বয়ে আসছে রহস্যের ইঙ্গিত।

গ্রামের বাতি একে একে নিভছে। সবাই শুতে গেছে।

সুসি বাতি জ্বেলে দিলো। সামান্য কেঁপে উঠলো সে,—ইস! ঘরে যেন কেউ মরে রয়েছে—বাবাঃ—কি পরিবেশ—

—আর্থার আসছে না কেন?

সংগতিহীন কথা বলে চলেছে ওরা, একে অন্যের কথা শুনছেও না। জানলা হাট খোলা। তবু, বাতাস নেই—নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। নৈঃশব্দ্য এত অস্বাভাবিক যে সুসি সন্দিহান হয়ে পড়ছে। প্যারিসের ব্যস্ত রাস্তাগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করলো ও। গাড়ির প্রচণ্ড ঘড়ঘড়ানি, দিনের শেষে ঘরমুখী মানুষগুলোর কথা…।

সুসি উঠে দাঁড়ালো;—ধুর, একটু হাওয়া নেই! গাছগুলোর দিকে তাকাও—একটা পাতাও নড়ছে না।

—আর্থার আসছে না কেন এখনো? পোয়োরে পুনরুচ্চারণ করলো কথাগুলো।

—আকাশে চাঁদ নেই। স্কেন-এ কিন্তু খুব অন্ধকার হবে।

—সারাদিন হেঁটেছে ছেলেটা। ফিরে তো আসা উচিত এতক্ষণে।

এক বিচিত্র অনুভূতি পেয়ে বসেছে সুসিকে, নিশ্বাসের জন্যে হাঁফাচ্ছে। আর ঠিক তখনি বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠলো। আর্থারকে জানলায় দেখা গেলো,—তোমরা কি তৈরী?

—হ্যাঁ, তোমার অপেক্ষাতেই আছি।

ওরা বেরিয়ে এলো, প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো সঙ্গে নিয়ে। স্কেন-এর রাস্তা ধরলো, আধারাচ্ছন্ন রাস্তা—এক অশুভ আঁধার। নিজেদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না। নির্জন রাস্তা, যেন ফুরতে চাইছে না। ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে ওরা, পা চলে না। একটু বিশ্রাম করতে দাও আমাকে। সুসি অনুনয়ের গলায় বললো। ওর কথার জবাব দেয়নি অন্যেরা, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুসির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে তারা, সুস্থ হবার সময় দিয়েছে। কিছু পরে উঠে পড়লো সুসি জোর করে,—যাওয়া যাক, চলো।

ওরা হেঁটে চললো, নিঃশব্দে। স্বপ্নের মানুষ যেন তারা, চলেছে। অন্য কারো প্রভাবে চলছে। হঠাৎ একসময়ে রাস্তা শেষ হলো—স্কেন-এ পৌঁছলো ওরা।

—আমার সঙ্গে এসো, খুব কাছাকাছি থাকবে। আর্থার নির্দেশ দিলো।

রাস্তার একধারে সরে গিয়ে বেড়া ধরে এগোলো আর্থার। সুসির মনে হলো—একটা অপ্রশস্ত পথ দিয়ে চলেছে তারা। সামনে দু' পা দূরের জিনিষও নজরে পড়ে না। এক সময়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আর্থার।

কিছু আগে একবার এসে পথ কিছুটা পরিস্কার করে গেছে সে।

রেলিংয়ের একটা ভাঙা অংশ সরিয়ে ঢুকে পড়লো। সুসি পেছনে। শেষে ডাক্তার।

—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সুসি ককিয়ে উঠলো।

—আমার হাত ধরো।

অনেক কষ্টে এগোলো ওরা, গাছগাছলির ফাঁক দিয়ে। হোঁচট খাচ্ছে। পোরোয়ে একবার পড়েই গেলো। অনেকটা রাস্তা যেন চলে এসেছে মনে হলো ওদের। সুসির বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। উদ্বেগে ছেয়ে গেছে মন তার। ক্লান্তি ভুলে গেলো সে।

আর্থার দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের দিকে আঙুল তুললো। গাছের ফাঁকে বাড়িটা চোখে পড়লো। জানলাগুলোয় আলো নেই, ছাদেরটা

ছাড়া। সেখান থেকে উজ্জ্বল আলোর ছটা আসছে।

—ওইখানেই তার গবেষণাগার। ছাদে। এখন কাজ করছে সে। বাড়িতে আর কেউ নেই এখন।

সুসির কেমন আকর্ষণবোধ হচ্ছে আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে। অলিভার হ্যাডোর এই বিনিদ্র কার্যকলাপের সঙ্গে রহস্য জড়িয়ে ওতপ্রোতভাবে। কি কাজ করে সে, মানুষের চোখ এড়িয়ে?

ওই বিরাট বাড়িটায় পাগলটা কি করে চলেছে?

—ওর বেরিয়ে আসার সম্ভবনা নেই এখন। আর্থার বলে গেলো, —দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত ওইখানেই থাকবে ও।

সুসির হাত ধরে এগোলো সে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে। পায়ে-হাঁটা পথ ধরলো। এবার অনেকটা নিশ্চিন্তে হাঁটছে।

—তুমি ঠিক আছে তো? পোরোয়ের দিকে ফিরলো।

—হ্যাঁ।

কিন্তু গাছগুলো যেন বেড়ে চলেছে। রাত হয়েছে আরও কালো। কিছুই দেখা যায় না।

—এসে গেছি আমরা। আর্থারের গলা পেলো ওরা।

থামলো ওরা। সামনে একফালি সবুজের বিস্তার, চারদিকে পথ তার। মাঝখানটায় পাথরের বেঞ্চি একটা, আঁধারে তার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

—মার্গারেটকে ওইখানেই শেষ বসতে দেখি।

ডাক্তার তার প্রস্তুতিকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কাঠফাটার আওয়াজ উঠলো ক্রমে, বাটি থেকে আগুনের হলকা উঠলো। কি পোড়াচ্ছে পোরোয়ে বুঝলো না ওরা, তবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ধোঁয়া, বাতাস ভরে উঠলো উগ্র সুগন্ধিতে। ডাক্তার বারে বারেই কায়াহীন হয়ে যাচ্ছে—শিলুয়েট হয়ে আলোয়। ওর সামান্য কুব্জ শরীরটা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

সুসি একবার পলকের জন্যে তার মুখটা দেখতে পেলো ওর, আবেগ ছড়িয়ে সে মুখে। সন্দেহ আর ভীতির ছোঁয়া মুছে গেছে সে মুখ

থেকে। এক প্রাচীন অপরসায়নজ্ঞ যেন তার অপ্রাকৃত কাজে ব্যস্ত···

সুসির যন্ত্রণা শুরু হলো। দারুণ ভয় পেয়েছে সে। আর্থারকে হাত বাড়িয়ে ছুঁলো সে। আর্থার তার হাতটা সুসির কোমরে রাখলো, আশ্বাসের ভঙ্গিতে।

ডাক্তার কিন্তু মাটিতে বিচিত্র সব চিহ্ন এঁকে চলেছে। আগুনের হলকা কমে এসেছে, ধিকিধিকি জ্বলছে। কি আঁকছে যে সুসি বুঝলো না।

কটা পাতা আবার ফেলে দিলো পোরোয়ে, আগুনে। আঁচ প্রবলতর হলো···আঁধার বিদীর্ণ করলো তরবারির তীক্ষ্নতায়···

—এবার এসো। জানালো সে।

হঠাৎ এক অজানা আতঙ্ক পেয়ে বসলো সুসিকে, মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে তার, মনে হলো। সারা শরীরে ছড়িয়ে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা। তার শিরাউপশিরাগুলো যেন হঠাৎই ভারী হয়ে গেলো, নড়তে পারছে না। পায়ে জোর থাকলে ছুটে পালিয়ে যেতো সুসি, যেদিকে দুচোখ যায়।

কাঁপতে শুরু করলো সে, কথা বলতে চেষ্টা করলো—কিন্তু জিভ তো অসাড়।

—পারবো না। ভয় পাচ্ছি—ফিসফিস শব্দ এলো ক'টা তার গলা থেকে।

—পারতে হবে। তোমাকে ছাড়া কিছু করতে পারবো না যে। আর্থার এবার বলে উঠলো।

নিজের সঙ্গে বুঝতে পারছে না। সবই বিস্মৃত হয়েছে সে। শুধু ভয়ে পেয়ে বসেছে তাকে। বুকে শুরু হয়েছে তোলপাড়, অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? আর্থার শক্ত করে ধরলো তাকে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো সুসি—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি তোমার কাজে লাগবো না। বড্ড ভয় করছে···

—পারবে। পারতে হবে তোমাকে।

—না।

—বলছি, আসতে হবে তোমাকে।

—কেন ?

সুসির চোখ থেকে ত্রাস মুছে গেলো, রাগের প্রতিফলন দেখা দিলো।

—কারণ, তুমি তো আমাকে ভালবাসো—আর আমাকে শাস্তি দেবার ওইটাই একমাত্র রাস্তা।

বেদনার্ত হলো সুসির কণ্ঠস্বর, ত্রাসের পরিবর্তে লজ্জা দেখা দিলো। আবারও রাগ হলো, আর্থার তা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে বলে। সাহস ফিরে পেয়েছে সে, এগিয়ে এলো সুসি।

ডাক্তার পোরোয়ে তার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলো। আর্থার দাঁড়ালো তার সামনে।

—আমার কাছে না শোনা পর্যন্ত নড়বে না। আমার আঁকা বৃত্তের বাইরে চলে গেলে তোমাকে কিন্তু রক্ষা করতে পারবো না।

পোরোয়ে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতায় দাঁড়ালো এক মিনিট। লাতিনে বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করে চললো, এরপর। সুসি শুনছে সব, অস্পষ্ট। কিছুই বুঝছে না, আর—পোরোয়ের গলা এত অনুচ্চ যে বোঝা কঠিন ছিলো তার কথা। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কণ্ঠস্বরের, কাঁপা কাঁপা গম্ভীর সে কণ্ঠ। ভীষণভাবে আকর্ষণীয়।

আর্থার কিন্তু দাঁড়িয়ে, অনড়—অটল। আগুন আর নেই; আছে শুধু ছাইয়ের মধ্যে আভা। নৈঃশব্দ্য। যাদুকর পোরোয়ে শুরু করেছে তার ক্রিয়া—এবার স্পষ্টতর। অপার্থিব আবাহন চলেছে, ভাষা দুর্বোধ্য অন্যদের কাছে।

জ্বলন্ত কয়লা থেকে চলে গেলো আঁচ, তার কথার মধ্যেই।

না। নিঃশেষে নয়, অদৃশ্য হাতে যেন স্তিমিত তা। আঁধার যেন আরও প্রকট। চারপাশের গাছপালা যেন অদৃশ্য, পাথরের বেঞ্চি যেন সাদা নেই আর।

সুসি চোখ দুটোকে টান টান করলো—কিন্তু নজরে পড়লো না

কিছুই। ওপরে চোখ তুললো সে—তারা নেই আকাশে। আঁধার যেন আরও অস্বস্তিকর—হাত দুটো মুঠো করলো সুসি, চেতনা হারাবার ভয়ে...

চমকালো সে, কারণ হাওয়ার দাপটে পোরোয়ের গলা ডুবে গেছে। একমুহূর্ত আগেও নৈঃশব্দ্য পীড়াদায়ক হয়েছে তাদের কাছে, এখন ঝড়ে যেন আচ্ছন্ন পরিবেশ। গাছগুলো আন্দোলিত সে ঝড়ো বাতাসে, ডালপালায় উঠেছে শব্দ—পাতার হিসহিসানি আসে কানে।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সম্মুখীন যেন ওরা। মাটি নড়ে উঠেছে যেন ...ওদের চারপাশে চললো ঝড়ের তাণ্ডব—পোরোয়ে বৃথাই চেষ্টা চালিয়েছে তা থামাবার।

হঠাৎ পোয়ের কণ্ঠস্বর এলো যথেষ্ট, দৃঢ়তা সে গলায়—সেই দুর্বোধ্য ভাষায় নিসৃত। মার্গারেটকে সে তিনবার—নাম ধরে ডাকলো—মার্গারেট, মার্গারেট—মার্গারেট...

সুসির মনে ছেয়ে এলো আতঙ্ক, কিন্তু পোরোয়ের নির্দেশ মনে আছে তার—নড়া চলবে না...

চারপাশের সবকিছুই যেন মুহূর্তে স্তব্ধ। মৃত্যু-স্থির। ক্রমে শূন্য থেকে ভেসে এলো কোঁপানির শব্দ—কোন নারীর আর্তস্বর—মার্গারেট।

আর্থারের গলা চিরে বেরোলো বেদনার অস্ফুটস্বর। এগোবার মুহূর্তে তাকে নিরস্ত করলো পোরোয়ে। গলার স্বর হৃদয়বিদারী—যে নারীর ভবিষ্যৎ আঁধারে আচ্ছন্ন, সমস্ত আশা বিলুপ্ত—আতঙ্কের এক শিকার। সুসি যদি নড়তে পারতো—কানে আঙুল দিতো—এ' যন্ত্রণাকতর স্বর এড়াতে।

আর্থার তাকে দেখতে পেলো—তারাহীন রাতের আঁধার পারেনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে। বেঞ্চির ওপর বসে সে—এখানেই তো শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছে ওদের, কথা হয়েছে। পরিস্কার দেখা যাচ্ছে মুখটা তার—গাল বেয়ে পড়েছে চোখের জল—বুকটা উথাল-

পাথাল—বেদনার্ত···

আর্থার জানলো—তার সন্দেহ অমূলক নয়···

ভেনিং ছেড়ে যাবার কোনো উদ্যোগই নেই আর্থারের। সুসি বা ডাক্তার পোরোয়েও পারেনি তাকে দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার। স্কেন-এ সেই রাতটার কথা কারো মুখে নেই। কিন্তু তাদের মন ছেয়ে রয়েছে সে দৃশ্য—মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি তা।···সেই কান্না কানে নিয়ে রয়েছে...আর্থারের অস্থিরতা বাড়ছে। ওদের সঙ্গে কথা কম বলছে। তার মত পরিবর্তনের প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে দীর্ঘ সময়—একা। সুসি প্রচণ্ড উদ্বেগের শিকার হয়েছে। লোকটার ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট, হ্যাডোর প্রতি তার ঘৃণা তীব্রতর হয়েছে, বিচারবোধের বাইরে চলে গেছে তা। প্রতিহিংসায় রাস্তা খুঁজছে সে—যে কোনো শারীরিক বলপ্রয়োগের প্রস্তুতি আছে তার···

দিন কাটে।

শেষে, আর একবার চেষ্টা চালালো সুসি—শেষ চেষ্টা। রাত অনেক হয়েছে—খোলা জানলার সামনে বসে তারা। সরাইখানায়। বাতাসে ঝড়ের ইঙ্গিত। সুসির প্রার্থনা—ঝড় উঠুক, কারণ বিগত কয়েক দিনের প্রচণ্ড দাবদাহ আর্থারের মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়েছে, —কি করবে তুমি বলো আমাদের, আর্থার, এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সুসি জানিয়েছে,—আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি, সুস্থ মাথায় কোনো কিছু ভাবতে পারছি না পর্যন্ত। চলো আমাদের সঙ্গে, কালই বেরিয়ে পড়ি।

—ইচ্ছে থাকলে তোমরা যেতে পারো—ওই লোকটা বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমি আছি এখানে।

—প্রলাপ বকো না। তোমার করার কিছু নেই। নিজেকে শুধু কষ্ট দিচ্ছো—

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

—আইন তোমার পক্ষ নেবে না। এছাড়া করার আছেই বা কি ?

সুসি এ' প্রশ্ন রেখেছে তার মনের কথা জানবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার উত্তরে চমকিত হয়েছে, সন্ত্রস্তও।

—আর কিছু করা সম্ভব যদি না-ই হয়, তাহলে কুকুরের মত গুলি করে মারবো ওকে।

সুসি তার উত্তর পেয়েছে। নিঃশব্দ হলো সে। আর্থারও। একসময়ে উঠে পড়লো আর্থার,—আমার মনে হয় তোমার চলে যাওয়াই ভালো, এখানে থেকে আমার কাজের বাধাসৃষ্টি করছো শুধু তুমি।

—তুমি যতদিন থাকবে এখানে, আমিও আছি। দৃঢ়গলা সুসির।

—কেন ?

—কারণ তুমি কিছু করতে গেলে আমি জড়িয়ে পড়বো। পুলিসে ধরবে আমাকে, আর সেই কারণে তুমি যাতা কিছু করতে সাহসী হবে না।

আর্থার সোজা তাকালো সুসির চোখে। সুসি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলো অদ্ভুত শীতলতায়—তার মনের কথা স্পষ্ট হলো।

নিস্তব্ধতা বাড়লো। ওরা অনড়। ঘর যেন জনহীন। বাতাসে গুমোট বাড়ছে। অস্বস্তি বাড়ছে।

হঠাৎ মেঘের গর্জন শুরু হলো। বাজ পড়লো কোথাও। বিদ্যুতের চমক দেখা গেলো। সুসি খুসী হলো, অনেকটা হালকা বোধ করছে সে। আবারও গর্জন। বাতাস উঠলো—আর্তনাদ চলেছে তার। গাছের পাতায় শশব্দ কাঁপুনি। সে শব্দ এতই মানবিক, যে মনে হয় মৃতের বুকের পাঁজর থেকে উঠে আসছে যন্ত্রণার আর্তি...

বাতি নিভে গেলো। সুসির মনে হঠাৎ ভয় বাসা বাঁধলো। সারা ঘর অন্ধকার। যেন কারো ফুৎকারে নিভেছে আলো। আঁধার যেন আরও প্রকট। কিছুই দেখা যায় না—কেউ নড়ছে না...

ডাক্তার পোয়োয়েকে দেশলাইয়ের জন্যে হাতড়াতে হলো—সুসি কান পেতে শোনে সে শব্দ। দেশলাই পেলো না ডাক্তার। আবারও একপ্রস্থ গর্জন উঠলো মেঘের···তবু বৃষ্টি নেই। মুক্ত হাওয়ার জন্যে আকুলি বিকুলি চলেছে মানুষগুলোর।

—হঠাৎ বুকটা দুলে উঠলো সুসির—উঠে পড়লো লাফিয়ে—ঘরে কেউ আছে!

কথাগুলো সুসির মুখ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা আওয়াজ উঠলো, আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্থার... স্বভাব প্রবৃত্তিতে আন্দাজ করতে পারলো সুসি, লোকটা হ্যাডো···

কিন্তু ভেতরে ঢুকলো কি করে সে? কেঁদে উঠতে চাইলো সে—কি চায় লোকটা?—না। কোনো শব্দ বেরোলো না তার গলা থেকে। ডাক্তার পোরোয়েও যেন চেয়ারে জমে গেছে। নড়ছে না, আওয়াজও নেই।

সুসির মনে হলো এক প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেছে। লড়াই চলেছে দুটো মানুষের মধ্যে—দুটো মানুষ—যারা একে অন্যকে ঘৃণা করে।···কিন্তু নিঃশব্দ ওরা। সম্পূর্ণ শব্দহীন।

সুসির মনে হলো কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু নড়ার অবস্থা নেই তার।

অন্যদিকে আর্থারের অন্তর জয়ের উল্লাসে উল্লসিত, শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে। তার পরম শত্রু। প্রাণ থাকতে তাকে ছাড়তে পারবে না। দাঁতে দাঁত চাপলো আর্থার, পেশীগুলো শক্ত হয়ে আসছে তার...সুসি ভারী নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। তবে, একজনেরই...এর কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। ওরা লড়াই করে যাচ্ছে। আর্থার জানে লোকটার শক্তি বেশী—জানে কি করবে সে।...চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। হ্যাডো অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু আর্থার তার মোকাবিলা করছে শুধুই মনের জোরে।

ঘণ্টারপর ঘণ্টা যেন কেটে গেলো, তবু হ্যাডোকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারেনি সে।

হঠাৎ মনে হলো আর্থারের—তার প্রতিপক্ষ ভীত হয়ে পড়ছে—পালাবার রাস্তা খুঁজছে। আর্থার তার মুষ্টি দৃঢ়তর করলো। কারণ দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও সে তার মুঠো আলগা করবে না। লম্বা নিশ্বাস নিলো একটা সে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো। দুলতে থাকে তারা। আর্থারের পেশীগুলো যেন তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে···আর বোধহয় পারবে না। সেই ব্যর্থতার চিন্তাই তাকে শক্তি জোগালো—হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলো সে মরীয়া হয়ে।

হ্যাডো পড়ে গেলো। দুজনেই—সশব্দে। তার শরীরের নীচে যে দেহটা পড়েছে, তার উপর উঠে বসলো আর্থার হাতটা চেপে ধরলো সে দু'হাতে। মচকে দিলো আর্থার হাতটা, অবশ—অসাড় হয়ে আসছে হ্যাডোর হাত—জয়ের উল্লাস বেরোলো কণ্ঠ থেকে তার—হাতটা ভেঙ্গে দিয়েছে...

শত্রু আতঙ্কগ্রস্ত—পাগলের মত চালিয়েছে ধ্বস্তাধ্বস্তি···মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরোতে চায় সে।...ইস্পাতে তৈরী হাতদুটো থেকে। আর্থার এবার তার আঙুলগুলো চালিয়ে দিলো লোকটার গলায়, মেদের স্তূপে—শরীরের সবটুকু শক্তি যেন নিঃশেষিত।

আবারও উল্লাসে সোচ্চার হলো আর্থার, প্রতিপক্ষ এখন তার মুঠোয়। গলায় চাপ দিয়ে চলেছে আর্থার·· চাপ দিয়ে তার প্রাণ বের করে দিতে চায় সে...

একটু আলো চায় ও, ওই বিরাট দানবাকৃতি মুখে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা দেখতে চায় সে। চায় ভয়ের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে—বিস্ফারিত চোখ দুটোর চাহনির রূপদর্শন করতে।

চাপ দিয়ে চললো সে। এবার হ্যাডোর শরীরে খিঁচুনি শুরু হলো···মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়েছে অলিভার হ্যাডো···মরীয়া হয়ে উঠেছে সে—কিন্তু নিস্তার নেই তার।

ক্রমে শারীরিক আন্দোলনের সঙ্গে খিঁচুনি বেড়েছে। দুর্বল হয়ে আসছে। হাতদুটো এতটুকু শিথিল হয়নি আর্থারের···সব ভুলে

গেছে সে। রাগে, ক্ষোভে দিশেহারা হয়েছে।

মার্গারেটের কথা মনে হচ্ছে তার—তার জ্বালা, যন্ত্রণা সমস্ত কিছু ভেসে উঠছে তার চোখে। · লোকটার যদি দশটা জীবন থাকতো—তাতেও ক্ষান্ত হতো না আর্থার ··একে একে নিয়ে চলতো প্রাণ।

শেষে, সবই স্থির হলো—মেদের পাহাড় নিশ্চল হয়ে গেলো।

আর্থারের মুঠো ক্রমে আলগা হয়ে আসছে, হ্যাডোর বুক ছুঁলো তার হাত—না, স্পন্দন নেই।

শক্ত পাথর হয়ে গেছে দেহ।

আর্থার উঠে দাঁড়ালো। সোজা হয়ে। অন্ধকার কাটেনি। দেখতে পাচ্ছে না সে কিছুই।

সুসি এবার কথা বলে উঠলো,—আর্থার, কি করলে তুমি?

—মেরে ফেলেছি ওকে। কঠিন, কর্কশ গলা তার।

—ওমা, কি হবে এখন?

তারস্বরে হেসে উঠলো আর্থার, মত্ত মানুষের হাসি। অন্ধকারে তার উল্লাস যেন আরও ভয়াবহ শোনাচ্ছে।

—একটু আলোর ব্যবস্থা করো, দয়া করে—

—জ্বালছি। দেশলাইটা পেয়েছি। হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়েছে যেন সে। কাঠি জ্বাললো পোরোয়ে—জ্বললো না। আবার চেষ্টা করলো, সুসি কাচ সরিয়ে নিলো বাতির।

আলোটা তুলে ধরলো পোরোয়ে—আর্থারের দৃষ্টি তাদের দিকে ধরা। অশরীরী চেহারা তার। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। চোখ দুটো লাল। কাঁপছে থরথর করে।

পোরোয়ে এগিয়ে গেলো। তুলে ধরলো বাতি। মাটিতে দৃষ্টি গেলো ওদের—মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা যেখানে। সুসির গলা থেকে বেরিয়ে এলো আর্তস্বর—

কেউ নেই!

আর্থার পিছিয়ে গেলো, ভয়ার্ত সে। ঘরে কেউ নেই। জীবিত অথবা মৃত—শুধু ওরাই। সুসির পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে।

ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে।

জ্ঞান ফিরলো ওর। এক অন্তহীন রাতের শেষ হলো যেন।

—আর্থারের কোলে তার মাথা·· শুয়ে থাকো—

সবই মনে পড়ে গেছে তার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সুসি। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, অবলম্বন করেছে আর্থারকে—আঁকড়ে ধরেছে তার হাত। কেঁদে চললো সুসি। সারা অঙ্গ কেঁপে উঠছে ওর...

দুঃস্বপ্ন বুঝি কাটলো, আর্থারই প্রথম কথা বললো,—সব ঠিক আছে। ভয়ের কারণ নেই।

—কিন্তু ওই ব্যাপারটা কি হলো?

—সাহস আনো মনে। আমরা প্লেন-এ রওনা হবো এবার।

লাফিয়ে উঠে পড়লো সুসি। আর্থারের কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে সে যেন—হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে চলেছে,—না। পারবো না আমি। ভয় করছে।

—কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে হবে আমাদের।

সুসি বাধা দিতে চেষ্টা করলো এবার,—ওঃ। ঈশ্বরের দোহাই—যেও না, আর্থার। ওখানে ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে। প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া চলবে না তোমার।

—বিপদের কিছু নেই। লোকটা মরে গেছে।

—যদি তোমার কিছু হয়···থেমে গেলো সুসি—ফোঁপানি থামাবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু মনে তার এক অশুভ ছোঁয়া।

ঝুঁকি নেবো না আমি, অন্তত তোমার মুখ চেয়ে। জানি—আমার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর নয়, তোমার কাছে।

চোখ তুলে তাকালো সুসি—আর্থারের দৃষ্টি তার ওপর মেলা। রং লাগলো তার গালে—এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো তার।

—যাবো আমি। সেখানে যাও তুমি, সঙ্গে থাকবো।

—এসো, তবে—

রাতের আঁধারে বেরিয়ে এলো ওরা। বৃষ্টি নেই, ঝড়ও থেমে গেছে আকাশ ভরেছে তারায়।

দ্রুত হেঁটে চলেছে ওরা। আর্থার আগে আগে। পোরোয়ে আর সুসি চলেছে তার পেছনে, পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। তাল রাখতে জোর কদমে চলেছে তারা।

রাতের সেই ভয়াল পরিবেশের অবসান ঘটেছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে সুঘ্রাণ। বড় ভালো লাগছে—সতেজ। সুন্দর আকাশ।

স্কেন-এ পৌঁছলো ওরা। সুসির হাত ধরে এগোলো আর্থার। আগের সেই জায়গায় দাঁড়ালো ওরা।

ছাদে জ্বলছে আলো। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে দিক-বিদিকে। সুসি চমকে উঠলো—তার প্রত্যাশা বিফল হলো, আশা ছিলো তার সমস্ত জায়গাটা রাতের মত আঁধারচ্ছন্ন হবে।

—বলছি তো, কোনো ভয় নেই। নরম গলা আর্থারের।—এই রহস্যের সবটুকু আজ পরিষ্কার করে যাবো।

বাড়িটার দিকে পা চালিয়ে দিলো আর্থার।

—তোমার কাছে কোনো অস্ত্র আছে? ডাক্তার এতক্ষণে কথা বললো।

আর্থার একটা রিভলভার বাড়িয়ে দিলো,—এটা রাখো। ভরসা পাবে। কিন্তু দরকারে লাগবে না। সেদিন কিনেছি এটা—আমার অন্য পরিকল্পনা ছিলো সেদিন।

সুসি কেঁপে উঠলো। বাড়ির কাছাকাছি হলো ওরা। আর্থার দরজার হাতলটা ধরলো না। খুললো না দরজা।

—তোমরা এখানে অপেক্ষা করবে একটু? জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা খুলে দিই।

আর্থার চলে গেলো। ওরা দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। উদ্বেগে আকুল বুক ওদের। কি দেখবে তারা জানে না...আর্থারের কিছু বিপদ-ঘটবে বলে বিশ্বাস তাদের। সুসি নিজেকে ধিক্কার দিলো তার

সঙ্গ না নেওয়ার জন্যে। হঠাৎ কিছুক্ষণ আগের সেই ভয়াবহ দৃশ্য ফুটে উঠলো তার মনের চোখে—হ্যাডোর শরীরটা যেখানে পড়ে থাকার কথা···ছিলো না সেখানে।

—আচ্ছা, ওটার ব্যাখ্যা কি করবে? হঠাৎ বলে উঠলো সুসি ডাক্তারকে লক্ষ্য করে।

—এবার জানা যাবে হয়তো।

আর্থারের দেরী হচ্ছে। সুসির উদ্বেগ বাড়ছে। নানান দুশ্চিন্তায় ভরে উঠেছে তার মন।

ভেতরে পায়ের আওয়াজ উঠলো, দরজা খুলে গেলো।

—কেউ নেই জানতাম। তবু, নিশ্চিত হয়ে নিলাম। ভেতরে ঢুকতে বেগ পেতে হয়েছে।

সুসি ইতস্তত করছে, ঢুকবে কিনা। কি দেখতে হবে কে জানে! অন্ধকার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ভয়।

—দেখতে পাচ্ছি নাতো।

—টর্চ আছে আমার কাছে। আর্থার জানালো। বোতাম টিপে দিতে উজ্জ্বল একফালি আলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। ডাক্তার আর সুসি ঢুকলো ভেতরে। সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আর্থার। চারদিকে আলোটা ফেললো এবার—একটা বড় হলঘরে দাঁড়িয়ে ওরা। সারা মেঝে জুড়ে সিংহের চামড়া। আফ্রিকাতে হ্যাডোর শিকার-কীর্তির স্বাক্ষরবহনকারী। ডজনখানেক হবে সেগুলো সংখ্যায়।

ওপরে উঠে গেছে সিঁড়ি—ওক কাঠের তৈরী বিরাটকায়।

—সবকটা ঘর দেখতে হবে। আর্থার বলে উঠলো।

আলোভরা ছাদের ঘরে না পৌঁছনো পর্যন্ত হ্যাডোর সন্ধান মিলবে না, জানে আর্থার। তবুও সমস্ত বাড়িটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। টর্চের আলো ফেলে চলেছে সে, দেয়ালে অস্ত্রের সমারোহ, প্রাচ্যদেশীয় তরবারির সম্ভার, মধ্য আফ্রিকার বর্বর অস্ত্র, মধ্যযুগীয় বুনো যন্ত্রাদি, আর্থার হঠাৎ একটা কুড়োল নামিয়ে নিলো

—লড়াই—কুত্তোলের।

—এসো, এবার পেছনে ফিরে ওদের উদ্দেশ্যে বললো। নিশ্বাসরুদ্ধ সুসি আর পোরোয়ে চললো ওর সঙ্গে।

প্রথম ঘরটায় ঢুকলো ওরা। মৃদু আলোকে দেখলো ওরা—ঘরটা যথেষ্ট প্রশস্ত হলেও---অব্যবহৃত। সোঁদা গন্ধ বাতাসে।

ক্রমে একের পর এক ঘরে ঢুকেছে ওরা, সবগুলোই অবাসযোগ্য —বাতাসহীন।

সিঁড়ি উঠতে লাগলো ওরা শেষে, পালিশ করা কাঠের রেলিংয়ে তার হাতটা ছোঁয়ালো আর্থার,—দারুণ! চকমকির মত জ্বলবে।

দোতলার ঘরগুলো পরিক্রমা শেষ হলো। শূন্য সবগুলোই। মার্গারেট যে ঘরটায় ছিলো, সেটাতে ঢুকলো ওরা। মাটিতে ঝরা ফুল কতগুলো। প্রসাধনী টেবলে একটা বুরুশ পড়ে।

অন্ধকার ঘর---কালো ওক-কাঠের জেল্লা চারিদিকে —আরামহীন। সুসির দেহে শিহরণ উঠলো।

আর্থার একমুহূর্ত দাঁড়ালো, চারপাশে চোখ মেলে। নিশ্চুপ।

তেতলার সিঁড়ি ধরলো ওরা এবার! বাড়ির সর্বশেষ তল।

---ছাদের রাস্তাটা কোনদিকে? যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছে আর্থার। ভাবনা শুরু হলো তার। মাথাটা ঝাঁকালো,---হুঁ ঘরগুলোর কোনো একটা থেকে সিঁড়ির ব্যবস্থা করা আছে।

চলতে শুরু করলো ওরা। ঘরের ছাদ এখন অনেক নীচু। মোটা মোটা খিলান। আসবাবহীন। শূন্যতা পরিবেশকে করে তুলেছে আরও ভয়াবহ। এক বিরাট রহস্যের মুখোমুখি যেন ওরা।

সুসির হৃৎস্পন্দন বেড়ে চলেছে। আর্থার তার নিরীক্ষা চালিয়েছে সযত্নে। প্রতিটি ঘরের চারপাশ দেখে চলেছে---কোনো দরজার সন্ধানে—সিঁড়ির খোঁজও চলেছে।

---না। কোনো চিহ্ন নেই।

যদি রাস্তা না পাও কি করবে? সুসি জানতে চাইলো।

—পাবোই।

আবার সিঁড়িতেই ফিরে এলো তারা। কোনো পথ বেরোলো না। আশাহত ওরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। এটা পরিষ্কার যে একটা পথ আছে কোথাও। আর্থার অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কোনো গুপ্ত দরজা জাতীয় কিছু—রেলিং-এ ভর দিয়ে চিন্তামগ্ন হলো সে। তার হাতের লণ্ঠনের আলো পড়েছে উল্টোদিকের দেয়ালে বাড়িটার শেষদিকে কোনো ঘরে সে ব্যবস্থা আছে। আর, সেটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমার।

ফিরে গেলো ওরা। একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে দেয়াল পরীক্ষা করলো আর্থার। তিনদিকে বাইরের দেওয়াল ঘরটার। এটাই একমাত্র ঘর যেটার সঙ্গে অন্য কোনো ঘরের সংযোগ নেই।
—এখানেই হবে সেটা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠলো আর্থার। হালকা গলায়। কাঠের দেয়ালের মাঝে একটা ছোট দরজা পাওয়া গেলো। চাপ দিতে খুলে গেলো দরজা। সরু সিঁড়ি উঠে গেছে—কাঠের।

ওপরে উঠে এলো ওরা। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। দরজা ধাককালো আর্থার। খিল তোলা ভেতর থেকে।

শুকনো হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে,—একটু পিছিয়ে যাও তো তোমরা।

হাতের কুড়োলটা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলো আর্থার দরজায়, হাতল ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু তালা অটুট। মাথাটা ঝাঁকালো আর্থার। এক মুহূর্ত থমকালো সে,···সম্পূর্ণ নীরব।

সুসি একটা পরিষ্কার আওয়াজ পেলো। আর্থারের কাঁধে হাত রাখলো সে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে।

ওরা কান পাতলো। দরজার ওপাশে জীবন্ত কিছুর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বিচিত্র এক আওয়াজ। অমানবীয়। কিন্তু পাশব নয়। অস্বাভাবিক স্বর একটা।

একধরণের বিড়বিড়ানি, কর্কশ—দ্রুত। এত অস্বাভাবিক যে বাইরের দাঁড়ানো মানুষগুলোর শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে,

মেরুদণ্ড বেয়ে নেমেছে শীতল অনুভূতি।

—চলে এসো, আর্থার—চলে এসো! সুসি ককিয়ে উঠলো।

—ওখানে জীবন্ত কিছুর আওয়াজ পাচ্ছি।

এ' আওয়াজ তাকে সন্ত্রস্ত করেছে। কেন বলতে পারবে না আর্থার। ঘাম দেখা দিলো তার কপালে।

—সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে—সুসি কাঁপতে শুরু করেছে।

—দরজা ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। আর্থার কঠিন গলায় বলে উঠলো।

আবার আঘাত হানলো আর্থার। বিড়বিড়ানি স্তব্ধ। দ্রুত আঘাত করে চললো আর্থার, সমস্ত শক্তি দিয়ে। শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে চললো সারা বাড়ি।

হুড়মুড় শব্দ উঠলো একটা। দরজা খুলে গেলো...

অনেকক্ষণ অন্ধকারে ছিলো ওরা, তাই চোখ ধাঁধিয়ে গেলো উজ্জ্বল আলোতে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো তারা—গরম হাওয়া বেরিয়ে এলো এক ঝলক ঘরটা থেকে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

উনোন হয়ে আছে যেন ঘর।

ঢুকলো ওরা। বাতি জ্বলছে, রিফ্লেকটর দেওয়া। বিরাট চুল্লীও একটা, চোখে পড়ছে। এত তাপের দরকার কেন বুঝে উঠতে পারে না আর্থার। ডাক্তার পোরোয়ের চোখে পড়লো থার্মমিটার—তাপমাত্রার নির্দেশক কাঁটায় দৃষ্টি পড়তে স্তম্ভিত হলো সে। অপ্রশস্ত জানালাগুলোও বন্ধ। গবেষণাগারের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত ঘরটা নিঃসন্দেহে। ইতস্তত টেস্টটিউব ছড়ানো। বেসিন আর স্নানের জায়গা—সাদা পোর্সেলিনের তৈরী। মাপের পাত্র, নানাধরণের বাসন—বিস্ময়কর বস্তু যেটা, সেটা হলো একটা পাল্লা—যার ওপর সমস্ত কিছু রাখা।

এরকম প্রকাণ্ড মাপের জিনিষ এই প্রথম চোখে পড়ছে ওদের। দুই সারে বোতল। হাসপাতালের ডিসপেনসারীতে যেরকমটা দেখা

বায়—প্রত্যেকটায় বিভিন্ন বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ ভর্তি।

তিনজনই দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দ। ঘরের শূন্যতা এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। ভৌতিক পরিবেশ।

সুসির কেন যেন মনে হলো, যে মানুষ এই ঘরে কার্যরত সে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। কাছাকাছিই হয়তো আছে সে, অপার্থিব আওয়াজ মন্ত্র বলে স্তব্ধ।

পাশে একটা ঘর নজরে পড়লো, মাঝের দরজাটা বন্ধ। আবার দরজাটা খুলে ফেলতে একটা নীচু ঘর নজরে পড়লো, ছাদের। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে এখানেও, গরমও অসহ্য। এখানেও আছে টেবল যন্ত্রপাতি অন্য ঘরের মতই। চুল্লী থেকে তাপ আসছে। টেবলগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে চললো আর্থার—অলিভার হ্যাডো কি ধরণের গবেষণায় লিপ্ত, অনুমান করতে চাইছে।

বাতাসভারী হয়ে উঠছে, এক বিচিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সোঁদা নয় সে গন্ধ—আগের ঘরগুলোর মত। তীব্র, অস্বস্তিকর। কি থেকে আসতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলো আর্থার।

একটা বড় আধারের দিকে দৃষ্টি পড়লো এবার তার, প্রকাণ্ড চুল্লীর একেবারে কাছের টেবলটায়। সাদা কাপড় এক ফালি পাতা তার ওপর। তুলে নিলো আর্থার সেটা। ফুট চারেক হবে উচ্চতায় আধারটি। গোলাকৃতি। স্নানের টবের মত অনেকটা। কাঁচের তৈরী। মোটা—এক ইঞ্চিরও বেশী পুরু মনে হলো। গোলাকার পদার্থ—ফুটবলের চেয়ে কিছু বড়। বিচিত্র বর্ণ। মুখটা তার মসৃণ। হাসপাতালের বয়ামে রাখা বিরাট আবগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

চরম বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালো সেদিকে সুসি, হঠাৎ তার মুখ থেকে আর্তস্বর উঠলো,—এঃ! নড়ছে যে!

আর্থার তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললো। শান্ত করতে অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে পড়লো সে।

একতাল মাংস! না। কোনো মানুষের দেহের সঙ্গে মিল

নেই তার—তবু নিয়মিত স্পন্দন চলেছে। পরিষ্কার টিকটিক শব্দ কানে আসছে। নিদ্রিত রমণীর বুকের উঠানামা যেন। আঙুলটা দাবিয়ে দিয়েই সরে এলো আর্থার,—এ! এখনো বেশ নরম যে!

ঘুরিয়ে দিলো সেটা আর্থার, আগের অবস্থায়। না, আগা নেই, পেছনও নেই তার। শুধু একদিকে কোঁকড়া চুল। মানুষের চুলের মতই কতকটা।

—জীবিত আছে? সুসি ফিসফিস স্বরে বললো, চোখে অনেক ভয়।

—হ্যাঁ। আর্থার কিন্তু মোহিত। ওই কদাকার বস্তুটির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সে। নিয়মিত স্পন্দন লক্ষ্য করে চলেছে,—এর মানে কি হতে পারে? ডাক্তার পোরোয়ের দিকে তার রক্তহীন মুখটা ফেরালো। এক ভাবনা পেয়ে বসেছে তাকে, অকল্পনীয় সে ভাবনা—অসাধারণ, ভয়ঙ্কর—দু'হাতে ঠেলে দিলো সেটাকে আর্থার।

মুহূর্তপরেই তিনজনই ওরা ঘুরলো চমকে। সেই বিড়বিড়ানি কানে আসছে, যে আওয়াজ দরজার বাইরে পেয়েছিলো। এবার আওয়াজ অনেক কাছে, সুসি সরে গেলো—কারণ তারই পাশ থেকে আসছে সে আওয়াজ...

—এখানে তো কিছু নেই। পাশের ঘরে থাকতে পারে—আর্থার বলে উঠলো।

আর্থার, চলো—চলে যাই আমরা। আমাদের ভাগ্যে কি আছে ভাবতে ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। এ'সবের সঙ্গে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যা' দেখছি তাতে চিরকালের জন্যে ঘুম চলে যাবে চোখ থেকে।

ডাক্তার পোরোয়ের দিকে চাইলো সুসি, চোখে আবেদন তার, পোরোয়ের চোখেও উদ্বেগের ছায়া। তাপে তার কপালেও ফুটেছে ঘাম,—অনেক দেখা হয়েছে; আর নয়।

—তাহলে চলে যাও তোমরা, দুজনই। তোমাদের এসব দেখতে বাধ্য করতে চাই না আমি। আমি চালিয়ে যাবো, যাই হোক না কেন

—বের করবো খুঁজে।

—কিন্তু হ্যাডো? সে যদি থেকে থাকে তোমার অপেক্ষায়? হয়তো তারই ফাঁদে পা দিতে চলেছো—

সেই দুর্বোধ্য, অমানবীয়—কর্কশ প্রলাপ কানে এলো ওদের। আর্থার এগিয়ে গেলো। সুসিও মনস্থির করে ফেলেছে, আর্থারকে দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে তার সঙ্গে যেতে রাজী সে।

পাশের দরজাটা একটানে খুলে দিলো সে -নিস্তব্ধতা নামলো আবার—ঘরটা আগেরটার চেয়ে বড়, উঁচুও। সারা ঘরটা জুড়ে বাতির সার—বিরাটাকার। ওপরের দিকটা শুধু ছায়া ঘেরা।—আবার সেই গন্ধ—বমনোদ্রেককারী। এত উগ্র যে কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হলো তাদের। দুর্গন্ধ। আর্থার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তবু—জানলাগুলোর দিকে চোখ ফেরালো সে—যদি খোলা যেত সেগুলো ··

প্রচণ্ড গরম বাতাস আরও ভারী হয়ে এসেছে, চারটে চুল্লী জ্বলছে, কয়লা ছড়ানো সবকটায়।

এ' ঘরের সজ্জা কিন্তু অন্য ধরণের। যন্ত্রপাতির সবগুলোতেই বৈদ্যুতিক সংযোগ। চার ধারে বই ছড়িয়ে। টেবলের কোণে একটা তার খোলা অবস্থায় পড়ে, উল্টে। কিন্তু যে জিনিষ এখুনি ওদের দৃষ্টি কেড়েছে, তা কতকগুলো কাচের পাত্র, পাশের ঘরে যেরকমটায় দেখেছে। প্রত্যেকটাই সাদা কাপড় মোড়া। ইতস্তত করলো ওরা কিছুক্ষণ—কারণ—কি হেঁয়ালীর মুখোমুখি হতে হবে এবার কে জানে! শেষে একটা থেকে কাপড় সরিয়ে দিলো আর্থার। সবাই নির্বাক। বিস্ময়ের সাক্ষর তাদের চোখে—এখানেও সেই মাংসের স্তূপ। সদ্যজাত শিশুর অবয়ব যেন—পাদুটো জোড়া মনে হয়—মমির মত।

পা নেই। নেই হাঁটু। ধড়ের নেই আকার। কিন্তু দু'পাশে প্রশস্ততা—যেন শিল্পীর হাতের ছাপ। মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে শিশুর। সোনালী চুলও দেখা দিয়েছে—কিন্তু ভয়ঙ্করদর্শন, সব মিলিয়ে কদাকার স্তূপ একটা। চোখ-নাক-মুখহীন। ফ্যাকাসে

গোলাপের রঙ, প্রায় স্বচ্ছ। ছন্দোময় আন্দোলন চলেছে এরও, ধীরগতি। এটাও জীবিত...

ক্রমে সবগুলোর ওপর থেকেই সরিয়ে নিলো আবরণ আর্থার, একটা ছাড়া। চোখের পলকে ভেসে উঠলো অবয়বহীন কতকগুলো জড় পদার্থ। সুসি নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করলো। একটা বস্তু পাওয়া গেলো, প্রায় মানুষের আকার তার। জড়সড় করা বস্তুটির মোটা মোটা ক্ষুদে হাত। ক্ষুদে ফাঁপা পা। কুৎসিত দেহ, আসনপিঁড়ি হয়ে আছে। চীনে পথিকের সাজ—চীনেমাটির তৈরী যেন। আর একটার ধড়ের সঙ্গে শিশুর মিশ্র বহুলাংশ। শুধু রঙের ফারাক—ধূসর আর লালের সমন্বয়। গ টি' অদ্ভুতরকমের—দুটো মাথা, বিরাট। কিন্তু আকৃতিগত সমস্ত কিছু আছে তাতে।

মানবতার এমন হাস্যকর ব্যঙ্গচিত্রের বাস্তব রূপায়ন আগে বোধ-হয় চোখে পড়েনি ওদের কারুর।

আলোটা পিণ্ডের ওপর পড়তে, চোখ খুলে গেলো সেটার—দুটো মাথারই। রঞ্জক উপাদানের অভাব তাতে—কিন্তু গোলাপী আভাস আছে, সাদা খরগোসের চোখ। চোখ বুঁজে গেলো। একই সঙ্গে বন্ধ হলো না কিন্তু সে চোখ। একটার চোখের পাতা অন্যটার আগে বন্ধ হয়েছে...আর এক দৃশ্য চোখে পড়েছে ওদের—দানবীয় দৃশ্য। দুটো দেহ যুক্ত হয়ে আছে। দুঃস্বপ্নের জীব—চারটে হাত, চারটে পা। এটা সত্যিই নড়ছে! বিচিত্রগতিতে এগিয়ে চললো জীবটি, আধারের তলা দিয়ে। গতি তার ওদের দিকেই...

সুসি ভয়ে পিছিয়ে গেলো, সেটা তাদের দিকে থাবা তুলতে মুখ ঢেকে ফেললো সুসি। মানবতার এমন অবমাননা সইতে পারছে না সে। ভয়ের সঙ্গে লজ্জাও ছেয়েছে তার মন।

—এর মানে বুঝলে? পোরোয়ে আর্থারের দিকে ঘুরলো, শঙ্কার গলা তার,—জীবনের গোপন তথ্যের সন্ধান পেয়েছে লোকটা!

—এই দানবীয় কাণ্ডগুলো ঘটাবার জন্যেই কি মার্গারেটকে তার জীবন দিতে হলো?

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো, বিষণ্ণ তাদের চোখ।

—তোমাদের মনে পড়ে—লোকটা জীবনসৃষ্টির কথা বলতো? এই সবই তার ফসল মনে হয়। ডাক্তার বললো।

—আর একটা জিনিষ দেখার আছে আমাদের। আর্থার বললো।

ফুলদানীগুলো সবচেয়ে বড়টার ওপর যে আবরণ দেওয়া সেদিকে ইঙ্গিত করলো। তার ধারণা, এর আড়ালেই হয়তো ভয়ঙ্কর কিছুর সন্ধান মিলবে, আবরণ সরিয়ে নেওয়াটা তেমন অনায়াসসাধ্য হলো না। আবরণ সরাতেই যে বস্তুটি লাফিয়ে উঠলো তাতে আর্থার ছিটকে সরে এলো। অদ্ভুত জীব শুরু করলো তার অস্ফুট গুঞ্জন। অপার্থিব সে শব্দ। না। কোনো কণ্ঠস্বর নয়—কর্কশ চিৎকার, সরু গলায়। কুকুরের চিৎকার যেন। ভীতিজনক। ক্রমে দ্রুততর আসছে সে আওয়াজ, ক্রোধোন্মত্ত। উত্তেজনাকর কিছু বলার প্রচেষ্টা। হাত দুটো মুঠোকরা জীবটির—কারণ মানুষেরই হাত তো। শরীরটার সঙ্গে সদ্যজাত শিশুর অবয়বের তুলনা চলে শুধু। ফুট চারেক হবে উচ্চতায় জীবটা—আকারহীন মাথা। বিরাট খুলি, মসৃণ, কিন্তু কপালটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চোখমুখের কোনো আকৃতি নেই। এক বুনো শয়তানীর স্বাক্ষর তাতে। প্রচণ্ড রাগে ফুলছে সে মুখ···মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসছে। কাচের গায়ে আছড়ে পড়লো জীব—তীব্র ঘৃণা নিয়ে।—ওরাই লক্ষ্য ..দাঁতহীন মাড়িগুলো নড়ে চলেছে তার।

—এই জীবটিই মানুষের কাছাকাছি কিছুর সৃষ্টি—অলিভার হ্যাডোর।

—চলে এসো দেখা যায় না আর। আর্থার বলে উঠলো।

আবরণ ফেলে দিলো আর্থার পাত্রটার ওপর।

—হ্যাঁ, চলো। সুসিও বললো।

ঘরের চারপাশে তাকালো ওরা। আর্থার শেষে বললো,—না আমাদের কাজ শেষ হয়নি—এসবের সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়া যায়নি এখনো।

একটাই দরজা—যেটা দিয়ে ঢুকেছিলো ওরা।

একটা আর্তনাদ উঠলো আর্থারের গলা দিয়ে। সামনের দিকে এগিয়ে, হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে।

লম্বা টেবলগুলোর অন্যদিকটায় ওদের চোখ পড়েনি এতক্ষণ—কারণ যন্ত্রপাতিতে আড়াল ছিলো সেদিকটা, মাটিতে পড়ে অলিভার হ্যাডো। সাগর-নীল চোখদুটো বিস্ফারিত তার, আরও বড় দেখাচ্ছে। এখনো আতঙ্ক ছড়িয়ে তাতে। মাংসল মুখটায় মৃত্যুভয় ছড়িয়ে। কালচে মেরে গেছে—চোখের কোলে রক্তরেখা···

—দম বন্ধ হয়ে মরেছে, নীচুগলায় বলে উঠলো পোরোয়ে।

গলাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো আর্থার, এখনো ছাপ ছড়িয়ে সেখানে তার হাতের। যে হাতে তার গলা মটকেছে সে।

—বললাম না, ওকে মেরে ফেলেছি—আর্থার কাঁপা গলায় বললো। আরও কিছু মনে পড়লো তার, ডানহাতটা তুলে নিলো সে। অন্ধকারে লোকটার সঙ্গে তার ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার হাতটা ভেঙে দিয়েছে সে। হাতটা টিপলো সে—হাড়ের খটখটানি কানে এলো। ঠিক যেখানটায় মোচড় দিয়েছে সে, সেই জায়গার হাড় সরেছে।

উঠে দাঁড়ালো আর্থার। তার পরমশত্রুর চোখে তাকিয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ। বিরাট মাংসের স্তূপ পড়ে আছে···

—দেখা তো হলো, এবার যাবে কি? সুসি উদ্বিগ্ন।

তার কথায় নিজেকে ফিরে পেলো আর্থার—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে এখান থেকে।

ওরা নেমে এলো দ্রুতপায়ে।

—দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তোমরা। আসছি আমি।

—কি করবে আবার? সুসির উদ্বেগ কাটে না।

—সে ভাবতে হবে না। যা বলছি করো। এখানকার কাজ শেষ হয়নি আমার।

বাইরের হলে অপেক্ষা করতে লাগলো সুসি, সঙ্গে পোরোয়ে। আর্থারের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাবনা শুরু হয়েছে তাদের। পরমুহূর্তেই দৌড়ে নেমে এলো আর্থার।

—চলো, জলদি। সময় নষ্ট করা চলবে না।

—কি করেছো তুমি, আর্থার?

—বলার সময় নেই, এসো।

বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে। সুসির হাতটা এবার ধরলো আর্থার,—চলো, দৌড়োও—

এই ব্যস্ততার কারণ কি বুঝতে পারেনা সুসি। কিন্তু বুক তার তোলপাড়। সুসিকে টেনে নিয়ে চলেছে আর্থার। ডাক্তার পোরোয়েও চলেছে সঙ্গে।

জঙ্গলে ঢুকলো ওরা। নিশ্বাস ফেলার সময়ও বুঝি দেবে না আর্থার, ওদের—চলো—

বেড়ার কাছাকাছি হলো তারা। পেরিয়ে গেলো বেড়া। আস্তে কাঠের রেলিংটা যথাস্থানে রেখে দিলো আর্থার।

সরাইখানার পথ ধরলো তিনজনে।

—বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে, অত তাড়াতাড়ি যেতে পারবো না।

—পারতেই হবে। তারপর যতখুসী বিশ্রাম নেবে।

এবার অত্যন্ত দ্রুত চললো ওরা কিছুক্ষণ। আর্থার বারবার ফিরে তাকাচ্ছে। রাত এখনো কালো। আকাশে অসংখ্য তারার মিছিল।

আস্তে চলা শুরু হলে আর্থার বলে উঠলো,—এবার আস্তে চলো। সে তার দিকে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে। সস্নেহে হাত রাখলো সুসির কাঁধে,—বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছো—এত তাড়াহুড়ো করানোর জন্যে দুঃখিত আমি।

—তাতে কিছু হয়নি। আর্থারের শরীরের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলো সুসি, নিশ্চিন্ত সে।

ডাক্তার পোরোয়েও এবার দাঁড়িয়ে পড়লো,—আমাকে এবার একটা সিগারেট পাকাতে দাও অন্তত।

—যতগুলো খুসী। আর্থার আশ্বাসের সুরে জানালো।

তার গলার স্বরে আর ব্যস্ততার আমেজ নেই এখন। এ-গলা অনেকক্ষণ পরে যেন শুনলো ওরা। অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে যেন আর্থার। সুসিও যেন সেই ভয়াবহ দিনগুলো ভুলে যেতে চাইছে।

পরিবেশও অনেকটা শান্ত এখন। গুমোট কেটে যাচ্ছে। আঁধার কিন্তু কাটেনি। পূবের আকাশ পাতলা হয়ে আসছে। গাছগুলো যেন ক্রমে অন্ধকার থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

পাখিরা ওদের ঘিরে শুরু করেছে তাদের কিচির মিচির। ... সকালকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

...টা ছোট্ট পাথরের স্তূপের ওপর উঠেছে ওরা তিনজন এবার।

—...দয় দেখবো আজ। সুসি বলে উঠলো।

—খুশী।

ওরা দাঁড়ালো। সুসি লম্বা নিশ্বাস নিলো একটা—গভীর, জয়ের আনন্দ ভরপুর।

...র পায়ের নীচের সমস্ত জায়গা জুড়ে বেগুন আভার মেলা। খুশী হয়ে উঠছে সুসি। আর্থারের দৃষ্টি কিন্তু পূর্বমুখী নয়—স্থির চোখে তাকিয়ে সে, যে রাস্তা ধরে এসেছে তারা, সেদিকে।

পশ্চিমের আঁধারে কি খুঁজছে সে?

সুসি ঘুরলো—আর্তনাদ বেরোলো তার গলা থেকে, ছায়া ছায়া পশ্চিম দিকটায় একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে. .

—আগুন লেগেছে মনে হচ্ছে সুসি কোনোরকম বললো।

—হ্যাঁ। স্কেন জ্বলছে—খোসামকুচির মত জ্বলছে।

তার কথার শেষেই ছাদটা ভেঙ্গে পড়লো, হ্যাতোর যাদু খেলার শেষ। এতদূর থেকে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। লিহান জিভ মেলে ছুটে চলেছে দানব···ঘর থেকে ঘরে।

...য়ের হাতের বাইরে এখন সবকিছু। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আর ...নো কিছুতেই অবশিষ্ট থাকবে না—শুধু ধোঁয়া, আর ছাই...

এক আদিম চুল্লী যেন স্কেন

—আর্থার, কি করেছো তুমি। প্রায়-অশ্রুত গলা সুসির।

সরাসরি উত্তর দিলো আর্থার। সুসির কাঁধে আবার হাতটা নেমে এলো তার, ঘুরলো সুসি তার মুখোমুখি।

—ভাখো, সূর্য উঠছে—আর্থার মধুস্বরে বললো। পূবে আকাশ বেয়ে এক আলোর রশ্মি উঠছে—গোল সূর্যটা হলদে রঙে রঙীন হয়ে দেখা দিয়েছে পৃথিবীর বুকে।